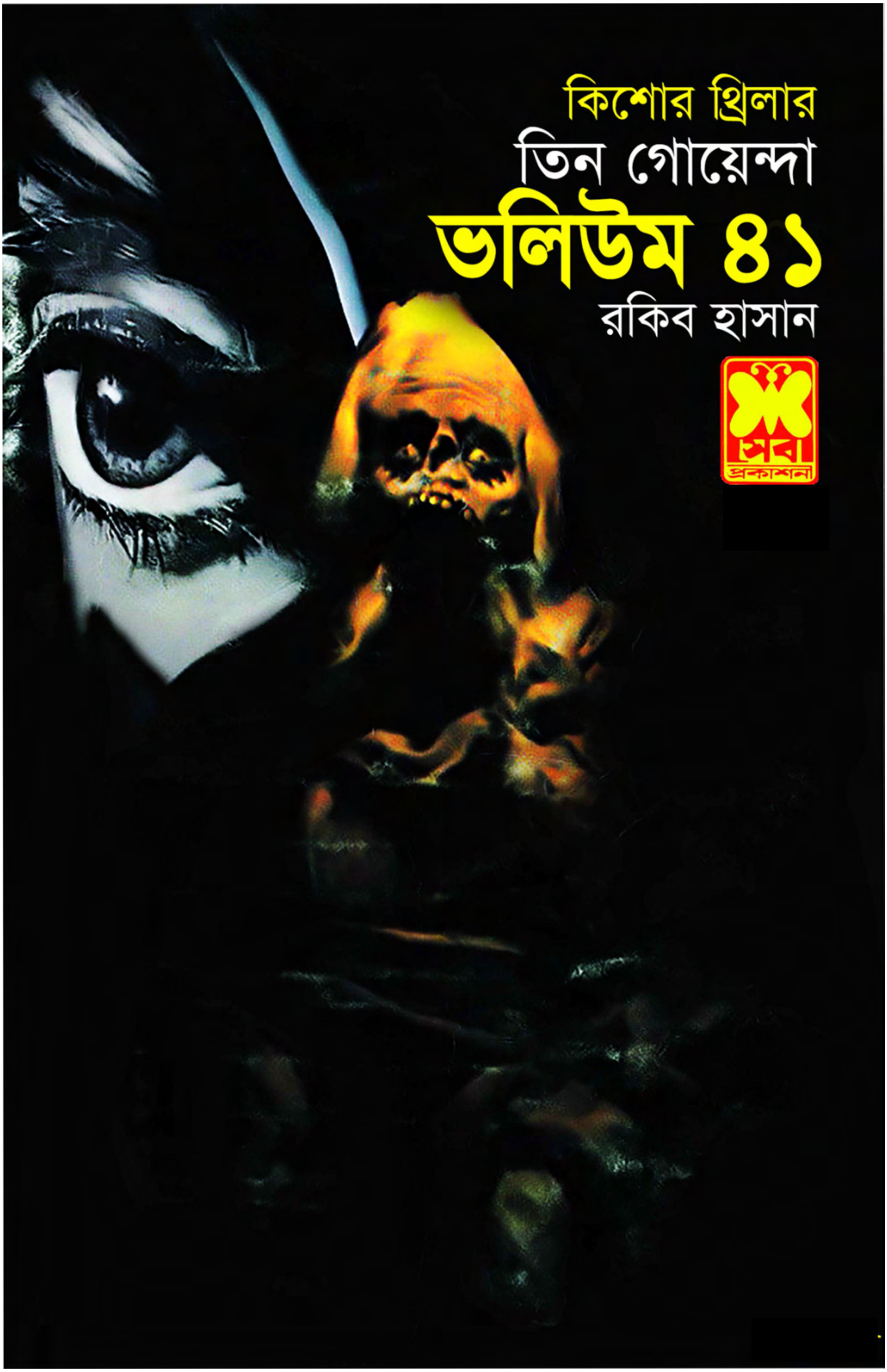

কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৪১

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ভলিউম ৪১

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1429-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ১৯৯২

প্রচ্ছদ বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন. ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৮৯৪০৫৩
জি পি ও বক্স ৮৫০
E-mail. sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭৮-১৯০২০৩

Volume-41
TIN GOYENDA SERIES
By Rakib Hassan

তেতাল্লিশ টাকা

নতুন স্যার	৫–৪৪
মানুষ ছিনতাই	৪৫–১৪০
পিশাচকন্যা	১৪১–২২৪

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)	৪৫/-

তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভাল্লুক)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেক্ট্রনিক আতঙ্ক)	৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬০	(শুটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুটকি শত্রু)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৬১	(চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের যাদুঘর)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৪	(মায়াপথ+হীরার কার্তুজ+ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৫	(বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৬	(পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৭	(ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহায় আতঙ্ক)	৩৫/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

নতুন স্যার

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

তিনজন যাত্রী নামল বাস থেকে। ঝুড়ি হাতে এক মহিলা। নেমেই গটগট করে হেঁটে রাস্তা পার হয়ে গেল। দ্বিতীয়জন তরুণ, গাঁয়ের মুদির ছেলে, শিস দিতে দিতে চলল। তৃতীয়জন এক বৃদ্ধ। সামান্য কুঁজো হয়ে হাঁটছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।

নাহ্, এদের কেউ না।

চতুর্থ আরেকজন নামলেন এই সময়। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। চেহারাটা কেমন অদ্ভুত মনে হলো গোয়েন্দাদের কাছে। বেঁটে, মোটা, নাবিকদের মত দাড়ি। নীল চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এলোমেলো চুলের ধারগুলো ধূসর হয়ে এসেছে।

বাস থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকালেন। কাউকে খুঁজছেন মনে হলো।

'নিশ্চয় মিস্টার নরটন,' মুসার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'চলো, জিজ্ঞেস করি। উনি ছাড়া আর কেউ নন।'

ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। বিনীত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনি কি মিস্টার নরটন, স্যার?'

'হ্যাঁ,' দুজনের দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন তিনি, 'তোমরা নিশ্চয় কিশোর আর মুসা।'

'হ্যাঁ, স্যার,' সমস্বরে জবাব দিল মুসা আর কিশোর। 'আপনার জন্যে ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি।'

'ওহ্, ফাইন,' নীল চোখজোড়া জ্বলজ্বল করে উঠল তাঁর। দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'মাত্র দুজন? অন্যরা কই?'

'ওই ওদিকে,' পার্কিং লটের দিকে হাত তুলল কিশোর। 'জর্জ আর রবিন দুজনেই আছে।'

'জর্জ?' অবাক চোখে তাকালেন মিস্টার নরটন। 'আমি তো জানতাম একজন অন্তত মেয়ে।'

'তাই তো,' হেসে জবাব দিল মুসা। 'জর্জই মেয়ে। জরজিনার সংক্ষেপ। ছেলে সেজে থাকতে ভালবাসে।'

'জরজিনা নামটাই তো ভাল।'

'ভাল। কিন্তু জরজিনা বলে ডাকলে জবাব দেয় না।'

'তাই,' কেমন শীতল শোনাল মিস্টার নরটনের গলা।

চট করে তাঁর মুখের দিকে চোখ চলে গেল কিশোরের। যতই হাসি হাসি মুখ করে রাখুন, যতটা সরল আর নিরীহ ভেবেছে ভদ্রলোককে, ততটা নন।

'রাফিও আছে ওখানে,' মুসা জানাল।

'ও, আরেকটা ছেলে? চারজন তো জানতাম।'

'ছেলেই, তবে মানুষ নয়,' হেসে জবাব দিল মুসা, 'কুকুর।'

চমকে উঠলেন মিস্টার নরটন। 'কুকুর! বাড়িতে যে কুকুর আছে তা তো জানানো হয়নি আমাকে। কুকুরের কথা কিচ্ছু বলেননি তোমার আংকেল।'

'আপনি কুকুর পছন্দ করেন না?' অবাক হলো কিশোর।

'না,' ভোঁতা স্বরে জবাব দিলেন মিস্টার নরটন। 'তবে তোমাদের কুকুরটা নিশ্চয় অত শয়তান না, কি বলো?...দাঁড়িয়ে আছি কেন? চলো, যাই।'

আগেই সাবধান করা হলেও জরজিনা বলেই ডাকলেন মিস্টার নরটন। জবাব দিল না জিনা। কেবল হাতটা বাড়িয়ে দিল নতুন স্যারের দিকে। মুখটা গোমড়া করে রাখল। তবে রবিন হেসে হাত মেলাল তাঁর সঙ্গে।

'রাফি, মিস্টার নরটনের সঙ্গে হাত মেলা,' হুকুম দিল কিশোর।

হাত মেলানো, মানে নতুন কারও সঙ্গে 'পা' মেলানোয় ওস্তাদ রাফি, মেলাতে পছন্দও করে, কিন্তু অবাক কাণ্ড, মিস্টার নরটনের সঙ্গে মেলাল না। পা-ই তুলল না সে। ঘুরে গিয়ে খোলা দরজা দিয়ে সবার আগে উঠে পড়ল গাড়িতে।

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'এই রাফি, জলদি আয়!' ধমক দিল মুসা।

ফিরেও তাকাল না রাফি। গাড়ির মেঝেতে থুতনিটা নামিয়ে দিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে রইল।

'ও আপনাকে পছন্দ করেনি,' জিনা বলল। 'আশ্চর্য! নতুন কাউকে দেখলে তো বরং ও লাফানো শুরু করে দেয়। আপনি বোধহয় কুকুর পছন্দ করেন না?'

'না...তুমি ঠিকই বলেছ,' আমতা আমতা করে জবাব দিলেন মিস্টার নরটন। 'ছোটবেলায় একবার কুকুরে কামড়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে ভয়ও পাই, পছন্দও করি না।'

গাড়িতে উঠল সবাই। ঠাসাঠাসি করে বসতে হলো। ট্যাক্সির ড্রাইভার লোকটা বিশেষ কথাবার্তা বলে না। নির্দেশ পেতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

সামনের সীটে বসেছে জিনা আর রবিন। ফিসফিস করে রবিনকে বলল জিনা, 'লোকটাকে পছন্দ করেনি রাফি। যাক আগে বাড়িতে, আরও বুঝবে, ছুটির মধ্যে আমাদের পড়াতে আসার মজাটা টের পাবে।'

কিন্তু নতুন স্যারকে রবিনের খারাপ লাগছে না।

গাড়িতে আর বিশেষ কথাবার্তা হলো না।

বাড়ি পৌঁছে মিস্টার নরটনকে তাঁর ঘর দেখিয়ে দেয়া হলো। তাঁকে ঘরে রেখে নিচে নেমে এসে ছেলেমেয়েদের বললেন কেরিআন্টি, 'জিনা, তুই অমন করছিস কেন? ভালই তো মনে হলো আমার কাছে। বয়েসও খুব কম।'

'অত কম বোধহয় না,' একমত হতে পারল না কিশোর। 'চল্লিশ তো হবেই।'

হেসে উঠলেন কেরিআন্টি। 'তোমার কাছে অতই বেশি লাগছে নাকি?'

'আন্টি,' উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল মুসা, 'ক্রিসমাসের আগে নিশ্চয় পড়তে বসতে হবে না আমাদের?'

সবার মনের কথাটাই বলল সে।

'ক্রিসমাসের এখনও সাতদিন দেরি, অতদিন কি শুধু শুধু বসে থাকবেন নাকি মিস্টার নরটন? পরে পড়ালে তো ক্রিসমাসের পরেই আসতেন।'

কিছু বলার নেই। চুপ হয়ে গেল মুসা।

রবিন বলল, 'কিন্তু বড়দিনের বাজার করতে হবে যে আমাদের।'

'সেটা বিকেল বেলাতেও করতে পারবে। পড়তে তো বসবে শুধু সকালে। সারাদিন কি আর পড়বে নাকি?'

জামা-কাপড় ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে, ওপর থেকে নেমে এলেন নতুন স্যার। কেরিআন্টি তাঁকে স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে নিয়ে গেলেন। খানিক পরে মিস্টার পারকারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হাসিমুখে।

'একটা বিরাট চিন্তা গেল আমার। ভয়ই লাগছিল, জিনার বাবার সঙ্গে খাপ খায় কিনা। কিন্তু না, মতের অমিল হয়নি। জিনার বাবার কাজের ব্যাপারে খুব আগ্রহ দেখাচ্ছেন মিস্টার নরটন। খাতির জমতে দেরি হবে না।'

'বাবার সঙ্গেই কাটাকগে সারাক্ষণ,' নিচুস্বরে বলল জিনা, 'তাহলে জানে বাঁচি আমরা।'

'চলো, ঘরে বসে না থেকে হেঁটে আসি,' মুসা বলল। 'দিনটা ভারী সুন্দর। কাল থেকে তো আর এ সময় বেরোতে পারব না। আন্টি, আজই পড়তে বসতে হবে না তো?'

'না। কাল থেকেই বোসো।'

'চলো তাহলে,' খুশি হয়ে বলল কিশোর। 'জিনা, আজ গ্রেগদের ফার্মে যাই, কি বলো? রোজই তো যাব যাব করি, যাওয়া হয়ে ওঠে না। দেখেই আসি। নাকি?'

'হ্যাঁ, চলো।'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। কিছুদূরে পাহাড়ের কোলে খামারবাড়িটা। রাস্তা খুব একটা ভাল না।

ডিসেম্বরের রোদের মধ্যে হাঁটতে খুব ভাল লাগছে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে বন্ধুদের সঙ্গে চলেছে রাফিয়ান।

ফার্ম-হাউজটার কাছে পৌছল ওরা। সাদা রঙের পাথর দিয়ে শক্ত করে তৈরি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর।

বাড়ির গেটের কাছে এসে রাফির গলার বেল্ট চেপে ধরল জিনা। এ বাড়িতে আরও দুটো কুকুর আছে। ঝগড়া বাধাতে পারে।

খুটুর-খাটুর শব্দ শোনা গেল। এক বুড়োকে দেখা গেল কাজ করছে।

জোরে জোরে বলল জিনা, 'মিস্টার গ্রেগ, কেমন আছেন?'

ফিরে তাকাল বুড়ো। 'আরি, আমাদের জর্জ যে! এসো, এসো।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল সে।

'ওরা আমার বন্ধু,' পরিচয় করিয়ে দিল জিনা, 'রকি বীচ থেকে এসেছে।' ফিরে তাকিয়ে তিন গোয়েন্দাকে বলল, 'বুড়ো কানে কম শোনে। চিৎকার করে না বললে শোনে না।'

বুড়োর কাছাকাছি গিয়ে চিৎকার করে নিজের নাম বলে হাত বাড়িয়ে দিল কিশোর।

ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল বুড়ো। হাত মেলানোর পালা শেষ করে বলল, 'ঘরে এসো। আমার বুড়ির সঙ্গে দেখা করবে। খুব খুশি হবে। জর্জের জন্মের সময় ওবাড়িতে কাজ করত সে। কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। জর্জের দাইমা।'

'আপনার বয়েস তো অনেক মনে হচ্ছে,' রবিন বলল।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল বুড়ো। 'তা তো বটেই। এসো।'

বিশাল রান্নাঘরটাতে ঢুকল ওরা। চমৎকার উষ্ণ পরিবেশে কাজ করছে ছোটখাট এক বৃদ্ধা। ওদের দেখে ছানাওয়ালা মুরগীর মত করকর করে উঠল। খুব খুশি।

'জর্জ, এতদিনে তোর আসার কথা মনে পড়ল। কদ্দিন দেখি না! রোজ ভাবি আসবি। আসিসনে কেন? বুড়িকে দেখতে তোর মন চায় না?'

'থাকি নাকি এখানে যে আসব। স্কুল ছুটি হলো, তারপর তো আসতে পারলাম। দাইমা, রাফিকে ছাড়লে অসুবিধে হবে? তোমাদের কুত্তা দুটোর সঙ্গে বনবে তো?'

'ছেড়ে দে, নিশ্চিন্তে। এই রাফি, স্টোন-ব্রিকের সঙ্গে মারামারি করবি না, খবরদার, বলে দিলাম! যা, খেলগে।' ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাল মিসেস গ্রেগ, 'কি খাবে তোমরা? গরম দুধ? কোকা? কফি? কাল কিছু বিস্কুট বানিয়েছি। ইচ্ছে করলে চেখে দেখতে পারো।'

স্ত্রীকে ভাঁড়ারের দিকে চলে যেতে দেখে ফিকফিক করে হাসল বুড়ো। 'বহুদিন পর ব্যস্ত দেখছি। এই বড়দিনে মেহমান আসছে তো আমাদের, বুড়ির কাজের আর শেষ নেই।'

'কারা আসছে?' অবাক হলো জিনা।

'দুজন আর্টিস্ট আসছে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে,' বুড়ো জানাল। 'চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিল হপ্তা তিনেক এসে থাকতে পারবে নাকি আমাদের বাড়িতে। থাকা-খাওয়ার জন্যে ভাল টাকা দেবে। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল বুড়ি।'

'এখানে এসে কি করবে?' জানতে চাইল কিশোর। 'ছবি আঁকবে?'

'আর্টিস্ট যখন, আর কি করবে? হয়তো সাগরের ছবি আঁকতে আসবে।'

'আসুক। দেখা করতে আসব একদিন।'

'যখন খুশি চলে এসো,' পেছন থেকে বলল মিসেস গ্রেগ। ভাঁড়ার থেকে ফিরে এসেছে। একটা জগে কোকা বানাল। বড় এক প্লেট বিস্কুট দিল।

খুশি মনে খেতে বসে গেল ছেলেমেয়েরা। একেক কামড়ে একেকটা বিস্কুট সাবাড় করে আর প্রশংসা করে মুসা।

বুড়ির দিকে তাকিয়ে জিনা বলল, 'লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসে আর্টিস্টদের এখানে থাকতে কি ভাল লাগবে? একা একা লাগবে না? এখানে আর কাউকে চেনে নাকি ওরা?'

'কাউকে চেনে না। ছবি-টবি যারা আঁকে, লোকগুলো জানি কেমন হয়, দেখেছি। তবে একা একা লাগবে না ওদের, দুজন আসছে তো। নিশ্চয় বন্ধু।'

'তা-ই হবে, একসাথে আসছে যখন। বন্ধু না হলেও পরিচিত তো বটেই,' বুড়ো বলল। বুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি যাই। ভেড়াগুলো ওদিকে কি করছে কে জানে।' ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরল, 'যখনই ইচ্ছে হবে, চলে এসো।'

বুড়ো বেরিয়ে গেল। বিশাল রান্নাঘরটায় বসে ওদের সঙ্গে মনের আনন্দে

বকবক করে চলল বুড়ি। একদৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল রাফি। সবাইকে খেতে দেখে লোভীর মত কাছে এসে দাঁড়াল। ওর হাঁ করা মুখে আস্ত একটা বিস্কুট ছেড়ে দিল জিনা।

বিস্কুট মুখে নিয়ে ঘুরতেই বেড়ালটা চোখে পড়ল ওর। ওকে দেখে নিঃশব্দে সরে যেতে চাইছিল দেয়ালের ধার ঘেঁষে। কিন্তু ফাঁকি দিতে পারল না রাফিকে। বিস্কুট খাওয়া বাদ দিয়ে ঘাউ ঘাউ করে ধরতে গেল বেড়ালটাকে। রান্নাঘর থেকে যেন উড়ে বেরিয়ে গেল বেড়ালটা। পেছনে গেল রাফি।

পুরানো হলের গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটার ওপর উঠতে গেল বেড়ালটা। উল্লাসে চিৎকার করতে করতে কুকুরটাও লাফ দিল ওকে ধরার জন্যে। গিয়ে পড়ল চকচকে পালিশ করা প্যানেলের ওপর।

অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল!

সরে গেল প্যানেলটা–চারকোনা একটুকরো তক্তা। দেয়ালের গায়ে বেরিয়ে পড়ল একটা কালো ফোকর। রাফিকে থামানোর জন্যে জিনাও এসে ঢুকল ওই ঘরে। ফোকরটার দিকে তাকিয়ে চেঁচানো শুরু করল, 'দাইমা, দেখে যাও! জলদি এসো! কি বের করেছে ওরা, দেখো!'

দুই

জিনার চিৎকার শুনে দৌড়ে এল সবাই।

'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'বেড়ালটাকে ধরতে লাফ দিয়েছিল রাফি,' জিনা বলল। 'ওই প্যানেলটার ওপর গিয়ে পড়েছে। সরে গেছে ওটা…ওই দেখো, ফোকর বেরিয়ে পড়েছে।'

'খাইছে!' হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। 'সুড়ঙ্গের রাস্তা নাকি?' কাছে গিয়ে ফোকরটার ভেতরে উঁকি দিল সে। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস গ্রেগ, এটা যে আছে এখানে জানতেন নাকি?'

'জানি। এ বাড়িতে এ রকম গোপন ব্যাপার-স্যাপার প্রচুর আছে। অদ্ভুত সব কাণ্ড…ওই প্যানেলটা মোছার সময় সাবধান থাকি আমি। ওপরের কোন কোনায় জোরে চাপ লাগলেই সরে যায়।'

'কি আছে ওপাশে?' দেখার জন্যে কিশোরও এসে উঁকি দিল। মাথাটা কোনমতে ঢোকে। অন্ধকারে কিছু দেখতে পেল না। মাথা বের করে এনে হাত ঢুকিয়ে দিল। প্যানেলের কাছ থেকে ইঞ্চি ছয়েক দূরে দেয়াল।

'মোম-মোম! মোম দিয়ে দেখো,' সবার মতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রবিনও। 'মিসেস গ্রেগ, টর্চ আছে?'

'না। তবে মোম আছে। লাগবে? রান্নাঘরের তাকে।'

দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এল রবিন।

প্যানেলের ওপাশে জ্বলন্ত মোমটা নিয়ে গিয়ে দেখতে শুরু করল কিশোর।

চারপাশ ঘিরে এল বাকি সবাই। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল গায়ের ওপর।

'আরে, চেপে ভর্তা বানিয়ে দেবে তো!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'সরো না, দেখতে দাও!'

সরে গেল সবাই। ভালমত দেখতে দেয়া হলো তাকে। কিন্তু দেখার কিছু নেই। শুধুই অন্ধকার, আর পাথরের দেয়াল। সরে এসে মোমটা তুলে দিল মুসার হাতে, দেখার জন্যে।

এক এক করে সবাই দেখতে লাগল ভেতরে কি আছে। মিসেস গ্রেগ চলে গেছে রান্নাঘরে। ফোকরে আগ্রহ নেই।

'মিসেস গ্রেগ বলল, বাড়িটাতে নানা রকম কাণ্ড করে রাখা হয়েছে,' দেখা শেষ করে বলল রবিন। 'আর কি কি আছে? জিজ্ঞেস করা দরকার তাকে।'

প্যানেলটা আবার লাগিয়ে দিল কিশোর।

রান্নাঘরে ফিরে এল ওরা।

'মিসেস গ্রেগ,' জানতে চাইল কিশোর, 'এ রকম মজার জিনিস আর কি কি আছে আপনাদের খামারে?'

'ওপরতলায় একটা আলমারি আছে, পেছনটা খোলা যায়।...এত উত্তেজিত হয়ো না! ওর মধ্যে কিচ্ছু নেই। বড় একটা পাথর আছে ফায়ারপ্লেসের কাছে। সরালে একটা সুড়ঙ্গমুখের মত ফোকর বেরিয়ে পড়ে। ভেতরে জিনিস লুকানোর জায়গা আছে। আগের দিনে লোকে মনে হয় দামী মালপত্র নিরাপদে রাখার জন্যে বানাত এ সব জায়গা।'

পাথরটা দেখিয়ে দিল মিসেস গ্রেগ। অন্যপাশে কি আছে দেখতে ছুটল ওরা। পাথর সরাতে দেখা গেল ছোট একটা বাক্স লুকানোর মত জায়গা করা হয়েছে। বাক্স-টাক্স কিছু নেই এখন, খালি। তাই বলে উত্তেজনা কমল না ওদের।

'আলমারিটা কোন ঘরে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমার বুড়ো হাড্ডিতে আর কুলায় না। একবার নিচে নামলে ওপরে উঠতে কষ্ট হয়, আমি যেতে পারব না। বলে দিচ্ছি, তোমরাই যাও। ওপরে উঠে ডানে ঘুরবে। দ্বিতীয় দরজাটা দিয়ে ঢুকে পড়বে। আলমারিটা রয়েছে উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে। দরজা খুলে পেছনের কাঠে হাত বোলাবে। একটা কাটা দাগ হাতে ঠেকবে। ওটাতে চাপ দিলেই খুলে যাবে পেছনটা।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠতে লাগল চারটে ছেলেমেয়ে আর একটা কুকুর। চিৎকার, হুড়াহুড়ির অন্ত নেই। মুসা তেমন চিৎকার করতে পারছে না, তার মুখ ভর্তি বিস্কুট, দুই হাতে যতগুলো ধরে নিয়ে এসেছে। দারুণ উত্তেজনাময় একটা সকাল।

আলমারিটা খুঁজে বের করে দরজা খুলতে সময় লাগল না। একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। কার আগে কে দাগটা খুঁজে বের করবে প্রতিযোগিতা শুরু করল যেন।

সবার আগে হাতে ঠেকল রবিনের। চিৎকার করে উঠল, 'পেয়েছি!' চাপ দিল।

কড়কড় করে মৃদু শব্দ তুলে একপাশে সরে গেল আলমারির পেছনটা। বড় একটা খাঁজ বেরোল, যাতে একজন মানুষ অনায়াসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। খাঁজটা

অনেকটা খাড়া করে রাখা লম্বা বাক্সের মত।

'বাহ্, চমৎকার!' খাঁজটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। পেছনে দেয়াল দেখা যাচ্ছে না। গাঢ় রঙের ওক কাঠের প্যানেলিং। 'এখানে এসে লুকিয়ে থাকলে সহজে কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না।'

খাঁজের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। আলমারির পেছনে যে তক্তা ছিল, সেটা টেনে সামনে নিয়ে আসতে আড়াল হয়ে গেল। কেউ আর তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

'বেশি চাপাচাপি এখানে!' অন্যপাশ থেকে চিৎকার করে জানাল সে। 'অন্ধকার। দম আটকে আসে।'

তক্তা সরিয়ে বেরিয়ে এল সে।

সবাই একবার করে ঢুকে দেখল খাঁজটাতে, কেমন লাগে। সবচেয়ে বেশি অপছন্দ হলো মুসার। বেরিয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বাপরে বাপ, মনে হচ্ছিল কফিনে ঢুকেছি! ভয় লাগে।'

রান্নাঘরে ফিরে এল সবাই।

'দারুণ জায়গা, মিসেস গ্রেগ,' কিশোর বলল। 'এ রকম একটা বাড়িতে থাকতে আমার খুব ইচ্ছে করছে। কত রকম গোপন জায়গা!'

'আরেকদিন এসে ঢুকব ওই আলমারির মধ্যে,' জিনা বলল। 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখব কেমন লাগে।'

'কদিন আপাতত পারবিনে,' মিসেস গ্রেগ বলল। 'দুই আর্টিস্ট ভদ্রলোককে ওই ঘরটাতেই থাকতে দেয়া হবে।'

'ও,' হতাশ মনে হলো কিশোরকে। 'আলমারির কথা ওদের বলেছেন নাকি?'

'না, শুধু তোমাদের বলেছি,' হেসে বলল বৃদ্ধা। 'বড়রা কি আর এ সব ব্যাপারে আগ্রহী হয়। ওরা শুনলেও মাথা ঘামাবে না।'

'বড়রা আসলেই যেন কেমন,' রবিন বলল। 'আমার তো মনে হয় আমার বয়েস একশো বছর হয়ে গেলেও এ সব ব্যাপারে আগ্রহের কোন রকম কমতি হবে না।'

'আমারও না,' কিশোর বলল। 'প্যানেলের গর্তটা গিয়ে দেখে আসব নাকি আরেকবার! মিসেস গ্রেগ, আরেকটা মোম পাওয়া যাবে?'

আবার কেন দেখতে ইচ্ছে করল কিশোরের, সে নিজেও বলতে পারবে না। তবে এবার আর অন্য কেউ তার সঙ্গে যেতে চাইল না। দেখার তেমন কিছু নেই গর্তটাতে।

মোম নিয়ে রওনা হলো কিশোর। প্যানেলের কোনায় চাপ দিয়ে সরিয়ে দিল ওটাকে। ভেতরে মোম সহ হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে আরেকবার দেখার চেষ্টা করল কিছু আছে নাকি। হাত ঢোকালে মাথা ঢোকানো কঠিন, দেখাও সমস্যা। শেষে মোমটা এ পাশে রেখে হাতটা যতখানি ভেতরে ঢোকানো সম্ভব ঢুকিয়ে দিয়ে হাতড়াতে লাগল। দেয়ালের গায়ে একটা গর্তে ঠেকল ওর আঙুল।

'অবাক কাণ্ড!' বিড়বিড় করল সে। 'এখানে গর্ত কেন?'

তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের সাহায্যে খুঁজতে শুরু করল সে। সরু খাঁজ লাগছে। পাখির বাসার গর্তের মত। খাঁজের কিনারে আঙুল বাধিয়ে টানতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর খুলে এল পাথর। শব্দ করে নিচে পড়ল, প্যানেলের অন্যপাশে। প্যানেল আর দেয়ালের মাঝের বদ্ধ জায়গায় শব্দটা বেশ জোরেই হলো। পাশের ঘর থেকে কানে গেল সবার। ছুটে এল সবাই, মিসেস গ্রেগ বাদে।

'কি হলো? কি ভাঙলে?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'কিছু না,' উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে কিশোরের মুখ। 'ভেতরে হাত ঢুকিয়েছিলাম। একটা গর্ত লাগল হাতে। কিনারে আঙুল বাধিয়ে টান দিতে একটা পাথর খসে পড়ল।'

'খাইছে! কই, দেখি,' কিশোরকে সরিয়ে দিতে গেল মুসা।

সরল না কিশোর। 'দাঁড়াও, দেখি আর কি আছে। গর্তের ভেতর দামী কিছু থাকতে পারে।'

'কি আর থাকবে? সাপখোপের বাসা...'

তার কথার জবাব দিল না কিশোর। আবার হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। বইয়ের মত একটা জিনিস লাগল। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল সে। বের করে আনল জিনিসটা।

একটা পুরানো বই!

'কি বই!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

সাবধানে পাতা ওল্টাতে শুরু করল কিশোর। পুরানো কাগজ। ভেঙে যেতে পারে। ধুলোয় ভরা।

চারপাশ থেকে ঘিরে এল সবাই দেখার জন্য।

কয়েকটা পাতা উল্টে দেখে বলল রবিন, 'রশিদ বই। মিসেস গ্রেগকে দেখানো দরকার।'

ওদের উত্তেজনা দেখে হাসতে লাগল মিসেস গ্রেগ। মোটেও গুরুত্ব দিল না বইটাকে। বলল, 'অতি সাধারণ একটা রশিদ বই। সামনে লেখা নামটা দেখেছ? সারালিন গ্রেগ। তারমানে জর্জের বড়মা'র লেখা। কবিরাজি জানত। ভেষজ চিকিৎসা করে বহু লোককে ভাল করে দিয়েছিল। জন্তু-জানোয়ারের চিকিৎসাও করত শুনেছি।'

'হাতের লেখা পড়াই তো কঠিন,' নিরাশ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'পাতা এভাবে না ভাঙলেও একটা কথা ছিল।'

'গর্তের মধ্যে আর কিছু নেই তো?' রবিন বলল।

'মনে তো হলো না,' কিশোর বলল। 'গর্তটা ছোট। ইঁট, পাথর যা-ই পড়ুক, তার ওপাশে মাত্র কয়েক ইঞ্চি জায়গা।'

'তবু, দেখে আসা যেতে পারে আরেকবার,' জিনা বলল। 'মুসা, তোমার হাত কিশোরের চেয়ে লম্বা। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি?'

'সাপ...'

'সাপ যে নেই, সে তো কিশোরই প্রমাণ করে দিল। থাকলে ওর হাতে কামড়ে দিত। তা ছাড়া সাপ ঢুকবে কি করে ওখানে? পথ নেই।'

হলে ফিরে এল ওরা। ফোকরে হাত ঢোকাল মুসা। গর্তটা খুঁজে বের করল ওর আঙুল।

হ্যাঁ, আছে! আরও কি যেন ঠেকল আঙুলে। 'পেয়েছি!' চিৎকার করে উঠল সে। চকচক করছে চোখ। সাবধানে বের করে আনল জিনিসটা। পড়ে গিয়ে ভেঙে যাওয়ার ভয়ে।

সব ক'টা চোখ ঘুরে গেল তার হাতের দিকে।

'টোবাকো পাউচ!' ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের।

চামড়ার তৈরি তামাক রাখার একটা ছোট বটুয়া বের করেছে মুসা। আস্তে করে মুখটা খুলল। কুচি করে কাটা কিছু কালো রঙের তামাক পাতা এখনও রয়েছে ভেতরে। ঝরে পড়ল তিন-চারটে কুচি। ভেতর থেকে বেরোল গোল করে পাকিয়ে রাখা এক টুকরো রেশমী কাপড়।

মুসার হাত থেকে কাপড়টা নিয়ে এসে হলের টেবিলে বিছাল কিশোর।

সবাই তাকিয়ে আছে। কাপড়টার গায়ে কিছু বিচিত্র আঁকিবুকি আর লেখা। কালো কালি মলিন হয়ে গেছে। ওগুলোর মাথামুণ্ড কেউ কিছু বুঝতে পারল না।

'ম্যাপ না,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। 'সাঙ্কেতিক লেখা। কোন কিছুর নকশাও হতে পারে পুরোটা। মানে কি শব্দগুলোর? বুঝতে পারলে ভাল হত। গুপ্তধনের কথা বলেছে কিনা, তাই বা কে জানে!'

মিসেস গ্রেগকে কাপড়টা দেখাতে চলল ওরা।

মনোযোগ দিয়ে রশিদ বইটা পড়ছে এখন বৃদ্ধা। সাড়া পেয়ে মুখ তুলল। চোখ জ্বলজ্বল করছে। বইটা দেখিয়ে বলল, 'যতটা ভেবেছিলাম, তত সাধারণ নয় এটা। অনেক ওষুধের কথা লেখা আছে। কি খেলে বাতের ব্যথা সারবে লিখেছে। খেয়ে দেখব, সারে নাকি। যা কষ্ট পাচ্ছি আজকাল ব্যথায়...'

কিন্তু বাতের কথায় মন নেই গোয়েন্দাদের। ওরা আরও বেশি উত্তেজনা জাগানোর জিনিস খুঁজে পেয়েছে। রেশমী কাপড়টা মিসেস গ্রেগের কোলের ওপর ফেলে দিল কিশোর।

'দেখুন, কি পেয়েছি। একটা টোবাকো পাউচের মধ্যে পেয়েছি এটা।'

চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে ভাল করে মুছে আবার পরল মিসেস গ্রেগ। কাপড়ের বিচিত্র আঁকিবুকি আর লেখাগুলো দেখতে লাগল।

মাথা নাড়ল, 'নাহ্, কিছুই বুঝতে পারছি না। দেখি পাউচটা?...সুন্দর তো। জর্জ খুব পছন্দ করবে। ওরটা এত পুরানো হয়ে গেছে, তামাকই রাখতে পারে না...পুরানো এটাও। তবে ওর এখনকারটার চেয়ে অনেক ভাল।'

'নিন,' পাউচটা মিসেস গ্রেগকে দিয়ে দিল মুসা।

'কাপড়টাও নেবেন?' উদ্বিগ্ন শোনাল কিশোরের কথা। সঙ্কেতের মানে না জেনে হাতছাড়া করতে চায় না।

কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝে হেসে ফেললেন মিসেস গ্রেগ, 'না, ওটা আমার দরকার নেই, কিশোর, তুমি নিয়ে যেতে পারো। এই রশিদ বইটা আমার লাগবে, জর্জকে দিয়ে দেব পাউচটা।...কিন্তু জিনিসটা তোমার কাছে এত দামী মনে হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না...ওই যে, জর্জ এসে গেছে।'

গলা চড়িয়ে চিৎকার করে কানে খাটো স্বামীকে ডাকল সে, 'জর্জ, এই নাও, একটা টোবাকো পাউচ দিলাম তোমাকে। হলঘরে দেয়ালের একটা গর্তের মধ্যে

পেয়েছে ওরা।'

হাতে নিয়ে আঙুল বুলিয়ে জিনিসটা দেখতে লাগল গ্রেগ। বিড়বিড় করে বলল, 'হুঁ, চেহারাটা অদ্ভুত। তবে আমারটার চেয়ে ভাল।' মুখ তুলে ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকাল। 'কিন্তু তোমরা এখনও বাড়ি যাচ্ছ না কেন? একটা তো বাজে। আর দেরি করলে যেতে যেতে ডিনারও সারা হয়ে যাবে।'

'তাই তো!' এতক্ষণে সময়ের কথা মনে পড়ল কিশোরের। 'সত্যি দেরি হয়ে গেছে। বেশি দেরি করে ফেললে আন্টি বকবেন। এই, জলদি চলো তোমরা। মিসেস গ্রেগ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, খুব মজার বিস্কুট খাইয়েছেন।...রাফি গেল কোথায়? এই রাফি, ওখানে কি করছিস। আয় আয়, বেরোই।'

গ্রেগদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় দৌড়ে চলল ওরা। কোনখান দিয়ে সময় পার হয়ে গেছে, উত্তেজনায় খেয়ালই রাখেনি। তাড়াহুড়ো করে হাঁটতে গিয়ে কথা বলতে অসুবিধে হলো ওদের।

হাঁপাতে হাঁপাতে তবু বলল কিশোর, 'কাপড়টায় কি লেখা আছে ভাবছি! রহস্যময় লাগছে আমার কাছে।'

'গুপ্তধনের নকশা নাকি?' মুসার প্রশ্ন। 'কাউকে বলা যাবে?'

'না,' মানা করে দিল জিনা। 'বলা যায় না ওতে কি লেখা আছে। মানে না জানা পর্যন্ত কাউকে বলব না আমরা। তা ছাড়া বলার দরকারটা কি?'

'মুসা যদি মুখ ফসকে অন্য কাউকে বলে দিতে যায়,' হাসতে হাসতে বলল রবিন, 'গতবারের মত টেবিলের নিচ দিয়ে তার পায়ে কষে এক লাথি মারবে।'

'না না, কাউকে বলব না আমি,' তাড়াতাড়ি বলল মুসা। 'এভাবে তোমাদের লাথি মারাটাই বরং রিস্কি। লাথি খেয়ে আমি চিৎকার করে উঠলে সবাই জানতে চাইবে—চেঁচালাম কেন? কৈফিয়ত দিতে দিতে তখন জান সারা।'

তিন

খাওয়া সেরে ওপরতলায় ছেলেদের বেডরুমে চলে এল চারজনেই; না না, পাঁচ—রাফিও আছে। কাপড়টা টেবিলে বিছাল কিশোর। এখানে ওখানে কিছু শব্দ লেখা। একটা কম্পাস আঁকা হয়েছে অস্পষ্টভাবে। ইংরেজি 'ই' অক্ষরটা লিখে 'পূর্বদিক' বোঝানো হয়েছে। মোট আটটা বর্গক্ষেত্র আঁকা রয়েছে। একটা বর্গের ঠিক মাঝখানে আঁকা একটা 'ক্রস' চিহ্ন। পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময়।

'মনে হচ্ছে,' পড়ার চেষ্টা করতে করতে বলল কিশোর, 'এগুলো ল্যাটিন শব্দ। মানে বুঝতে হলে ল্যাটিন জানে এমন কাউকে ধরতে হবে।'

'জিনার আব্বাকে ধরলে কেমন হয়?' পরামর্শ দিল রবিন।

'ভালই হয়।' ভুরু নাচাল জিনা, 'কিন্তু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছেটা কে? দেখা গেল রেগেমেগে কাপড়টা কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিল আমাদের। তারপর ভুলে কোন এক সময় পুড়িয়ে ফেলল। ব্যস, গেল ওটা। এই বিজ্ঞানীগুলোর মেজাজ-মর্জি

বোঝা ভার।'

'তারচেয়ে মিস্টার নরটনকে জিজ্ঞেস করা ভাল,' মুসা বলল। 'তিনি নিশ্চয় ল্যাটিন জানেন।'

'কিন্তু তাঁর ব্যাপারে আরও শিওর না হয়ে আমাদের গোপন কথা বলে দেয়াটা ঠিক হবে না,' কিশোর বলল। 'এমনিতে তো ভাল লোকই মনে হচ্ছে। কিন্তু কিছুই বলা যায় না।'

'সবচেয়ে ওপরে আছে দুটো শব্দ,' বানান করে করে পড়ল রবিন। 'ভায়া অকাল্টা–মানে কি?'

'আমি যদ্দূর পণ্ডিতি করতে পারি,' জবাব দিল কিশোর, 'এর মানে দাঁড়ায় গুপ্তপথ।'

'গুপ্তপথ! গোপন!' চকচক করে উঠল রবিনের চোখ। 'কোন ধরনের পথের কথা বলা হয়েছে, কিশোর?'

'কি করে বলব? আসলেই আমি ঠিক মানে করলাম কিনা, তাই তো জানি না। খানিকটা আন্দাজেই বলেছি।'

'তোমার আন্দাজ ঠিকই আছে,' মুসা বলল। এ ছাড়া আর কি হবে? আরেকটু চেষ্টা করে দেখো তো, আরও কিছু শব্দ বুঝতে পারো নাকি? ল্যাটিনে তো রীতিমত মাস্টার হে তুমি।'

'এত পুরানো আর অস্পষ্ট হয়ে গেছে,' পড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ভুরুতে ভাঁজ ফেলে দিল কিশোর, 'পড়াই যায় না ঠিকমত। বুঝব কি?...নাহ্, আর পারব না।'

'কি আলোচনা করছিলে?' জানতে চাইলেন মিস্টার নরটন। 'মজার কোন ব্যাপার মনে হচ্ছে?' কখন এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছেন, লক্ষ করেনি ওরা।

'তা বলতে পারেন...' বলেই মনে পড়ল মুসার, ফাঁস করে দিচ্ছে। লাথি খাওয়ার ভয়ে চুপ হয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

ব্যাপারটা অত খেয়াল করলেন না মিস্টার নরটন। তা ছাড়া এই সময় ডাক দিল জিনা, 'রাফি, আয় এদিকে। বেরোব।'

ভয়ে ভয়ে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে আছেন মিস্টার নরটন। সেজন্যেই কিশোরকে কাপড়টাও গোটাতে দেখলেন না বোধহয়। আর কোন প্রশ্ন না করে বললেন, 'হাঁটার জন্যে চমৎকার বিকেল।' জিনার দিকে তাকালেন। 'কুকুরটাকে কি সঙ্গে আনবে?'

'নিশ্চয়,' জবাব দিল জিনা। 'ওকে ছাড়া বেড়াতে বেরোই না আমরা।'

'ও! আচ্ছা, ঠিক আছে।' বললেন বটে, কিন্তু মিস্টার নরটনের কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল রাফিকে নেয়ার একবিন্দু ইচ্ছে তাঁর নেই।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'এত করে বলা হলো, ঠিকই ভুলে গেলে। দিয়েছিলে তো আরেকটু হলেই ফাঁস করে।'

'মনে ছিল না,' লজ্জিত স্বরে বলল মুসা। 'যা-ই বলো, মিস্টার নরটন লোক কিন্তু খারাপ নন। শব্দগুলোর মানে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারি কিন্তু।'

'সে দেখা যাবে।' সাবধান করল কিশোর, 'আগেভাগেই তুমি আর কিছু বলে দিয়ো না।'

দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল ওরা। কুকুরটার দিকে সতর্ক নজর রেখেছেন মিস্টার নরটন। রাফিও তাঁর কাছাকাছি যেতে চাইছে না। এক সময় খাতির করার জন্যে মিস্টার নরটন বললেন, 'এই রাফি, বিস্কুট খাবি? আয়, আমার পকেটে বিস্কুট আছে।'

মুখ ঘুরিয়ে রাখল রাফি। কাছে এল না।

খানিকক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেরে দিলেন মিস্টার নরটন। বললেন, 'কুকুরটা বড় অদ্ভুত!'

রেগে গেল জিনা, 'মোটেও অদ্ভুত কুকুর নয় ও! দুনিয়ার সেরা কুকুর।'

'বেয়াদবের মত কথা বলো তুমি। ভদ্রতা শেখোনি।'

তাতে প্রচণ্ড রেগে গেল জিনা। রাফিকে নিয়ে পিছিয়ে গেল। ঘাবড়ে গেল তিন গোয়েন্দা। শঙ্কিত হলো, এবারের বড়দিনটা না একটা নষ্ট দিনে পরিণত হয়! জিনাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত করার জন্যে পিছিয়ে গেল মুসা আর রবিন।

'ওটাই গ্রেগদের ফার্ম?' খামারটা দেখা যেতে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার নরটন।

অবাক হলো কিশোর। 'আপনি চেনেন নাকি, স্যার?'

'না, এই প্রথম দেখলাম। তবে নাম শুনেছি।'

'আজ সকালেও এসেছিলাম এখানে,' বলেই চট করে সবার দিকে তাকিয়ে নিল রবিন। বলাটা কি উচিত হচ্ছে? তবে কারও মুখে কোন ভাবান্তর না দেখে শেষে বলেই ফেলল সকাল বেলা গিয়ে কি সব আজব আজব জিনিস দেখে এসেছে।

চুপচাপ শুনলেন নতুন স্যার। রেশমী কাপড়ে দুর্বোধ্য লেখার কথা শুনে কৌতূহলে ফেটে পড়লেন, 'তাই নাকি? ইনটারেস্টিং তো!...বুড়ো-বুড়ি কি একেবারেই একা বাস করে ওই বাড়িতে?'

'এমনিতে একাই থাকে,' মুসা জানাল। 'তবে এই বড়দিনে দুজন মেহমান আসছে। আর্টিস্ট। কিশোর বলেছে ওরা এলে দেখা করতে যাবে। সে নিজেও ছবি আঁকতে ভালবাসে। তাই দেখা করবে।'

'ও, তাই নাকি। দেখব ওর ছবি আঁকা,' মিস্টার নরটন বললেন। 'তবে ওখানে গিয়ে আর্টিস্টদের বিরক্ত করা উচিত হবে না। ওরা নিশ্চয় নিরিবিলি থাকতে চাইবে।'

জিনা আর রাফি ওদের কারও কথাতেই থাকল না। পেছন পেছন এল দুজনে। মাঝে মাঝে জমে বরফ হয়ে যাওয়া ডোবা কিংবা পুকুরে কাঠি ছুঁড়ে দেয় জিনা। দৌড়ে গিয়ে তুলে নিয়ে আসে রাফি।

খামারবাড়ির কাছে এসে যখন মনে করল গোয়েন্দারা, এবার ঢুকবেন মিস্টার নরটন, তখনই ওদেরকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠলেন তিনি, 'এবার ফেরা যাক। নইলে চায়ের দেরি হয়ে যাবে।'

চার

পরদিন সকালে বিষণ্ন হয়ে গেল ছেলেমেয়েরা। পড়তে বসতে হবে। রবিন যে রবিন, বই পেলে আর কিছু চায় না, সে-ও খুশি হতে পারল না। ছুটির মধ্যে পড়তে

বসা! এ কি কোন কথা হলো!

ছুটির মধ্যে এই পড়ার ব্যবস্থা করার কারণ আছে। পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করেছে জিনা, অন্তত তার বাবা সন্তুষ্ট হতে পারেননি রেজাল্ট দেখে। রেগেমেগে তাই ছুটির মধ্যেও বাড়তি পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন। পত্রিকায় 'শিক্ষক আবশ্যক' বিজ্ঞাপন দিয়ে মিস্টার নরটনকে আনিয়েছেন পড়ানোর জন্যে। তিন গোয়েন্দাকে বেড়াতে আসতে দেখে অখুশি হননি মোটেও। তবে সাফ বলে দিয়েছেন, যতদিন থাকবে, ওদেরও পড়তে হবে স্যারের কাছে। নইলে জিনা একা একা বসে পড়তে চাইবে না। তাঁর যুক্তি, পড়ালেখায় কোন ক্ষতি হয় না। তাহলে ছুটির মধ্যে খানিকটা বাড়তি পড়া পড়লে অসুবিধে কি?

অকাট্য যুক্তি। জবাব দিতে পারেনি তিন গোয়েন্দা। তা ছাড়া জবাব দিতে গিয়ে ধমক শুনতেও রাজি নয় কেউ। এক পারে এখান থেকে চলে যেতে। কিন্তু এত আশা করে বড়দিনের ছুটি কাটাতে এসেছে জিনাদের বাড়িতে, রকি বীচে ফিরে যেতে কি আর ইচ্ছে করে।

পড়ার টেবিলে বসেও কিশোর ভাবছে কাপড়ে আঁকা সাঙ্কেতিক শব্দগুলোর কথা। 'গুপ্তপথ' বলে কি বোঝানো হয়েছে? বাকি শব্দগুলোর মানে না জানলে স্পষ্ট হবে না।

সাড়ে ন'টায় পড়তে বসতে হবে, বলে দিয়েছেন স্যার। সুতরাং সবাই হাজির। বুসার ঘরের গোল টেবিলটা ঘিরে বসে স্যার আসার অপেক্ষা করছে।

'রাফি কোথায়?' ফিসফিস করে জানতে চাইল কিশোর।

'টেবিলের নিচে,' জানাল জিনা।

স্যার এলেন। কালো দাড়িগুলো যেন খাড়া হয়ে রয়েছে গাল আর চিবুকের গায়ে। ঘরে এসে পড়া রোদের আলোয় তীক্ষ্ণ লাগছে দৃষ্টি। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিল, বসতে বললেন।

'প্রথমে গত পরীক্ষার রিপোর্ট দেখব আমি, বুঝতে পারব কে কোন বিষয়ে কাঁচা, তারপর পড়া...আরে, কুত্তাটা টেবিলের নিচে কেন? জিনা, বের করো ওকে।'

জিনাকে ইতস্তত করতে দেখে কঠোর স্বরে আদেশ দিলেন, 'বের করো, নইলে তোমার বাবাকে বলতে বাধ্য হব আমি।'

জ্বলে উঠল জিনার চোখ। কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিল। রাফিকে বলল, 'বেরিয়ে আয়।'

'অত রাগার কিছু নেই,' শান্তকণ্ঠে বললেন স্যার। 'ওকে বাইরে রেখে এসে পড়তে বসো। সময় নষ্ট কোরো না।'

জিনা আর রাফির জন্যে দুঃখ হতে লাগল তিন গোয়েন্দার। কিন্তু কিছু করার নেই। বলতে গেলে মিস্টার পারকারের কাছে গিয়ে বিচার দেবেন মিস্টার নরটন। তাতে হিতে বিপরীত হবে।

পড়া শেষ হলে আধঘণ্টার জন্যে ঘুরতে বেরোল ওরা। বাইরে রোদ আছে, তবে কেমন ধোঁয়াটে। তুষারপাতের জন্যে হয়েছে এ রকম।

মুখ গোমড়া করে রেখেছে জিনা। রাফিকে বের করে দেয়ার ঘটনাটা এখনও মন থেকে দূর করতে পারছে না সে। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল গোয়েন্দারা

কয়েক ঘণ্টার তো ব্যাপার–যতক্ষণ পড়বে কেবল সেই সময়টা রাফির কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে তাকে। কিন্তু বুঝতে চাইল না জিনা। নতুন স্যারের কথা উঠতেই ফুঁসতে শুরু করল সে।

শঙ্কিত হলো গোয়েন্দারা। একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। মিস্টার নরটন আর জিনার মধ্যে যে টক্কর বাধবে কোন সন্দেহ নেই তাতে।

তবে বিকেল বেলা সব ঠিক হয়ে গেল আবার। বড়দিনের বাজার করতে পাঠালেন কেরিআন্টি। বাজার থেকে ফেরার পর ছাত্রদের সঙ্গে ঘরের মধ্যেই খেলা জুড়ে দিলেন নতুন স্যার। যেহেতু পড়ার সময় নয় এখন, সেজন্যেই বোধহয় রাফিয়ানকেও থাকতে দেয়া হলো। ঘর থেকে বের করে দিলেন না।

রাতে বিছানায় যাবার সময় কাপড় ছাড়ার আগে দুই সহকারীর সঙ্গে নকশাটা নিয়ে আলোচনা করল কিশোর। বলল, 'মিস্টার নরটনকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। শব্দগুলোর মানে একমাত্র তিনিই বলতে পারবেন।'

'কি জানি বলাটা ঠিক হবে কিনা!' কান চুলকাল মুসা। 'প্রথম দিকে আমার আগ্রহ থাকলেও এখন আর তাঁকে জানাতে ইচ্ছে করছে না। ভদ্রলোককে কেন যেন আর পছন্দ করতে পারছি না।'

'রাফির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে বলে না তো?'

'কি জানি! তা-ও বুঝতে পারছি না।'

'হুঁ!' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর।

'কিন্তু তুমিই বা হঠাৎ করে তাঁকে জানানোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠলে কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'না জানিয়েই বা লাভ কি? যেটার মানে জানি না সেটা গোপন রাখা না রাখা সমান কথা। জানালে অন্তত মানেটা তো জানতে পারব। তারপর দেখা যাবে কি হয়।'

পরদিন সকাল সাড়ে ন'টায় আবার পড়তে বসা। চলল সাড়ে বারোটা পর্যন্ত। সারাক্ষণ মুখ কালো করে রাখল জিনা, কারণ রাফিকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। স্যারের কথার একটা জবাবও সোজাসুজি দিল না সে।

ল্যাটিন পড়ানোর সময় সুযোগমত জিজ্ঞেস করে ফেলল কিশোর, 'স্যার, ভায়া অকাল্টা মানে কি?'

'ভায়া অকাল্টা?' ভুরু কুঁচকে ফেললেন মিস্টার নরটন। 'গোপন পথ, গোপন রাস্তা–মোট কথা গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা। এ কথা জানতে চাইছ কেন?'

কান খাড়া করে ফেলেছে সবাই। বুকের মধ্যে ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেছে।

'না, এমনি,' প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর। 'মনে হলো তাই জিজ্ঞেস করলাম। থ্যাংক ইউ, স্যার।'

পাঁচ

পরের দু'তিনটে দিন 'গুপ্তপথ' নিয়ে আর আলোচনার তেমন সুযোগ পেল না ওরা। বড়দিন কাছে এসে গেছে। বাজার করা, ঘর সাজানো, আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুদের কার্ড বিলি করা—অনেক কাজ। মুসা আর কিশোর মুসলমান, তাদের বড়দিন নেই; কিন্তু কাজকর্মে জিনা, রবিন আর কেরিআন্টিকে সাহায্য করতে কোন অসুবিধে নেই। তা-ই করছে।

আলোচনা করতে না পারলেও রহস্যময় কাপড়টার কথা মাথা থেকে দূর করতে পারল না কিশোর।

ইতিমধ্যে একটা খবর দিল জিনা, 'মিস্টার নরটন খালি বাবার ঘরের কাছে ছোঁক ছোঁক করে। কাল রাতে আমি জেগে ছিলাম। রাফিও ঘুমায়নি। একটা গল্পের বই পড়ছিলাম। চাপা পায়ের শব্দ শুনে উঁকি দিলাম। মিস্টার নরটন। বাবার ঘর থেকে বেরোচ্ছে। বাবা তখন ছিল না। তার ঘরে কি করতে গেছে মিস্টার নরটন?'

'হয়তো কথা বলতে। আংকেলকে না পেয়ে ফিরে এসেছে,' জবাব দিল রবিন। 'নতুন স্যারকে দেখতে পারো না বলেই সন্দেহ করছ। আংকেলের কাজে আগ্রহ আছে। দুজনে তো বেশ মিল দেখলাম। সুযোগ পেলেই আলাপ করে।'

এটা নিয়ে আর মাথা ঘামাল না কেউ। তবে কৌতূহল দমাতে না পেরে কাপড়টায় কি লেখা আছে একদিন মিস্টার নরটনকে জিজ্ঞেসই করে ফেলল কিশোর। কাপড়টা বের করে ঠেলে দিল টেবিলের ওপর দিয়ে। 'স্যার, দেখুন তো কি লেখা আছে এতে?'

'ও, এজন্যেই ভায়া অকাল্টার কথা জানতে চাইছিলে,' কাপড়টার দিকে তাকিয়ে বললেন স্যার।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বাকি শব্দগুলোরও মানে জানতে চাই।'

'ইনটারেস্টিং,' কাপড়টার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন মিস্টার নরটন। 'কোন একটা গুপ্তপথ কিংবা রাস্তার নির্দেশ রয়েছে এখানে।'

'আমি সেটা আগেই অনুমান করেছিলাম। স্যার, আর কি লিখেছে? রাস্তাটা কোথায়? কিভাবে যেতে হবে?'

'এই আটটা বর্গক্ষেত্র বোঝাচ্ছে আটটা কাঠের বোর্ড কিংবা প্যানেল,' দেখতে দেখতে বললেন মিস্টার নরটন। 'উঁহু, পড়া যাচ্ছে না। এত অস্পষ্ট...সোলাম ল্যাপিডিয়াম...প্যারিস লিগনেয়াস...আর এটা কি?...সেলুলা...হ্যাঁ, সেলুলাই।'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে ছেলেমেয়েরা। নতুন স্যারের কথাগুলো যেন গিলছে। কিন্তু মানে বুঝতে পারছে না। তারপরেও গিলছে।

পড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে কপালে ভাঁজ পড়ে গেল মিস্টার নরটনের। রবিনকে পাঠালেন মিস্টার পারকারের স্টাডি থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে আসার জন্যে।

আতশ কাঁচের ভেতর দিয়ে অনেক বড় দেখাল লেখাগুলো। অনেক স্পষ্ট।

কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগে দেখার পর বললেন, 'পুব দিকে মুখ করা একটা ঘর···আটটা কাঠের প্যানেল, কোথাও একটা ফোকর; পাথরের মেঝে, একটা আলমারি। পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত। বেশ রোমাঞ্চকর।' মুখ তুলে তাকালেন এতক্ষণে। 'কোথায় পেলে এটা?'

'পেয়েছি,' জবাব দিতে দ্বিধা করছে কিশোর। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, স্যার। নিজে নিজে কোনদিন এর মানে বের করতে পারতাম না আমরা। তারমানে বোঝা গেল, গোপন পথটা রয়েছে পুব দিকে মুখ করা কোন একটা ঘরে।'

'সেরকমই তো মনে হচ্ছে,' কাপড়টা গোটাতে গোটাতে বললেন মিস্টার নরটন। 'কোথায় পেয়েছ বললে যেন?'

'বলিনি। কিছু মনে করবেন না, স্যার, এটা আমাদের সিক্রেট।'

ঝকঝকে চোখে কিশোরের দিকে তাকালেন মিস্টার নরটন। 'আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। কত যে উদ্ভট ঘটনার কথা জানা আছে আমার, কল্পনা করতে পারবে না।'

'ঠিক আছে, বলেই ফেলি,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল কিশোর, 'এটা পেয়েছি গ্রেগদের বাড়ির হলঘরে, প্যানেলের আড়ালে লুকানো একটা গর্তে, একটা টোবাকো পাউচের মধ্যে। মনে হয় ওখানেই কোনখান থেকে শুরু হয়েছে গোপন পথটা। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে!'

'গ্রেগদের বাড়িতে পেয়েছ, না? পুরানো জায়গা তো, এ ধরনের মজার মজার জিনিস থাকতেই পারে। যাব একদিন দেখতে।'

কাপড়টা সাবধানে পকেটে ভরে রাখল কিশোর। 'থ্যাংক ইউ, স্যার। একটা রহস্যের সমাধান করে দিলেন আপনি, এখন আরেকটা রহস্য হাজির হলো আমাদের সামনে। গোপন পথটা খুঁজে বের করতে হবে ক্রিসমাসের পর একদিন গিয়ে।'

'আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। সাহায্য করতে পারব তোমাদের। কি, নেবে তো সঙ্গে?'

'শব্দগুলোর মানে বলে দিয়ে সাহায্য করেছেন আমাদের; সঙ্গে নিতে আপত্তি নেই।' সহকারীদের দিকে তাকাল কিশোর, 'কি, তোমাদের কিছু বলার আছে?'

মাথা নাড়ল রবিন, 'না। তুমি যা বলবে।'

মুসারও আপত্তি নেই। তবে জিনা চুপ করে রইল। কোন মন্তব্যও করল না, কিছু বললও না।

তাকে খুব একটা গুরুত্বও দিলেন না মিস্টার নরটন। 'বেশ, তাহলে যাব আমরা, গুপ্তপথ খুঁজতে। মজা হবে খুব। কোন একটা প্যানেল সরালেই বেরিয়ে পড়বে রহস্যময় একটা কালো ফোকর—ভাবতেই রোমাঞ্চিত হচ্ছি।'

ছয়

অবশেষে এল বহু আকাঙ্ক্ষিত বড়দিন। সকালে উত্তেজনা নিয়ে ঘুম ভাঙল সকলের।

হই-হুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া আর আনন্দ করে কাটল সারাটা দিন।

রাতে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে বিছানায় পড়ল সবাই। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

জিনার ঘরে তার বিছানার পাশে শুলো রাফি।

অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জিনার। রাত কত হয়েছে বলতে পারবে না। বিছানার পাশে মুখ বাড়িয়ে দেখল, রাফিও পুরো সজাগ। কান খাড়া করে শুনছে।

'কি রে, রাফি?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল জিনা।

মৃদু গরগর করে উঠল রাফি।

'কি দেখলি?'

জবাবে আরেকবার গরগর।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল জিনা। নিশ্চয় কিছু শুনেছে রাফি, নইলে এমন করত না। বোধহয় কুকুরটার গরগরানিতেই ঘুমটা ভেঙেছে ওর। চটি পায়ে দিয়ে গিয়ে আস্তে করে খুলল ভেজানো দরজা। বাইরে উঁকি দিল। রাফি কাছে আসতে বলল, 'খবরদার, কোন শব্দ করবি না।'

পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল দুজনে। বড়দিন উপলক্ষে জ্বালানো রঙিন মোমগুলো সব নিভে গেছে। তবে ফায়ারপ্লেসের আগুনটা ঠিকই আছে।

পাশের ঘর থেকে একটা শব্দ শোনা গেল।

জিনার নিষেধ সত্ত্বেও নিজের অজান্তেই গরগর করে উঠল রাফি।

'চুপ! চুপ!'

কিন্তু চুপ করল না রাফি। আচমকা জিনার পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে নেমে গেল বাকি ক'টা ধাপ। দৌড় দিল পাশের ঘরের দিকে।

জিনাও ছুটল পেছনে।

পাশের ঘরে তখন এলাহি কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। রাফির গোঁ গোঁ, ভারী একটা কিছু পতনের শব্দ, তারপর মানুষের চাপা আর্তনাদ।

দৌড়ে গেল জিনা। নিশ্চয় চোরটোর হবে।

অন্ধকারে দেখা গেল না। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল জিনা।

অবাক হয়ে দেখল শোবার পোশাক পরা মিস্টার নরটন প্রায় চিত হয়ে পড়ে আছেন মেঝেতে। তাঁর পোশাক কামড়ে ধরে রেখেছে রাফি।

জিনাকে দেখেই চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'আরে হাঁ করে দেখছ কি? সরাও না কুত্তাটাকে! সরতে বলো!'

'আপনি এভাবে চোরের মত ঢুকেছিলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'একটা শব্দ কানে এল…ভাবলাম চোরটোর হবে…সরাচ্ছ না কেন কুত্তাটাকে! কামড়ে মেরে ফেলল তো!'

মিস্টার নরটনের গায়ে রাফির দাঁতের ছোঁয়াও লাগেনি, সে শুধু কাপড় কামড়ে ধরে আটকে রেখেছে, কিন্তু তিনি বলছেন কামড়ে মেরে ফেলছে। এই মিথ্যে কথা সহ্য হলো না জিনার।

'আলো জ্বালেননি কেন?' রাফিকে সরতে বলল না সে। নতুন স্যারের দুরবস্থায় খব মজা পাচ্ছে।

'সুইচটা খুঁজে পাইনি। ওরকম উল্টো দিকে যে কেউ সুইচ লাগায় জানতাম না।'

কথাটা সত্যি। সাধারণত দরজার যে পাশে সুইচ লাগানোর নিয়ম, সেপাশে লাগানো হয়নি।

রাফিকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করলেন মিস্টার নরটন। সরল তো না-ই, জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল আরও।

'বাড়ির সবাইকে জাগিয়ে ছাড়বে! আরে সরাও না তোমার কুত্তা।...ওই যে, এতক্ষণে ভাল হয়েছে, মিস্টার পারকার আসছেন।'

মিস্টার পারকারও বোধহয় ভেবেছেন চোর ঢুকেছে। হাতে করে কয়লা খোঁচানোর একটা শিক নিয়ে এসেছেন। ঘরে ঢুকে মিস্টার নরটনের অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। কঠোর স্বরে মেয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই, কি হয়েছে?...রাফি, সর!'

কামড় না ছেড়েই জিনার দিকে তাকাল কুকুরটা। তার মনিব কি বলে শুনতে চায়।

মনিব কিছুই বলল না। সাহস পেয়ে শিকারের গাউন ছেড়ে গোড়ালি কামড়ে ধরতে গেল সে।

'পাগলা কুত্তা!' ককিয়ে উঠলেন মিস্টার নরটন। 'কুত্তাটা পাগল হয়ে গেছে! মেরে ফেলবে আজ আমাকে!'

'এই রাফি, সরলি!' কথা না শোনাতে ওর পিঠে শিক দিয়ে এক বাড়ি মারলেন মিস্টার পারকার। যতটা ব্যথায়, তারচেয়ে বেশি চমকে গিয়ে লাফিয়ে সরে দাঁড়াল রাফি। ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল মিস্টার পারকারের দিকে।

এই সুযোগে এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার নরটন। কাপড় ঝাড়তে লাগলেন। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছেন কুকুরটার দিকে।

গরগর করে মৃদু এক ধমক দিল রাফি। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে। বুঝিয়ে দিল—কিছু করতে এলে কপালে খারাপি আছে!

জিনার বাবার দিকে তাকিয়ে কৈফিয়ত দিলেন মিস্টার নরটন, 'একটা শব্দ শুনে দেখতে এসেছিলাম কি হয়েছে। টর্চ না আনাটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে সুইচটাও খুঁজে পেলাম না। হঠাৎ গায়ের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুত্তাটা। জিনাকে কত করে বললাম কুত্তাটাকে সরাতে, সে টুঁ শব্দটা করল না। একটিবারের জন্যে বলল না কুত্তাটাকে সরতে।'

রাগে লাল হয়ে গেলেন মিস্টার পারকার। মেয়ের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন, 'স্যার যা বললেন ঠিক? তোমার ব্যাপার-স্যাপার কিছুই মাথায় ঢোকে না আমার।'

'কেন এ রকম করেছে, আমি বলছি, স্যার,' অভিযোগের সুরে বললেন মিস্টার নরটন। 'সেদিন কুত্তা সঙ্গে নিয়ে পড়তে বসেছিল। মনোযোগ নষ্ট হচ্ছিল তাতে। কুত্তাটাকে কেন বাইরে রেখে আসতে বললাম, তারপর থেকেই আমার ওপর রাগ।'

'বেশ, আজ থেকে রাতেও কুকুরটার ঘরে ঢোকা বন্ধ,' রায় দিয়ে দিলেন মিস্টার পারকার।

'বাবা!' প্রতিবাদ জানাল জিনা, 'সারারাত ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে থাকলে ও মরে

যাবে…'

'বাইরে থাকবে কেন? ওর ঘরে থাকবে।'

'ওর ঘরেও ঠাণ্ডা।'

'কুকুরের ঘরে কুকুর থাকবে, এটাই নিয়ম। ঠাণ্ডা লাগার কোন কারণ নেই। যা বললাম করবি। আর কোন কথা শুনতে চাই না আমি।…মিস্টার নরটন, আপনি চলে যান আপনার ঘরে। কুত্তাটা আর কিছু করতে পারবে না।'

মিস্টার নরটন বেরিয়ে যাবার পর, জিনার দিকে আরেকবার রাগত চোখে তাকিয়ে, তিনি নিজেও গটমট করে চলে গেলেন তাঁর স্টাডির দিকে।

সাত

পরদিন সকালে পড়তে বসতে হলো না কেরিআন্টি বলে দিলেন, বড়দিনের পরের দিন—আনন্দ একেবারে শেষ হয়ে যায়নি, সুতরাং সেদিনও ছুটি; পড়ার দরকার নেই। বেঁচে গেল ছেলেমেয়েরা।

রাতে কি ঘটেছে জিনার মুখে শুনে প্রচণ্ড হাসির ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও হাসতে পারল না তিন গোয়েন্দা; রাফির দুঃখে ওরা সবাই দুঃখিত। রাতে ঠাণ্ডার মধ্যে কুকুরের ঘরে থাকাটা মেনে নিতে পারল না কেউ। তবু, পারকার আংকেলের মুখের ওপর কোন কথা বলার সাহস কারও নেই।

'বসে বসে এ সব আলোচনায় শুধু মেজাজই খারাপ হবে,' কিশোর বলল। 'তারচেয়ে চলো, গ্রেগদের ফার্মে গিয়ে গুপ্তপথটা খুঁজে বের করি।'

রাজি হয়ে গেল সবাই।

হই-চই করতে করতে খামারবাড়ির দিকে যাওয়ার জন্যে বেরোল। বেরোনোর মুখে বাগনের গেটে দেখা হয়ে গেল মিস্টার নরটনের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ?'

মিথ্যে বলতে পারল না কিশোর।

'আমাকে না সঙ্গে নেবে কথা দিয়েছিলে? আমিও যাব।'

মুখ আবার কালো হয়ে গেল জিনার। মিস্টার নরটন সঙ্গে যাবেন শুনে সে আর কোনমতেই খামারবাড়িতে যেতে রাজি হলো না। রাফিকে নিয়ে চলে গেল আরেকদিকে।

কি আর করা। মিস্টার নরটনকে এখন আর মানাও করতে পারে না। শেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়েই খামারবাড়িতে চলল তিন গোয়েন্দা।

বেশ খাতির করল মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গ্রেগ। নিয়ে গিয়ে বসাল বিশাল রান্নাঘরে। খেতে দিল গরম দুধ আর বনরুটি।

'গোপন কিছু খুঁজতে এলে নাকি?' হেসে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মিসেস গ্রেগ।

'একটা ঘর খুঁজতে এসেছি যেটা পুবমুখো, মেঝেটা পাথরের, কাঠের প্যানেল

করা দেয়াল।'

'নিচতলার সবগুলো ঘরের মেঝে পাথরের। যেখানে খুশি খুঁজতে পারো। তবে ওপরতলার আলমারিওয়ালা ঘরটায় যাবে না, ওখানে মেহমান আছে।'

'ঠিক আছে,' বলল বটে, মনে মনে হতাশ হলো কিশোর। ওই আলমারিওয়ালা ঘরটায় আরেকবার ভালমত খুঁজে দেখার ইচ্ছে ছিল তার। আশা ছাড়তে পারল না। 'মিসেস গ্রেগ, ওঁরা দুজন চলে এসেছেন নাকি? একটু কথা বলার ইচ্ছে ছিল। বলা যাবে? আমারও আর্টিস্ট হওয়ার বড় শখ।'

'বলো কি! ছবি এঁকে কি আর কেউ টাকা কামাতে পারে নাকি? খাবে কি?'

'খাওয়ার কথা ভাবলে কি আর ছবি আঁকা যায়। সে অন্য জিনিস,' ভারিক্কি চালে বিজ্ঞের মত জবাব দিল কিশোর।

তাতে মিসেস গ্রেগের অবাক হওয়া সামান্যতম কমল না। 'এ সব শিল্পী-সাহিত্যিকেরা বড় আজব লোক! খেতে পাবে না জেনেও···যাকগে, যা করতে এসেছ করোগে। তবে আমি অনুমতি দিলেও ওদের সঙ্গে এখন কথা বলতে পারবে না তুমি। ঘরে নেই। বেরিয়ে গেছে।'

দুধ আর রুটি খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল গোয়েন্দারা। পুব দিকে মুখ করা যতগুলো ঘর আছে এ বাড়িতে, সবগুলো খুঁজবে, যতক্ষণ না গুপ্তপথটা পাওয়া যায়।

'পুব দিক কোনটা, মিসেস গ্রেগ?' জানতে চাইল কিশোর।

'রান্নাঘরটা উত্তরমুখো,' মিসেস গ্রেগ বললেন। 'তারমানে ওটা হলো পুব,' ডানে দেখালেন তিনি।

'থ্যাংকস,' বলে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'এসো।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। ডানে ঘুরল। তিনটে ঘর আছে, জিনিসপত্র মাজাঘষা আর ধোয়ার জন্যে। এখন আর তেমন ব্যবহার হয় না। দরকার পড়ে না। ছোট আরেকটা ঘরকে বসার ঘর হিসেবে ব্যবহার করে মিসেস গ্রেগ। লাগোয়া আরও একটা বড় ঘর আছে, এককালে ড্রইং রুম হিসেবে ব্যবহার হত। এখন ঠাণ্ডা, অব্যবহৃত।

'সব ক'টারই অবশ্য পাথরের মেঝে,' কিশোর বলল।

'তারমানে তিনটে ঘরেই খুঁজতে হবে,' রবিন বলল।

'প্রয়োজন নেই।'

'মানে?'

'দেখছ না, দেয়ালগুলোও পাথরের। কাঠের প্যানেলিং নেই।'

'তাহলে ছোট ঘরটা আর ড্রইংরুমটায় খোঁজা যায়,' মুসা বলল। 'ওগুলোতে প্যানেলিং আছে।'

'তারপরেও কথা আছে–আটটা বর্গাকার তক্তা। তাতে খোঁজার ব্যাপারটা সীমিত হয়ে আসে। খেয়াল রাখতে হবে কোন ঘরে আটটা তক্তা দিয়ে প্যানেলিং করা হয়েছে। শুধু সেসব ঘরেই খোঁজা উচিত। অন্য সব ঘরে খুঁজে অহেতুক পরিশ্রম করার কোন মানে হয় না।'

ঘর দুটোতে খুঁজতে আরম্ভ করল ওরা। ছোটটা দিয়ে শুরু করল। গাঢ় রঙের ওক কাঠের প্যানেলিং। তবে কাপড়ে আঁকা আটটা বর্গক্ষেত্রের মত তক্তা দেখা গেল

না।

পাশের বড় ঘরটায় ঢুকল ওরা। এখানকার প্যানেলিং আবার আরেক রকম। আগেরটার মত পুরানো আর অন্ধকার অন্ধকার লাগে না ঘরটা। বর্গাকার কি-জু তক্তা যা আছে, সেগুলো কাপড়ে আঁকাগুলোর মত নয়। তবু টোকা দিয়ে, চাপ দিয়ে দিয়ে দেখতে লাগল। আশা করছে, যে কোন সময় যে কোনটা সরে যাবে একপাশে কিংবা পেছনে।

কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না।

এই সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপর কথা। ড্রইংরুমে উঁকি দিল একজন হালকা-পাতলা লম্বা লোক। নাকের ওপর বসানো সরু মেটাল ফ্রেমের গোল চশমা।

'হালো,' ডেকে বলল লোকটা, 'মিসেস গ্রেগ বললেন তোমরা নাকি গুপ্তধনের খোঁজ করছ? পেলে নাকি?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল কিশোর। লম্বা লোকটার পেছনে আরেকজনকে দেখতে পেল। প্রথমজনের চেয়ে বয়েস কম। ছোট ছোট চোখ। চেহারার তুলনায় মুখের হাঁ-টা অনেক বড়। 'আপনারাই নিশ্চয় দুই আর্টিস্ট?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল প্রথমজন। 'আসলে কি খুঁজছ তোমরা, বলো তো?'

বলার কোন ইচ্ছে নেই কিশোরের। কিন্তু 'না' বলে দেয়াটাও কঠিন। শেষে বলল, 'হাত লাগলে সরে যায় এমন একটা প্যানেল খুঁজছি।'

'আমরা সাহায্য করব?' ঘরে ঢুকল লোকটা। 'নাম কি তোমার?...আমি জেরি। ও রোবাক। আমার বন্ধু।...তোমাদের?'

নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর। লোকগুলোর সাহায্য চায় না মোটেও। কি করতে কি করে বসবে, সব ভজঘট করে দেবে শেষে।

কিন্তু তাড়াতে পারল না ওদের। জোর করেই সাহায্য করতে এল।

সারা ঘরে ঠুকুর-ঠাকুর শব্দ চলছে, এই সময় দরজা থেকে আরেকটা পরিচিত কণ্ঠ কানে এল, 'বাহ্, সবাই দেখি খুব ব্যস্ত।'

ফিরে তাকাল গোয়েন্দারা। হাসিমুখে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন ওদের নতুন স্যার।

দুই আর্টিস্টও দেখল। মিস্টার নরটনকে দেখিয়ে গোয়েন্দাদের জিজ্ঞেস করল জেরি, 'চেনো নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন, 'আমাদের স্যার।'

'ও।' হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল জেরি, 'আমি জেরম গোয়েঙ্কা।'

পরিচয়ের পালা শেষ হলে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন মিস্টার নরটন, 'তোমাদের হলো?'

'না,' জবাব দিল কিশোর, 'পাইনি এখনও।'

'ফার্মহাউজটা দেখা হয়ে গেছে আমার। আর পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে সারো। না পেলে আজ আর হবে না, আরেকদিন।'

সবাই মিলে চেষ্টা করে দেখল আরেকবার। লাভ হলো না।

মিস্টার নরটন বললেন. 'চলো. মিসেস গ্রেগের কাছে বলে আজ চলে যাই।'

দল বেঁধে রান্নাঘরে ঢুকল ছোটবড় সবাই। গন্ধ শুঁকে নাক টেনে রোবাক বলল, 'বাহ্, দারুণ গন্ধ তো! আমাদের লাঞ্চ রান্না হচ্ছে নাকি, মিসেস গ্রেগ? সত্যি, আপনার রান্নার তুলনা হয় না।'

আড়চোখে রবিন দেখল, মুসাও ঢোক গিলছে। মুচকি হাসল সে।

মিসেস গ্রেগ্র হেসে জিজ্ঞেস করল ছেলেদের, 'যা খুঁজছিলে পেয়েছ?'

'না,' ওদের হয়ে জবাব দিলেন মিস্টার নরটন। 'গুপ্তপথটা খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনও।'

'গুপ্তপথ?' অবাক হলেন মিসেস গ্রেগ। ছেলেদের দিকে তাকালেন। 'ওটার কথা তোমরা জানলে কি করে? আমি তো ভেবেছিলাম লোকে সব ভুলেই গেছে…'

'তারমানে আপনি জানেন ওটার কথা!' প্রায় চিৎকার করে উঠল কিশোর।

'আছে জানি, তবে কোনখানে আছে জানি না। আমার দাদীশাশুড়ির মুখে শুনেছিলাম ওটার কথা।'

'যা যা শুনেছেন, মনে করুন, মিসেস গ্রেগ, প্লীজ!' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে কিশোরের। 'গুপ্তপথটা আসলে কি, তা জানেন?'

'কোন ধরনের সুড়ঙ্গ ওটা। আমাদের ফার্মহাউজের তলা দিয়ে চলে গেছে কোন দিকে। সাগরের দিকেও যেতে পারে। সৈকতে বেরিয়ে নৌকা নিয়ে পালানোর জন্যে। দাদীশাশুড়ি বলতেন, আগের দিনে শত্রুর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্যে নাকি তৈরি হয়েছিল এই সুড়ঙ্গ।'

আর কিছু জানে না মিসেস গ্রেগ। সূত্র পেল না বলে হতাশ হলো কিশোর। মহিলা আরেকটু বেশি জানলে কি এমন ক্ষতি হত?

এত খোঁজাখুঁজি করেও লাভ হলো না কোন। সকালটা মাটিই হলো ধরে নিতে হয়। মিসেস গ্রেগের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে চলল ওরা।

বাড়ি ফিরে দেখল, জিনা বসে আছে। ওদের দেখে জিজ্ঞেস করল সে, যে উদ্দেশ্যে গিয়েছিল সেটা সফল হয়েছে কিনা।

'পুব দিকে মুখ করা দুটো ঘরে প্যানেলিং দেখেছি আমরা, দুটোরই পাথরের মেঝে,' কিশোর বলল, 'কিন্তু গুপ্তপথের মুখটা পাওয়া যায়নি।'

'দুই আর্টিস্টের সঙ্গেও দেখা হয়েছে আমাদের,' রবিন জানাল। 'একজন লম্বা, হালকা-পাতলা, নাকে বসানো চশমা। ওর নাম জেরি। আরেকজনের অল্প বয়েস, শুয়োরের মত কুতকুতে চোখ, মুখের হাঁ এত্তবড়,' দুই হাত ছড়িয়ে দেখাল রবিন। 'ওর নাম রোবাক।'

'সকালবেলা আমিও দেখেছি ওদের,' জিনা বলল। 'তারমানে ওরাই। মিস্টার নরটন ছিল ওদের সঙ্গে। কথা বলছিল। আমাকে দেখেনি।'

'তা কি করে হয়?' সঙ্গে সঙ্গে বলল রবিন। 'তাহলে আর্টিস্টদের দেখোনি, অন্য কাউকে। মিস্টার নরটন ওদের চিনতেন না। পরে আমাদের সামনে পরিচয় হয়েছে।'

'কিন্তু একজনকে রোবাক বলে ডাকতে শুনেছি মিস্টার নরটনকে,' জিনাও অবাক। 'নিশ্চয় চেনে। নইলে নাম জানল কি করে?'

'হতেই পারে না! মিস্টার নরটনকে দেখে আমাদের জিজ্ঞেস করল জেরি, উনি কে? আমরা বলার পর পরিচয় হলো।'

'কিন্তু ভুল আমার হতেই পারে না,' জোর দিয়ে বলল জিনা। 'যদি চেনে না বলে থাকে মিস্টার নরটন, তাহলে মিথ্যে বলেছে…'

'চুপ!' সাবধান করল কিশোর। 'ওই যে, আসছেন উনি।'

দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন মিস্টার নরটন। 'কোন লাভ হলো না, কি বলো? ড্রইংরুমে খুঁজতে গিয়ে রীতিমত বোকাই বনে এলাম,' তিন গোয়েন্দাকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি। 'যে ঘরটায় খুঁজেছি, ওটার প্যানেলিং তেমন পুরানো না, লক্ষ করেছ? অনেক পরে লাগানো হয়েছে।'

'ওখানে আর খোঁজার কোন অর্থ নেই,' কিশোর বলল। 'ওই খুদে ঘরটাতেও কিছু পাব বলে মনে হয় না। তন্নতন্ন করেই তো খুঁজলাম, কোথায় আর লুকিয়ে থাকবে?'

'যাকগে। আর্টিস্ট দুজনকে কেমন মানুষ মনে হলো তোমার, কিশোর? আমার কিন্তু ভালই লেগেছে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নতুন স্যারের দিকে তাকিয়ে আছে জিনা। সত্যি বলার ভঙ্গিতে মিথ্যে বলছে না তো? ওর কোন সন্দেহ নেই, জেরি আর রোবাকের সঙ্গেই মিস্টার নরটনকে দেখেছে সে। তাহলে না চেনার ভান করছে কেন? রহস্যটা কি?

আট

পরদিন সকাল থেকে আবার পড়ায় বসতে হলো। জিনাও বসল, তবে মুখ গোমড়া করে রাখল। কারণ যথারীতি ঢুকতে দেয়া হয়নি রাফিকে।

রাতে সবাই যখন শুতে গেল, জিনাও গেল। বিছানায় শুয়েও ঘুমাল না সে। জেগে রইল। কান পেতে শুনতে লাগল রাফির কুঁই কুঁই আর্তনাদ। বুক ভেঙে যেতে লাগল কষ্টে। রাগে আগুন হলো নতুন স্যার আর বাবার ওপর।

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে পা টিপে টিপে বেরোল সে। রাফিকে নিয়ে এল ঘরের ভেতর। খুক্‌খুক্ করে কয়েকবার কাশির মত শব্দ বেরোল রাফির গলা দিয়ে। জিনার মনে হলো, ওর ঠাণ্ডা লেগে গেছে। শঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। বাবার স্টাডিতে ঠাণ্ডার মালিশ আছে। উঁকি দিয়ে দেখল, বাবা আছে নাকি। নেই। মা'র চাপাচাপিতে বাধ্য হয়ে বড়দিনের উৎসব করতে গিয়ে তিনিও ক্লান্ত হয়ে সকাল সকাল ঘুমানোর জন্যে বেডরুমে চলে গেছেন।

রাফিকে নিয়ে স্টাডিতে ঢুকল জিনা। তাক থেকে ওষুধের শিশি নামিয়ে মোড়ক খুলল। ওষুধ বের করে ডলে দিল রাফির রোমশ গলায়। এত লোমের মধ্যে মালিশ লাগবে কিনা একবারও ভাবল না। লাগানো দরকার, লাগাল, ব্যস।

খুব ভোরে সবাই ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে—বিশেষ করে বাবা আর মিস্টার নরটন—রাফিকে আবার তার কুকুরের ঘরে রেখে এল জিনা। নিজের ঘরে ঢুকে লেপ টেনে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালবেলা সেদিন পড়ার টেবিলে সবাই হাজির, একমাত্র জিনা ছাড়া। ওর

জন্যে অপেক্ষা করাই সার হলো, এল না সে। জিনার এই বেয়াড়াপনায় মিস্টার নরটন হতবাক। এতটা আশা করেননি তিনি। ভেবেছিলেন ধমক দিলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ধমকে যে আরও বিগড়াবে কল্পনাই করেননি তিনি।

পড়ার সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন মিস্টার পারকার। উদ্বিগ্ন লাগছে তাঁকে। ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এই, তোমরা কেউ আমার স্টাডিতে ঢুকেছিলে?'

ওরা তো অবাক।

'না, আংকেল,' সমস্বরে জবাব দিল ছেলেরা।

'কেন? কিছু হয়েছে নাকি?' জানতে চাইলেন মিস্টার নরটন।

'হ্যাঁ, আমার একটা টেস্ট টিউব ভেঙে পড়ে আছে–গতকাল গবেষণা করেছিলাম ওটা দিয়ে। আমার খাতার তিনটে অতি মূল্যবান পাতাও নেই। ফর্মুলার আসল পাতাগুলো। চেষ্টা করলে আবার হয়তো লিখতে পারব, কিন্তু অনেক সময় লাগবে; কষ্টও হবে। তা ছাড়া এ ভাবে গায়েব হবে কেন! যাবে কোথায়?'

হঠাৎ খেয়াল হলো তাঁর, জিনা নেই ওখানে। জিজ্ঞেস করলেন, 'জিনা কোথায়?'

ছেলেরা জবাব দিল না।

মিস্টার নরটন বললেন, 'পড়তে আসেনি। সকাল থেকেই নাকি দেখা যাচ্ছে না ওকে।'

'পড়তে আসেনি! কেন?'

'কি জানি। রাফিকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না বলেই হয়তো রাগ।'

'মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা গেল না! একদম বখে গেছে। ওর মা কোথায়? কেরি! কেরি! এখানে এসো তো। তোমার মেয়ে নাকি আজ পড়তে আসেনি।'

ঘরে ঢুকলেন কেরিআন্টি। উদ্বিগ্ন চেহারা। হাতে একটা ছোট শিশি। কি আছে ওতে ভেবে অবাক হলো ছেলেরা।

'পড়তে আসেনি?' বললেন তিনি, 'গেল কোথায়?'

'শুধু শুধু ঘাবড়ে যাচ্ছেন আপনারা,' মিস্টার নরটন বললেন। 'কুকুরটাকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছে নিশ্চয় কোনখানে। চলে আসবে। আসল ভাবনা হলো মিস্টার পারকারের স্টাডিতে ঢুকে নাকি কে জিনিসপত্র তছনছ করে রেখে গেছে।'

'তছনছ নয়,' মিস্টার পারকার বললেন। 'একটা টেস্ট টিউব ভেঙেছে। আর আমার ফর্মুলা লেখার খাতা থেকে তিনটে পাতা গায়েব...' স্ত্রীর হাতের দিকে তাকালেন, 'তোমার হাতে এই শিশি কিসের?'

'গলাব্যথার মালিশ। তোমার ওষুধের তাকে খোলা পেলাম। যদ্দূর মনে পড়ে নতুন কিনে এনে রেখেছিলাম ওখানে। মোড়ক খুলল কে? তোমার কি গলাব্যথা হয়েছে?'

আকাশ থেকে পড়লেন মিস্টার পারকার। 'না তো!'

'তাহলে কে খুলল?'

'জিনা খোলেনি তো?'

'সে কেন খুলবে?'

জবাব দিতে পারল না কেউ।

তিনটে রহস্যের কোনটারই কোন সদুত্তর না পেয়ে বিড়বিড় করতে করতে আবার স্টাডিতে চলে গেলেন মিস্টার পারকার।

ছেলেদের ছুটি দিয়ে দিলেন মিস্টার নরটন।

নয়

পাহাড়ী রাস্তার ধারে পাওয়া গেল জিনা আর রাফিকে। ঝোপের ধারে বসে বসে সাগর দেখছিল। আকাশের অবস্থা ভাল না। আগের রাতে তুষার পড়েছে। সাদা করে দিয়েছে দুনিয়াটাকে। আজকেও পড়বে মনে হচ্ছে। ভালমতই পড়বে।

তিন গোয়েন্দাকে ছুটে আসতে দেখে উঠে এগিয়ে গেল জিনা। 'কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, জিনা,' মুসা জানাল, 'তোমার বাবার ফর্মুলার খাতা থেকে তিনটে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে কেউ। একটা টেস্ট টিউবও ভেঙে রেখে গেছে। মিস্টার নরটনের ধারণা, তুমি করেছ এ সব।'

'শয়তান কোথাকার!' দাঁতে দাঁত চাপল জিনা। 'আমি আমার বাবার জিনিস নষ্ট করব, ভাবল কি করে! এ কথা কেন মনে হলো তার?'

'একটা মালিশের শিশি খোলা পাওয়া গেছে মিস্টার পারকারের স্টাডিতে,' রবিন বলল।

'হুঁ, বুঝেছি,' ঠোঁট কামড়ে ধরল জিনা। শিশিটা কেন খুলেছে, বলল সে। 'তবে, টেস্ট টিউব আমি ভাঙিনি, আর খাতার পাতা ছেঁড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

জিনা কখনও মিথ্যে বলে না, জানে ওরা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, 'কার কাজ তাহলে?'

'মিস্টার নরটনের,' সাফ জবাব দিয়ে দিল জিনা। 'আমি শিওর। আমি আর এ রকম লোকের কাছে পড়ব না। বাবা বললে বাবার কথাও শুনব না।'

পাহাড়ী পথ ধরে বাড়ি ফিরে চলল ওরা। আগে আগে চলল রাফি।

জানালা দিয়ে ওদের আসতে দেখে দরজায় এসে দাঁড়ালেন মিস্টার নরটন। জিনার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে? তোমার বাবা ভীষণ খেপে আছেন। স্টাডিতে দেখা করতে বলেছেন।' তারপর তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে অনুযোগের সুরে বললেন, 'আমাকে ফেলেই তোমরা চলে গেলে কেন? আমিও বেরোতাম তোমাদের সঙ্গে।'

'তাই নাকি? জানলে নিয়েই যেতাম। সরি, স্যার,' কিশোর বলল। 'তবে বেশিদূর যাইনি। পাহাড়ের ধারেই পেয়ে গেলাম জিনাকে। ধরে নিয়ে এলাম।'

'জরজিনা,' জিনার দিকে ক্রূর চোখে তাকালেন মিস্টার নরটন, 'কাল রাতে তোমার বাবার স্টাডিতে ঢুকেছিলে?'

'সেকথার জবাব আমি বাবাকে দেব। আপনাকে নয়।'

'তোমাকে ধরে আসলে বেতানো দরকার, তাইলে গিয়ে সোজা হবে। আমি তোমার বাবা হলে তা-ই করতাম।'

'আপনি আমার বাবা নন।' স্যারকে সামান্যতম পাত্তা না দিয়ে গিয়ে স্টাডির দরজা খুলল জিনা। কেউ নেই।

'বাবা নেই,' কাউকে উদ্দেশ্য না করে বলল জিনা।

'চলে আসবেন এখুনি,' মিস্টার নরটন বললেন। 'ভেতরে ঢুকে বসে থাকো।...ছেলেরা, তোমরা গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলে নাও। লাঞ্চের জন্যে।'

জিনার কাছে বসে থাকার ইচ্ছে ছিল তিন গোয়েন্দার। কিন্তু জিনার মত স্যারের আদেশ অমান্য করতে পারল না। ওপরতলায় ওঠার সময় রাফির কান্না কানে এল ওদের। কুঁই কুঁই করে টেনে টেনে ডাকছে সে। বাইরে একা বসে থাকতে ভাল লাগছে না তার।

কয়েক মিনিট পর স্টাডিতে ঢুকলেন মিস্টার পারকার। মেয়েকে দেখেই ধমকে উঠলেন, 'কাল রাতে এ ঘরে ঢুকেছিলে কেন?'

'আর কোন ঘরে গরম ছিল না, তাই। রাফিকে এনে মালিশ মাখিয়ে দিয়েছি। ওর ভীষণ ঠাণ্ডা লেগেছিল।'

এ রকম সরাসরি জবাব আশা করেননি মিস্টার পারকার। থমকে গেলেন। তারপর বললেন, 'কাল রাতে আমার একটা টেস্ট টিউব ভেঙে রেখে গেছে কেউ। আমার খাতা থেকে তিনটে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।'

'আমি করিনি এ সব।'

'তাহলে কে করল?'

'আমি জানি না।'

'ক'টা সময় ঢুকেছিলে?'

'তুমি শুতে গেলে এগারোটায়। আমি ঢুকেছি একটায়। তারপর থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত এখানেই ছিলাম। অকাজটা যে করেছে, করেছে এগারোটা থেকে একটার মধ্যে।'

'আশ্চর্য! কে করল এমন কাজ? ঠাণ্ডা আসে বলে জানালা ভালমত আটকে রেখেছিলাম আমি, মনে আছে। তা ছাড়া আমার খাতার খবর, পাতাগুলোয় কি লেখা আছে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। অদ্ভুত কাণ্ড!'

'মিস্টার নরটন হয়তো জানেন,' জিনা বলল।

'কি সব বাজে কথা বলছ! জানেনও যদি, চুরি করতে আসবেন নাকি? যত সব আবোল-তাবোল চিন্তা ঘুরঘুর করে তোমার মাথার মধ্যে। মিস্টার নরটন খুব ভালমানুষ।' হঠাৎ মনে পড়ল মিস্টার পারকারের, জিনা আজ পড়তে বসেনি। সঙ্গে সঙ্গে রেগে উঠলেন তিনি, 'পড়তে বসোনি কেন আজ?'

'মিস্টার নরটনের কাছে আমি আর পড়ব না,' বলে দিল জিনা। 'ওকে আমি ঘৃণা করি।'

'ভদ্রভাবে কথা বলো!' ধমকে উঠলেন মিস্টার নরটন। 'তুমি কি চাও রাফিকে একবারে বিদেয় করে দিই বাড়ি থেকে?'

'রাফিকে বের করে দিলে আমিও বেরিয়ে যাব বাড়ি থেকে,' সমান তেজে জবাব দিল জিনা। 'দরকার হয় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব, তবু অমানুষদের বাড়িতে আর থাকব না।'

রাগে কথা হারিয়ে ফেললেন মিস্টার পারকার। সেই সঙ্গে অসহায় বোধ করতে লাগলেন। এ রকম 'বেয়াড়া' মেয়েকে সামলানোর উপায় তাঁর মাথায় এল না। মনে পড়ল ছেলেবেলায় তাঁকে নিয়েও ঠিক এমন সমস্যাতেই পড়েছিলেন তাঁর বাবা-মা। তাঁদের ভাষায় তিনিও ভীষণ 'বেয়াড়া' ছিলেন।

'বসে থাকো এখানে, আমি আসছি,' মেয়েকে সামলানোর ভার আপাতত স্ত্রীর ওপর ছেড়ে দিয়ে বাঁচতে চান মিস্টার পারকার।

বুঝে ফেলল জিনা। বলল, 'মা'র সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছ তো? যাও। তবে দয়া করে মিস্টার নরটনের সঙ্গে কিছু বোলো না। তার কোন কথা আমি শুনব না। বাবা, রাফিকে ঘরে থাকতে না দিয়ে একটা মস্ত ভুল করেছ তুমি। ও থাকলে চোরের বাপেরও সাধ্য ছিল না তোমার জিনিস চুরি করে।'

জবাব দিলেন না মিস্টার পারকার। তবে বুঝতে পারলেন জিনা ঠিকই বলেছে। কুকুরটা ঘরে থাকলে এই অঘটন ঘটতে পারত না। ঘেউ ঘেউ করে বাড়ি মাথায় করত। কিন্তু বাইরে থেকে চিৎকার করল না কেন? চোরকে কি দেখেনি? না-ও দেখতে পারে। ওর ঘরটা স্টাডির উল্টো দিকে।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন মিস্টার পারকার। চেয়ারে বসে চুপচাপ ম্যান্‌টল্‌পিসে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল জিনা। টিক-টিক টিক-টিক শব্দ করেই চলছে ওটা। ভীষণ মন খারাপ লাগছে ওর।

ম্যান্‌টল্‌পিসের পেছনে প্যানেলের দিকে চোখ পড়ল। আর কোন কাজ না থাকায় আনমনেই গুনতে আরম্ভ করল। আটটা। আট! কোথায় যেন শুনেছে? ও, হ্যাঁ, গ্রেগদের বাড়িতে পাওয়া কাপড়টাতে। আটটা প্যানেলের কথা লেখা আছে। যেখানে এ রকম আটটা প্যানেল থাকার কথা সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি, গ্রেগদের ফার্মে; অথচ রয়েছে কিনা ওদের বাড়িতে—একেবারে চোখের সামনে।

নিজের অজান্তেই জানালার বাইরে চোখ চলে গেল জিনার। বুঝতে চাইছে পুবমুখো ঘর কিনা।

আরি হ্যাঁ, পুবমুখোই তো! সূর্য দেখেই বোঝা যায়।

আটটা প্যানেল আছে। ঘরটা পুবমুখো। মেঝেও কি পাথরের?

চোখ নামাল নিচের দিকে। কার্পেটে ঢাকা মেঝে। উঠে দেয়ালের কাছে চলে এল সে। কার্পেটের কিনার ধরে টান দিল।

কি কাণ্ড! মেঝেটাও পাথরের!

ফিরে এসে চেয়ারে বসে ভাবতে লাগল সে। তাকিয়ে আছে প্যানেলগুলোর দিকে। কোনটাতে ক্রস চিহ্ন থাকার কথা মনে করার চেষ্টা করল।

দূর! কি সব ভাবছে। এটা গ্রেগদের ফার্ম নয়। এখানে প্যানেল থাকলেই বা কি। প্যানেল অনেক বাড়িতেই থাকে, ঘরও পুবমুখো হয়, মেঝে হয় পাথরের। তাই বলে সবখানে রহস্য থাকে না।

কিন্তু অনেক দিন আগে লেখা হয়েছে কাপড়টায়। তখন কোন্ বাড়ির সঙ্গে

কোন্ বাড়ির সম্পর্ক ছিল, যোগাযোগ ছিল, বোঝার উপায় নেই। গ্রেগদের সঙ্গে ওদের বাড়ির যোগাযোগ যে ছিল না, কে বলতে পারে?

উত্তেজিত হয়ে পড়ল জিনা। প্যানেলগুলোতে ঠুকে ঠুকে দেখার কথা ভাবল। বলা যায় না, যদি সরে যায় কোন প্যানেল, বেরিয়ে পড়ে সুড়ঙ্গমুখ···

লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সে। কিন্তু দেখা আর হলো না। খুলে গেল দরজা। ঘরে ঢুকলেন মিস্টার পারকার। থমথমে চেহারা।

'তোমার মা'র সঙ্গে কথা বলে এলাম। সে-ও আমার সঙ্গে একমত–বড় বেশি বেয়াড়া হয়ে গেছ তুমি। শাস্তি দরকার। আজ সারা দিন তোমার ঘরে থাকবে। বেরোতে পারবে না। তিন দিন কুকুরটার দেখা পাবে না। এ ক'দিন ওর দেখাশোনার ভার থাকবে কিশোরের ওপর। দরকার হয়, রবিন আর মুসা কিশোরকে সাহায্য করবে। ওই কুত্তাটার বদ আসর পড়েছে তোমার ওপর। ওটাই তোমাকে খারাপ করছে আরও।'

'না না বাবা, ওর মত ভাল কুকুর আর হয় না···'

'যাও, ঘরে যাও,' দরজাটা খুলে ধরে রাখলেন মিস্টার পারকার। 'ঘর থেকে বেরোবে না। বেরোলে নতুন শাস্তি যোগ হবে। মনে থাকে যেন।'

আর কিছু বলে লাভ নেই। মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল জিনা। সোজা এসে ঢুকল নিজের ঘরে। কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর খাবার নিয়ে এল আইলিন। 'নাও, ওঠো, খেয়ে নাও।'

'রেখে দিয়ে যাও ওখানে,' রাগত ভঙ্গিতে টেবিলটা দেখিয়ে দিয়ে আবার বালিশে মুখ গুঁজল জিনা।

আইলিন বেরিয়ে গেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রাফির কথা ভাবতে লাগল সে। এক ভাবনা থেকে আরেক ভাবনা। বাবার স্টাডির আটটা প্যানেলের কথাও ভাবল।

বাইরে আবার তুষারপাত শুরু হয়েছে। এই দুর্যোগের মধ্যে রাফিকে বাইরে থাকতে হবে ভেবে রীতিমত কান্না পেতে লাগল জিনার। আর তার জন্যে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল মিস্টার নরটনের ওপর। ওই লোকটার জন্যেই এ সব অঘটন ঘটছে।

বাবার চুরি যাওয়া পাতাগুলোর কথা মনে পড়ল তার। সত্যি কি মিস্টার নরটন ছিঁড়ে নিয়েছেন ওগুলো? কেন নেবেন? কি স্বার্থ তাঁর? জবাবটা যা-ই হোক, বাবার কাজের প্রতি তাঁর বেজায় আগ্রহ, এটা গোড়া থেকেই লক্ষ করেছে সে। কায়দা করে রাফিকে ঘরের বার করে দিয়েছেন নিরাপদে স্টাডিতে ঢুকে এ সব অকাজ করার জন্যে। রাফি ঘরে থাকলে যদি বাধা দেয়?

বাইরে থেকে চোর এসে যে চুরি করেনি, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে জিনা। যেদিক দিয়েই আসুক, রাফির চোখকে ফাঁকি দিলেও কানকে দিতে পারত না। চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করত সে, জানা কথা। তারমানে যে চুরি করেছে সে ওর চেনা, সেই লোকটা ঘরের ভেতরই ছিল; আর বাইরের লোক বলতে একমাত্র মিস্টার নরটনকেই বোঝায়।

লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল জিনা। উত্তেজিত হয়ে পড়েছে আবার। যত

নষ্টের মূল ওই লোকটার শয়তানি ফাঁস করে দিতে ব্যস্ত। কিশোরদের সঙ্গে এখন দেখা হওয়া প্রয়োজন। তাহলে সব কথা খুলে বলতে পারে। ঘর থেকে বেরোনো বারণ ওর। ওরা যদি কেবল দেখা করতে আসে এখন, তাহলেই হয়। কিন্তু ওরা কি আসবে? ওদের এখানে আসাও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়নি তো?

দশ

নিষেধই করে দেয়া হয়েছে। কেউ দেখা করতে পারবে না জিনার সঙ্গে।

জিনা আর রাফির শাস্তির কথা শুনে তিন গোয়েন্দারও মন খারাপ হয়ে গেল। ওদের জন্যে কিছু করার কথা ভাবতে লাগল।

রাফি এখনও জানেই না তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। নিজের ঘরে বসে তাকিয়ে আছে তুষারের দিকে। যেদিকে তাকায় সাদা তুষার আর তুষার। অবাক হয়ে হয়তো ভাবছে, এই ঠাণ্ডার মধ্যে তাকে বাইরে ফেলে রাখা হয়েছে কেন? নিতে আসছে না কেন কেউ?

তাই কিশোরকে দেখেই দিল এক লাফ। লাফাতে লাফাতে ছুটে এসে তার কাঁধে দুই থাবা তুলে দিল। গাল চেটে দিল আদর করে। মুসা আর রবিনও আছে কিশোরের সঙ্গে। রাফিকে আপাতত ওর ঘরেই থাকতে বলে ঘরে ফিরে এল ওরা।

মিস্টার নরটন তাঁর ঘরে। নিশ্চয় বিশ্রাম নিচ্ছেন। আপাতত বেরোনোর কোন কারণ নেই। কেরিআন্টিও একটু শুয়েছেন। পারকার আংকেল স্টাডিতে। চুপি চুপি জিনার সঙ্গে দেখা করার এটাই সুযোগ।

কিন্তু সবার একসঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না। জিনার আব্বা-আম্মা কিংবা মিস্টার নরটন এখন কোন কারণে ঘর থেকে বেরিয়ে এলে খোঁজ পড়বে ওদের। জবাব দেয়ার কেউ থাকবে না। তাই ঠিক হলো, মুসা আর রবিন বসে থাকবে বসার ঘরে। কিশোর একা যাবে দেখা করতে।

নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে এল কিশোর। একবার টোকা দিতেই খুলে দিল জিনা। জেগেই ছিল সে, ওদের অপেক্ষায়।

ভেতরে ঢুকেই দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর।

বেশি কথা বলার সময় নেই। সরাসরি কাজের কথায় এল জিনা। তার সন্দেহের কথা জানাল কিশোরকে।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'আমিও এই পথেই চিন্তা করছিলাম। চুরিটা মিস্টার নরটনই করেছেন। পারকার আংকেল নতুন কোন ফর্মুলা আবিষ্কার করেছেন হয়তো। সেটা কোনভাবে জেনে গেছে শত্রুপক্ষ, মানে মিস্টার নরটনেরা। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। টিচার লাগবে বিজ্ঞাপনটা দেখে আর একটা মুহূর্ত দেরি করেনি। সঙ্গে সঙ্গে চাকরির দরখাস্ত পাঠিয়েছে। লুফে নিয়েছে কাজটা।'

'তারমানে তুমিও আমার সঙ্গে একমত যে কাগজগুলো মিস্টার নরটনই চুরি করেছে,' জিনা বলল। 'তারমানে ওগুলো এখনও এ বাড়িতেই আছে। মিস্টার নরটন ঘরে না থাকলে আমি গিয়ে খুঁজে দেখব।'

'সাংঘাতিক রিস্ক নেয়া হয়ে যাবে। যদি কাগজগুলো না পাও, কারও নজরে পড়ে যাও, শাস্তির পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে তোমার।'

'যায় যাক। ওর শয়তানি আমি ফাঁস করবই।'

'তারমানে যাবেই?'

'হ্যাঁ, যাব। তুমি খেয়াল রেখো, কখন সে বেরোয়। বেরোলেই এসে আমাকে খবর দেবে।'

'কিন্তু, জিনা...'

নিচে দরজা লাগানোর শব্দ হলো। কে বেরোচ্ছে এই আবহাওয়ার মধ্যে? জানালার কাছেই বসে আছে কিশোর। উঠে দাঁড়িয়ে কাঁচে নাক ঠেকাল কে বেরোচ্ছে দেখার জন্যে।

তুষারপাত কিছুটা কমেছে।

'মিস্টার নরটন বেরিয়ে যাচ্ছেন,' জানাল কিশোর।

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল জিনা। 'আমি যাচ্ছি!'

'দাঁড়াও, জিনা,' বাধা দিল কিশোর। 'মাথা গরম কোরো না। মিস্টার নরটনের ঘরে ঢুকে তোমাকে কাগজ খুঁজতে কেউ দেখে ফেললে আর রক্ষা থাকবে না। তারচেয়ে বসে থাকো। আমি বরং তাঁর পিছু নিই। আমার সন্দেহ হচ্ছে, গ্রেগ ফার্মে তাঁর দুই সহকারীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। কাগজটা যদি চুরিই করে থাকেন, তাহলে পাচার করতে যাচ্ছেন, ধরা পড়ে যাওয়ার আগেই। নইলে এই তুষারপাতের মধ্যে একা একা তাঁর বাইরে বেরোনোর আর কোন কারণ নেই।'

'যদি দেখো কাগজ পাচার করছে না?'

'তাহলে তখন তাঁর ঘর খুঁজে দেখার কথা ভাবা যাবে। সেটা করারও প্রয়োজন পড়বে না তোমার। আমরা তিনজন তো রয়েছিই।'

কিশোরের কথায় আপাতত শান্ত হলো জিনা। 'বেশ, কি করে এলে জানিয়ো। আমি অস্থির হয়ে থাকব। আর রাফিকে একটু দেখো।'

'ওর জন্যে একটুও ভেবো না তুমি। তুমি কি মনে করেছ ওরা বলেছে বলেই এই তুষারপাতের মধ্যে রাতেও ওকে বাইরে ফেলে রাখব? আইলিন রান্নাঘর থেকে সরলেই পেছনের দরজা দিয়ে এনে ঢুকিয়ে দেব টেবিলের নিচে। কেউ দেখতে পাবে না। সে-বুদ্ধি করেই রেখেছি আমরা।'

'তোমরা থাকাতেই ভরসা। তোমরা না থাকলে যে কি করতাম!'

'দেরি করা যাবে না। আমি যাচ্ছি। নরটনের পিছু নিতে হবে।'

'এতক্ষণ পর খুঁজে পাবে?'

'পাব। তুষারে জুতোর দাগ থাকবে অনেকক্ষণ।'

পা টিপে টিপে নিচে নেমে এল কিশোর। জ্যাকেট পরাই আছে। রাফিকে দেখতে যাওয়ার সময় পরেছিল। কোথায় যাচ্ছে, মুসা আর রবিনকে বলে সামনের

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। বাগানের গেট থেকে বেরোতেই দেখল তুষারে গভীর হয়ে বসে গেছে জুতোর দাগ। অনুসরণ করা কঠিন হলো না মোটেও।

বদলে গেছে প্রকৃতির চেহারা। আকাশের রঙ ধূসর। প্রচণ্ড তুষারপাতের লক্ষণ। এখন কিছুটা কমলেও আবার শুরু হবে, তখন পড়বেও বেশি, এত সহজে আর থামবেও না।

পায়ের ছাপ লক্ষ করে এগিয়ে চলল কিশোর। পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়েছেন নরটন। এখনও দেখা যাচ্ছে না তাঁকে।

চলতে চলতে হঠাৎ একটা ঝোপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। কথা শোনা যাচ্ছে। এদিক ওদিক তাকাল। বড় একটা ঝোপ রয়েছে হাতের বাঁয়ে। কথার শব্দ আসছে তার ভেতর থেকে।

চট করে আরেকটা ঝোপের আড়ালে সরে এল সে। গাছের আড়ালে গা ঢেকে এগোল বড় ঝোপটা লক্ষ করে। আস্তে করে একটা ডাল সরিয়ে উঁকি দিল।

ঝোপটার অন্যপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন মিস্টার নরটন, দুজন লোকের সঙ্গে। এদেরই দেখতে পাবে–আগে থেকে সন্দেহ করলেও দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না কিশোরের। সেই দুজন আর্টিস্ট।

পকেট থেকে ভাঁজ করা কয়েক তা কাগজ বের করে জেরির হাতে দিলেন নরটন।

কোন সন্দেহ রইল না কিশোরের, ওগুলো মিস্টার পারকারের খাতা থেকে ছিঁড়ে আনা অতি মূল্যবান কাগজ, নতুন কিছু আবিষ্কারের ফর্মুলা।

কাগজগুলো ওভারকোটের পকেটে ভরে ফেলল জেরি। আরও দু'চারটা কথা হলো নরটনের সঙ্গে। তারপর রোবাককে নিয়ে হাঁটা দিল উল্টোদিকে।

নরটনও ঘুরে দাঁড়ালেন।

দ্রুত ঝোপের আরেক পাশে সরে গেল কিশোর, রাস্তার উল্টোদিকে, নরটনের চোখে যাতে না পড়ে।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল কিশোর। জেরি আর রোবাকের পিছু নেবে নাকি? না, নিয়ে লাভ নেই। দুজনের কাছ থেকে কাগজগুলো কেড়ে নিতে পারবে না একা। তারচেয়ে ওরা চলে যাক। কোথায় যাবে জানাই তো আছে। সুযোগমত গ্রেগদের খামারে গিয়ে ওগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করা যাবে। এখন এই তুষারপাতের মধ্যে অহেতুক কষ্ট না করে বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল।

নরটনের কয়েক মিনিট পর বাড়ি ফিরল কিশোর। বাইরে থেকে চাপা শিস দিতেই একপাশের একটা দরজা খুলে দিল মুসা। এদিকে কেউ নেই। সবার চোখ এড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল কিশোর। জানালাটা আবার লাগিয়ে দিল।

জ্যাকেটটা খুলে ফেলে আরেক পাশ দিয়ে বসার ঘরে ঢুকল সে। দেখল, ওভারকোট খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখছেন নরটন। কথা বলছেন কেরিআন্টির সঙ্গে।

'বাপরে বাপ!' নরটন বলছেন, 'কি কাণ্ড! এত তাড়াতাড়ি যে এত বরফ জমে যায় এখানে, জানতাম না।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন আন্টি, 'মাঝে মাঝে এখানে সাংঘাতিক বরফ পড়ে। দুদিনেই হাঁটু সমান। তখন গাড়িঘোড়া কিছুই চলতে পারে না। ঘরে আটকে

থাকতে হয়।'

চমকে উঠলেন নরটন, 'তাই নাকি? তাহলে তো মুশকিল!'

'মুশকিল আর কিসের। কয়েকটা দিন বন্দী জীবন খারাপ লাগে না। ঘরে যদি খাবার থাকে। আমাদের আছে। সুতরাং চিন্তা নেই।'

কিন্তু নতুন স্যারের মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ছাপ গেল না, লক্ষ করল কিশোর। দুশ্চিন্তা কেন? কাগজগুলো তো পাচার করে দিয়েই এসেছেন। তাঁর দুই সহকারী ওগুলো নিয়ে কেটে পড়তে পারবে না জেনে দুশ্চিন্তা করছেন? এ ছাড়া আর কোন জবাব ওই মুহূর্তে খুঁজে পেল না কিশোর।

এগারো

রাতের খাওয়া তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলল ওরা সেদিন। বাইরে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে। সেই সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। কেরিআন্টি বললেন, এ হারে চলতে থাকলে দুধওয়ালা, রুটিওয়ালা কেউ আসতে পারবে না। তারমানে কোথাও যাওয়া, কারও সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বন্ধ।

খাওয়ার টেবিলে কথা প্রসঙ্গে মিস্টার নরটন জিজ্ঞেস করেছেন, গ্রেগদের ফার্মেও কি বরফ জমবে নাকি?

বোকার মত প্রশ্ন। এখানে বরফ জমলে মাত্র কয়েক মিনিটের হাঁটাপথ দূরত্বের মধ্যে কি জমা বাকি থাকবে? তবে এই প্রশ্ন থেকে তাঁর উদ্বেগ কতখানি, অনুমান করতে পারল কিশোর। আর উদ্বেগটা কিসের জন্যে, সেটাও তার অজানা নেই।

খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বসার ঘরে বসে টিভি দেখল ওরা। মিস্টার পারকার স্টাডিতে চলে গেছেন আগেই। মিস্টার নরটনও গিয়ে দরজা দিলেন তাঁর ঘরে। কেরিআন্টি চলে গেলেন রান্নাঘরে, আইলিনকে সাহায্য করতে। একটা সেকেন্ড আর দেরি করল না তিন গোয়েন্দা। সোজা চলে এল ওপরতলায়। এখন জিনার ঘরে ঢুকলেও আর দেখার কেউ নেই। মিস্টার নরটনের আসার সম্ভাবনা নেই, মিস্টার পারকার তো গবেষণা ফেলে আসবেনই না, কেরিআন্টিও আসবেন না। তিনি ভাল করেই জানেন পাহারা দিয়ে রুখতে পারবেন না ওদের, রাতে জিনার ঘরে ঢুকে আড্ডা ওরা দেবেই।

তবু সাবধান রইল ওরা। চেঁচামেচি করল না। টোকা দিতেই দরজা খুলে দিল জিনা। নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল তিনজনে।

শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছে জিনা। কিশোরের মুখে সব শোনার পর বলল, 'বলেছিলাম না আগেই, ওটা একটা চোর!'

'চোর তো বুঝলাম,' রবিন বলল, 'কিন্তু কাগজগুলো এখন উদ্ধার করা যায় কিভাবে?'

'যা তুষার পড়ছে, হাঁটা যাবে না এখন এর মধ্যে,' মুসা বলল। 'গ্রেগ ফার্মে

গিয়ে কাগজ উদ্ধারের চেষ্টা করাটা এখন পাগলামি।'

অনেকভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখল ওরা। কাগজগুলো হাতানোর কোন উপায় বের করতে পারল না। শেষে অন্য আলোচনায় চলে গেল।

জিনা বলল, 'বাবার ঘরে তখন বসে বসে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছি।'

'কি?' আগ্রহে গলা বাড়িয়ে এল তিনজনেই।

'কাপড়ে আঁকা বর্গক্ষেত্রের মত আটটা প্যানেল। ঘরটা পুবমুখো, তা-ও লক্ষ করেছি। মেঝেটাও পাথরের।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

রবিন বলল, 'নকশায় লিখল গ্রেগদের ফার্মের কথা, আর পাওয়া যাচ্ছে এখানে!'

নিচের ঠোঁটে ঘনঘন বার দুই চিমটি কাটল কিশোর। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'নকশায় কোন বাড়ির নাম উল্লেখ করা হয়নি। ও বাড়িতে যেহেতু পাওয়া গেছে, ধরেই নিয়েছি ওখানে থাকবে। আসলে রয়েছে এখানে। পুরানো আমলে জিনাদের বাড়িটার মালিকও হয়তো গ্রেগরাই ছিল, সেজন্যেই বিশেষ কোন বাড়ির নাম উল্লেখ করেনি গ্রেগের বড়মা।' জিনার দিকে তাকাল, 'তাহলে এ বাড়িতেই আছে সেই রহস্যময় গুপ্তপথের মুখ!'

'বসে আছি কেন?' উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'চলো, দেখে আসি।'

মুচকি হাসল জিনা, 'দেখে আসবে কি করে? ওটা বাবার ঘর। বাবা এখনও শুতে যায়নি। কেন ঢুকেছ, জিজ্ঞেস করলে কি জবাব দেবে?'

হতাশ ভঙ্গিতে আবার ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল মুসা।

কপাল ডলতে ডলতে কিশোর বলল, 'বিশটা সিংহের সামনে পড়তে রাজি আছি আমি, তবু এখন পারকার আংকেলের সামনে নয়। আরও গেছে জরুরী কাগজপত্র চুরি। খেপে বোম হয়ে আছেন তিনি এখন।'

'তাহলে কখন যাবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'আজ রাতেই। তবে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর।'

অতএব অপেক্ষার পালা।

ঘড়ির কাঁটাটা যেন স্থির হয়ে রইল ওদের জন্যে। কোনভাবেই ওটাকে তাড়াতাড়ি সরাতে পারছে না।

বাইরে গর্জন করে চলেছে ঝোড়ো হাওয়া। জানালার কাঁচে এসে ঝাপটা মারছে। তুষারকণার আস্তর ভারী হচ্ছে।

রাফির জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে জিনার। কিন্তু ওকে আনতেও যেতে পারছে না কিশোররা। কেরিআন্টি আর আইলিন না ঘুমালে যেতে পারবে না।

নিচের আলো নিভে গেল একসময়। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখে এল মুসা। ফিরে এসে জানাল।

পা টিপে টিপে নিচে নামতে লাগল তিন গোয়েন্দা। আগে রাফিকে ঘরে এনে রাখতে হবে। তারপর জিনা সহ যাবে মিস্টার পারকারের স্টাডিতে।

কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকে ওরা অবাক। ওদিক দিয়েই রাফিকে আনতে যেতে

চেয়েছিল। ওদের সাড়া পেয়ে মৃদু গরগর করে উঠল কুকুরটা। ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রথমে মুসার ওপর। আনন্দে আটখানা।

ঘটনাটা কি? ঢুকল কি করে?

কিশোর অনুমান করল, বাইরে থাকলে কুকুরটা যে কষ্ট পাবে, জানেন আন্টি। নিশ্চয় আইলিনকে দিয়ে আনিয়ে নিয়েছেন। জিনাকে জানাননি। দুশ্চিন্তা করে কষ্ট পাক ও, শাস্তি হোক, এটাই চেয়েছেন—কুকুরটাকে অহেতুক কষ্ট দিতে চাননি। অবলা প্রাণী। ওর তো কোন দোষ নেই। জিনার বেয়াড়াপনা ও বাড়ায়নি।

বাইরে থেকে ছিটকানি লাগিয়ে রাফিকে রান্নাঘরে আটকে রেখে চলে গেছে আইলিন।

হালকা হয়ে গেল গোয়েন্দাদের মন। একটা বড় ঝামেলা থেকে বাঁচা গেল। পারকার আংকেল আর কেরিআন্টির নির্দেশ অমান্য করে রাফিকে ঘরে ঢোকালে আর তাঁরা সেটা কোনভাবে জেনে ফেললে ভীষণ রেগে যেতেন। তাঁদের রোষের মধ্যে আর পড়তে হলো না।

জিনাকে সুখবরটা জানানোর জন্যে ফিরে চলল তিনজনে। সঙ্গে যেতে চাইল রাফি। কিন্তু তাকে নেয়া হলো না। ঘরে যে আনা হয়েছে, এই দুর্যোগের মধ্যে বাইরে থাকতে হয়নি, এটাই বেশি। দোতলায় নিয়ে যাওয়া কোনমতেই উচিত হবে না। রাফির শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাকে রান্নাঘরে রেখে আবার অন্যপাশ থেকে দরজায় ছিটকানি লাগিয়ে দেয়া হলো।

বারো

রাত দুপুরে দল বেঁধে মিস্টার পারকারের স্টাডিতে ঢুকল তিন গোয়েন্দা আর জিনা। সুইচ জ্বালল না। টর্চ নিয়ে আসা হয়েছে দুটো। একটা রয়েছে কিশোরের হাতে, আরেকটা মুসার।

ম্যান্টল্পিসের ওপাশে প্যানেলগুলো দেখাল জিনা। একনজর দেখেই নিশ্চিত হয়ে গেল কিশোর, এগুলোর কথাই লিখেছে গ্রেগের বড়মা।

নকশা দেখে সঠিক প্যানেলটা বের করতে বেগ পেতে হলো না কিশোরকে। জোরে চাপ লাগতে দরজার মত ভেতর দিকে সরে গেল অস্পষ্ট ক্রস আঁকা দ্বিতীয় প্যানেলটা। ভেতরে একটা লোহার হাতল দেখা গেল। সেটা নিয়ে চাপাচাপি করতেই ফায়ারপ্লেসের একপাশে ঘড়ঘড় করে কিছু সরে যাবার শব্দ হলো। ভাল করে দেখতেই বোঝা গেল, কার্পেটের নিচে বড় পাথরের টুকরো সরেছে। কার্পেট তুলতে দেখা গেল কালো একটা ফোকর। সিঁড়ি নেমে গেছে।

আনন্দে চিৎকার করে উঠতে গিয়েও মুখে হাতচাপা দিল মুসা। অবশেষে পেয়ে গেছে ওরা সেই রহস্যময় 'গুপ্তপথ'।

এত সহজেই এমন কাকতালীয়ভাবে পেয়ে যাবে এটা, কল্পনাও করতে পারেনি

কিশোর। সেই একই জাতের গুপ্তঢাকনা, লুকানো হাতলের সাহায্যে খোলে–গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে বেশ কয়েকখানে দেখেছে এ রকম। আগের দিনের মানুষগুলো যেন এভাবে ছাড়া গুপ্তদরজা তৈরির আর কোন উপায় জানত না।

'যাই হোক, পাওয়া তো গেল,' রবিন বলল, 'কি করব এখন? বন্ধ করে গিয়ে শুয়ে থাকব?'

'মোটেও না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে গ্রেগ ফার্মের নিচে। জেরি আর রোবাকের কাছ থেকে কাগজ উদ্ধারের কথা হচ্ছিল না? এটাই সুযোগ। রাতের বেলা তুষারপাতের মধ্যে বাইরে দিয়ে যেতে না পারলেও নিরাপদে খুব সহজেই চলে যেতে পারব মাটির নিচ দিয়ে।'

'যদি ছাত ধসে পড়ে পথটা বন্ধ না হয়ে গিয়ে থাকে,' কিশোরের মত অতটা আশা করতে পারল না জিনা।

'হয়েছে কিনা দেখা দরকার।'

'এখন বোধহয় রাফিকে আনা যায়, কি বলে? ও থাকলে সুড়ঙ্গের মধ্যে সুবিধে হবে। গন্ধ শুঁকেই অনেক কিছু টের পেয়ে যাবে ও।'

'হ্যাঁ, সামনে বিপদ থাকলে হুঁশিয়ার করতে পারবে,' জিনার সঙ্গে একমত হলো মুসা। 'আমাদের হয়ে লড়াইও করতে পারবে শত্রুর সঙ্গে।'

সুতরাং নিয়ে আসা হলো রাফিকে। জিনাকে দেখে আনন্দে হুঁশজ্ঞান রইল না যেন আর ওর। ওর কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বার বার গালমুখ চেটে দিতে লাগল। জিনাও আদর করতে লাগল ওকে।

কিশোর বলল হেসে, 'তোমাদের হলো? দেরি করা চলবে না। রাতের মধ্যেই কাজটা শেষ করতে হবে আমাদের। জেরি আর রোবাক ঘুমিয়ে থাকতে থাকতেই।'

'যদি পথটা গ্রেগ ফার্মে গিয়ে থাকে,' জিনা বলল আবার, 'আর যদি পথটা খোলা থাকে।'

'খোলা না থাকলে করার কিছু নেই,' কিশোর বলল। 'তবে আবারও বলছি, এটা গ্রেগ ফার্মেই গেছে, আমি শিওর। নইলে গ্রেগের বড়মা লিখে রেখে যেত না। এ হলো সাধারণ যুক্তির কথা।'

দেরি না করে এক এক করে সুড়ঙ্গে নেমে পড়ল ওরা। কিশোর নামল সবার পরে। মাথার ওপর কার্পেটটা টেনে দিল আবার। গর্তের মুখটা বন্ধ করে দিল। চট করে যাতে কারও নজরে না পড়ে।

জিনার আশঙ্কা ভুল। পথের কোথাও ছাত ধসে পড়েনি। আর জায়গাটা বন্ধ হওয়ায় এতদিন পরেও কোন রকম পরিবর্তন ঘটেনি। আবহাওয়া একই রকম থেকেছে বলে তেমন কোন ক্ষতিই হয়নি ইঁটে বাঁধানো দেয়ালের। প্রায় সোজাসুজি এগিয়ে গেছে।

কয়েক মিনিট চলার পর ইঁটের তৈরি একটা খাড়া দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। লোহার বড় বড় কড়া আর ধাপ বসানো রয়েছে দেয়ালের গায়ে। বেয়ে ওঠার জন্যে।

সবাইকে ওখানে দাঁড়াতে বলে উঠতে শুরু করল কিশোর। ওঠার সময় মনে হলো তার, চিমনি বেয়ে ওপরে উঠছে। নিচে থেকে ওপর দিকে করে টর্চ ধরে রেখেছে মুসা। সেই আলোয় দেখে উঠতে অসুবিধে হচ্ছে না কিশোরের।

কিছুদূর ওঠার পর দেয়ালের গায়ে বড় একটা ফোকর দেখতে পেল। ঢুকে পড়ল তার মধ্যে। একটা প্যাসেজমত আছে। সেটা ধরে কয়েক গজ এগোতে সামনে দেখতে পেল ওক কাঠের দরজা। পুরানো আমলের হাতল লাগানো। সেটা ধরে বার কয়েক মোচড়া-মুচড়ি করতে ঘুরে গেল হাতলটা। টান দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা।

অবাক হয়ে গেল দেখে, সেই আলমারিটার পেছনে ঢুকেছে। সেদিনই পেয়ে যেত পথটা, যদি আরও কিছুক্ষণ থাকত, টর্চ এনে ভালমত দেখত। তারমানে আলমারিটা হলো গ্রেগদের বাড়ি থেকে সুড়ঙ্গে নামার গুপ্তপথ।

এই আলমারির ওপাশেই আছে জেরি আর রোবাক। হয়তো ঘুমাচ্ছে এখন। একা ঢোকাটা উচিত হবে না ভেবে পিছিয়ে এল সে। নেমে এল বন্ধুদের কাছে। কি দেখে এসেছে জানাল।

'কি করব?' জানতে চাইল রবিন।

'সবাই মিলে গিয়ে ঢুকব এখন ওদের ঘরে,' কিশোর বলল। 'কাগজগুলো বের করে নেব যে কোন উপায়েই হোক।'

'রাফি তো উঠতে পারবে না ওখানে,' ওপরদিকে তাকিয়ে বলল জিনা।

'থাক না এখানেই, অসুবিধে কি? কোনভাবে যদি সন্দেহ করে ফেলে আমাদের নতুন স্যার, চলে আসে এখানে, তার ব্যবস্থা করবে তখন রাফি,' হাসল কিশোর। 'ওর বরং এখানেই থাকা উচিত।'

তেরো

আলমারির পেছনে সারি দিয়ে দাঁড়াল চারজনে। সবার আগে রয়েছে কিশোর। খুলে ফেলল আলমারির পেছনটা। ভেতরে কাপড়-চোপড়ে বোঝাই। জেরি আর রোবাক তারমানে বুঝতে পারেনি যে আলমারিটা আসল আলমারি নয়। ভালই হয়েছে। তাহলে হয়তো দরজাটা আটকে রাখত। এত সহজে খুলে আর ঢুকতে পারত না ওরা।

সাবধানে কাপড়-চোপড় সরিয়ে ঘরে ঢুকল কিশোর। জানালা দিয়ে হালকা আলো আসছে। দিনের আলো। ভোর হয়ে গেছে। জেরি আর রোবাক বিছানায় নেই। ঘরের কোনখানেই নেই। বাথরুমে গেল নাকি?

আবার আলমারিতে ঢুকে ফিসফিস করে বন্ধুদের খবরটা জানাল সে। এক এক করে সবাই এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে।

বাথরুমেও নেই দুই চোর। চিন্তিত হলো কিশোর। তবে কি পালাল?

পাশের ঘরে যাওয়ার একটা দরজার দিকে ইঙ্গিত করে জিনাকে বলল সে,

'আমি আর মুসা ওঘরে দেখতে যাচ্ছি, ওরা আছে নাকি। তুমি আর রবিন এ ঘরে খোঁজো কাগজগুলো। পেয়ে গেলে আর দেরি করবে না। চুপচাপ কেটে পড়বে। নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আমাদের জন্যে। খোঁজার আগে দরজার ছিটকানি তুলে দাও,' বাইরে থেকে বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢোকার দরজাটা দেখাল সে।

আস্তে করে দরজা খুলে মুসাকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল কিশোর।

খুঁজতে আরম্ভ করল জিনা আর রবিন।

প্রতিটি ড্রয়ারে খুঁজে দেখল ওরা। বিছানার নিচে, কার্পেটের তলায়, চিমনির খাঁজে–কয়েকটা কাগজ লুকিয়ে রাখা যায়, সম্ভাব্য এমন কোন জায়গাই বাদ দিল না।

কোথাও না পেয়ে দ্বিতীয় ঘরটায় ঢুকল দুজনে। মুসা আর কিশোরও খুঁজছে। পায়নি কিছু।

কি করবে ভাবছে, এই সময় বাইরে শোনা গেল মানুষের গলা।

'দরজা খুলছে না কেন!' জেরির গলা।

'এ ঘরেরটাও তো খুলছে না!' বলল রোবাক। 'তালা লাগিয়ে দিয়েছিলে নাকি?'

'চাবি তো আছেই। দেখি।'

তালার ফুটোয় চাবি ঢোকানোর শব্দ হলো। খুটখাট শব্দ। জেরি বলল, 'তালা ঠিকই আছে। ভেতর থেকে ছিটকানি লাগানো। অবাক কাণ্ড! কে লাগাল?'

'কাগজগুলো ঠিকমত রেখেছ? কেউ আবার নিতে এল না তো? তৃতীয়-কেউ? চোরের ওপর বাটপাড়ি!'

'উঁহু, বেরোনোর সময়ও দেখেছি, আছে। নাস্তা করতে আর ক'মিনিট লেগেছে। বাইরে থেকে ঢুকে এ সময়ের মধ্যে কেউ চুরি করতে পারবে না। তা ছাড়া আমাদের চোখ এড়িয়ে ঢুকল কি করে?'

'কিন্তু ছিটকানিই বা লাগাল কে?'

'তারমানে নিশ্চয় কেউ ঢুকে বসে আছে।' গলা চড়িয়ে ডাকল জেরি, 'মিস্টার গ্রেগ, আপনি ঢুকেছেন ঘরে?'

ফিসফিস করে মুসা বলল, 'চলো, পালাই!'

'দাঁড়াও, দেখি কি করে,' দাঁড়িয়ে রইল কিশোর।

'মিস্টার গ্রেগ, কথা বলছেন না কেন?' চিৎকার করে বলল জেরি।

আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে শেষে দরজা ধাক্কানো শুরু করল দুজনে। বুঝে গেছে, সন্দেহজনক কেউ ঢুকে বসে আছে ঘরের মধ্যে। দরজা ধাক্কানোর বহর দেখেই অনুমান করা যায়, ছিটকানি ভেঙে খোলার চেষ্টা করছে।

আর থাকা নিরাপদ নয়। ওরা ঘরে ঢোকার আগেই বেরিয়ে যাওয়া দরকার।

'চলো,' সহকারীদের নির্দেশ দিল কিশোর। 'আপাতত কাগজ ছাড়াই যেতে হবে। পরে এসে আবার খুঁজব। বোঝা যাচ্ছে, এই তুষারপাতের মধ্যে পালাতে পারবে না তিন চোরের একজনও।'

'তিন কোথায়?' মুসার প্রশ্ন। 'দুজন তো?'

'কেন, আমাদের নতুন স্যারের কথা ভুলে যাচ্ছ? নাটের গুরু তো সে-ই।'

তাড়াহুড়ো করে আবার আলমারির দরজাপথে বেরিয়ে গেল ওরা। সবার পেছনে রয়েছে কিশোর। আলমারি দিয়ে পার হওয়ার পথে তার গায়ে ওভারকোটের ঘষা লাগল।

ওভারকোট!

মনে পড়ে গেল, নরটন যখন কাগজগুলো জেরির হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তখন ওভারকোট গায়ে ছিল জেরির। কোটের পকেটেই রেখেছিল ভাঁজ করা কাগজগুলো।

উত্তেজনায় দুরুদুরু করে উঠল তার বুক। ওদিকে দরজায় ধড়াম ধড়াম শব্দ হচ্ছে। ভেঙে ফেলতে দেরি হবে না। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল সে।

নেই।

দেখল, বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়েছে।

তাড়াতাড়ি হাত বের করে এনে আবার ঢোকাল ডান পকেটে।

ধড়াস করে এক লাফ মারল হৃৎপিণ্ডটা। আছে! ভাঁজ করা কাগজগুলো বের করে আনল। টর্চ জ্বেলে দেখারও প্রয়োজন বোধ করল না। এগুলোই যে সেই মূল্যবান ফর্মুলা, না দেখেও বুঝতে পারল। আলমারি থেকে বেরিয়ে এসে লাগিয়ে দিল পেছনটা। প্যাসেজে ঢুকে লাগাল ভারী ওক কাঠের দরজাটা।

প্যাসেজের শেষ মাথায় চলে গেছে অন্য তিনজন। সবার আগে রয়েছে মুসা। নামতে শুরু করেছে ধাপ বেয়ে। বাকি দুজন অপেক্ষায় আছে। ও নেমে গেলেই নামবে রবিন। তারপর জিনা···

চোদ্দ

কার্পেট সরিয়ে মাথা তুলেই থমকে গেল কিশোর।

অনেক বেশি তাজ্জব হয়েছেন মিস্টার পারকার আর কেরিআন্টি। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন।

নির্বিকার ভঙ্গিতে ওপরে উঠে এল কিশোর। পেছনে এক এক করে উঠল মুসা, রবিন, জিনা এবং সবশেষে রাফিয়ান। কুকুরটা নিজে নিজে উঠতে পারল না, তাকে টেনে তোলা হলো।

'তোমরা!' গর্জে উঠলেন মিস্টার পারকার। 'ওখানে নেমেছিলে কেন?'

'এখানে যে ট্র্যাপডোর আছে, জানতামই না!' বিড়বিড় করে বললেন কেরিআন্টি। 'কিশোর, খুঁজে বের করলে কি করে?'

প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজগুলো বের করল কিশোর। মিস্টার পারকারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন তো আংকেল, এগুলোই আপনার ফর্মুলা কিনা?'

একনজর দেখেই বলে উঠলেন মিস্টার পারকার, 'এগুলোই তো! কোথায়

পেলে? জিনা চুরি করেছিল, তাই না? চাপে পড়ে এখন বের করে দিয়েছে!'

'জিনা নয়, চুরি করেছে আপনার বিশ্বস্ত মিস্টার নরটন। আমাদের নতুন স্যার।'

ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার পারকার, 'মাথাটাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো তোমার?'

'না। শান্ত হয়ে যদি সব শোনেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মিস্টার পারকার। টুলে বসলেন কেরিআন্টি। বাক্স, টুল, চেয়ার, যে যা পেল তাতেই বসে পড়ল তিন গোয়েন্দা আর জিনা। রাফি বসল কার্পেটের ওপর।

গোড়া থেকে বলতে লাগল কিশোর, কিভাবে প্রথম দর্শনেই নতুন স্যারকে অপছন্দ করেছে কুকুরটা, কিভাবে জিনা আর ওদের মনে সন্দেহ ঢুকেছে; কিভাবে মিস্টার নরটনের পিছু নিয়ে দেখে এসেছে কার কাছে কাগজগুলো হস্তান্তর করেছেন তিনি। কিভাবে গুপ্তসুড়ঙ্গটা খুঁজে বের করে কাগজগুলো উদ্ধার করে আনা হয়েছে, খুলে বলল সেসব কথাও।

হতবাক হয়ে গেছেন মিস্টার পারকার। যাকে এত বিশ্বাস করেছেন, সে এই কাজ করেছে শুনে খুব দুঃখ পেলেন। রাফিয়ান আর জিনার ওপর অন্যায় করেছেন বলে দুঃখটা আরও বাড়ল। আচমকা গর্জে উঠলেন, 'কোথায় সেই হতচ্ছাড়াটা! ওর টিচারি আজ আমি বের করেই ছাড়ব!'

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন তিনি। কোন্ অঘটন ঘটিয়ে বসেন, ঠেকানোর জন্যে পেছনে ছুটলেন কেরিআন্টি।

তাঁর কোন কথাই কানে তুললেন না মিস্টার পারকার। হলে ঢুকে ফায়ারপ্লেসের সামনে থেকে কয়লা খোঁচানোর শিকটা তুলে নিয়ে ছুটলেন মিস্টার নরটনের ঘরের দিকে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে থাবা মারতে লাগলেন, 'নরটন! নরটন! বেরোন জলদি! আজ আপনারই একদিন কি আমারই একদিন···দেখাব মজা! আমার স্টাডিতে ঢুকে কাগজ চুরি করেন, এত্তবড় সাহস!'

দরজা খুললেন মিস্টার নরটন। শোবার পোশাক পরা। বিছানা থেকে উঠে এসেছেন। মিস্টার পারকারের মারমুখো মূর্তি দেখে বোকা হয়ে গেলেন। তাঁর হাতের কয়লা খোঁচানোর শিক, পেছনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়ের দল আর রাফিকে দেখে অনুমান করতে অসুবিধে হলো না, তাঁর জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে। শিকের খোঁচা কিংবা কুকুরের কামড় খাওয়ার আগেই চট করে দরজাটা লাগিয়ে একেবারে ছিটকানি তুলে দিলেন ভেতর থেকে।

খানিকক্ষণ তর্জন-গর্জন করে কোনমতেই মিস্টার নরটনকে দিয়ে দরজা খোলাতে না পেরে রাফিয়ানকে হুকুম দিলেন মিস্টার পারকার, 'রাফি, বসে থাক এখানে! পাহারা দে! আমি পুলিশকে ফোন করছি!'

সাধারণ লোকে চলাফেরা করতে না পারলেও পুলিশ ঠিকই এসে হাজির হলো, দল বেঁধে, স্কি করে। আর দরজা না খুলে পারলেন না মিস্টার নরটন। তাঁর হাতে

হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো।

দলের সঙ্গে এসেছেন যে পুলিশ অফিসার, তিনি জানালেন, 'আরও কয়েকজন চলে গেছে গ্রেগ ফার্মে। জেরি আর রোবাককে ধরতে। রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, ফার্ম থেকে বেরিয়ে গেলেও কোনমতেই পালাতে পারবে না ওরা। গোবেল বীচ থেকে বেরোতে পারবে না।'

কয়েক মিনিট পর একটা বিশেষ গাড়ি এসে থামল গেটের বাইরে, বরফের ওপর দিয়েও চলতে পারে এ গাড়ি। গোয়েন্দাদের ধন্যবাদ দিয়ে, মিস্টার পারকার আর কেরিআন্টির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নরটনকে সহ বেরিয়ে গেলেন অফিসার। গাড়িতে তোলা হলো আসামীকে।

তিন গোয়েন্দা আর জিনার মুখে হাসি। রাফিয়ানও খুব খুশি। এবারের বড়দিনে গোবেল বীচে ছুটি কাটাতে আসার পর এ রকম বিমল হাসি আর দেখা যায়নি ওদের মুখে।

* * *

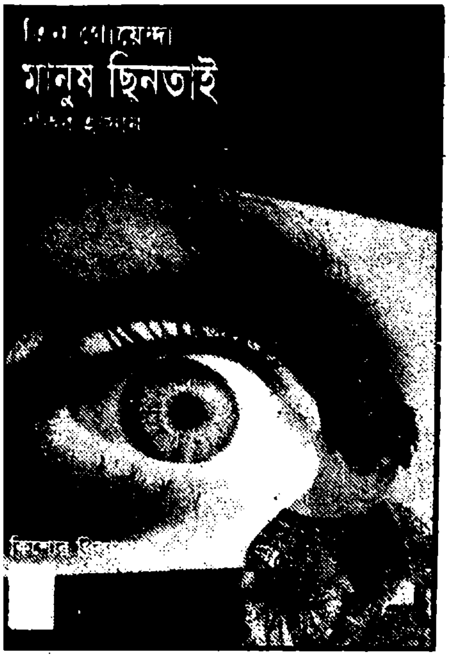

মানুষ ছিনতাই

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

একসঙ্গে ঘটল দুটো ঘটনা।

দরজা ঠেলে লিভিং-রুমে ঢুকল এক মহিলা। এবং সোফার সামনের টেবিলে রাখা রেডিওর স্পীকার খড়খড় করে উঠল।

মহিলার বয়েস তিরিশের কোঠায়। দুই হাতে দুটো বড় বড় সুটকেস। কাঁধে ট্র্যাভেল ব্যাগ। ছিপছিপে গড়ন। সুন্দরী। চোখে চশমা। দেখলে যে কেউ বলবে, স্কুল টীচার। ভারী গলায় ঘোষণা করল, 'আমি মিস এসমারেল্ডা কোয়াড্রুপল।'

'ও…তু-তু-তুমি…মানে…আপনি, এসে গেছেন!' মহিলার কড়া হেডমিস্ট্রেসের মত ভাব-ভঙ্গি দেখে তুমি করে আর বলতে পারলেন না মেরিচাচী। পত্রিকায় হাউস-কীপারের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সেটা দেখে ফোন করেছেন তাঁর বান্ধবী মিসেস জেরাল্ড। বলেছেন, তিনি একজন লোক দেবেন। ক'দিন দেখে পছন্দ হলে রাখবেন, নাহলে বিদেয়। তবে বেতন কিছু বেশি দিতে হবে। রাজি হয়েছেন মেরিচাচী। সত্যিকারের কাজের লোক হলে টাকা তো বেশি দিতেই হবে।

ঘড়ি দেখল মিস কোয়াড্রুপল। 'ঠিক সময়ই তো এলাম। এক মিনিটও দেরি হয়নি।'

'না, তা হয়নি, তবে…'

'তবে কি?'

'না, কিছু না।'

'কিছু না হলে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। প্রথমে আমার থাকার ঘরটা দেখিয়ে দিন। জিনিসপত্রগুলো রেখে আসি। তারপর রান্নাঘরটা দেখান। কাজ বাদ দিয়ে অকারণ কথা বলতে আমার ভাল লাগে না।'

চেয়ারে বসা মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওরা মিস কোয়াড্রুপলের দিকে। শঙ্কিত। ভয় পাচ্ছে, মহিলার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা সহ্য করতে না পেরে কখন ফেটে পড়েন মেরিচাচী। কারণ এমনিতেই তাঁর মন খারাপ। রাশেদ পাশাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা।

কিন্তু তিনি ফাটলেন না। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কটমট করে মিস কোয়াড্রুপলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আচমকা হাসি ফুটল মুখে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার দুই বন্ধুর দিকে তাকাল কিশোর। মুচকি হাসল। ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল—রতনে রতন চেনে। মেরিচাচী কাজ ছাড়া কিছু বোঝেন না, ঘর-সংসারের কাজে সাহায্য করার জন্যে যাকে বহাল করেছেন, সে-ও একটা জিনিস বটে, কথাবার্তায় মনে হচ্ছে মনিবানীর চেয়ে এককাঠি বাড়া।

'বেশ,' উঠে দাঁড়ালেন মেরিচাচী, 'চলুন, মিস কোয়াড্রুপল…'

'অতবড় নাম ধরে ডাকা লাগবে না আমাকে, ম্যা'ম। এত কঠিন নাম আমার নিজেরও পছন্দ না। বাপের নাম, ফেলতেও পারি না, কি করব।'

'ও! তাহলে এসমা…'

'দূর! ও তো আরও বাজে। বলবেন এসমা, উচ্চারণটা বেশির ভাগ সময় হয়ে যাবে অ্যাজমা, হাঁপানী রোগী।'

থতমত খেয়ে গেছেন মেরিচাচী। কোনটা বলতে গিয়ে আবার কোনটা বলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আপনিই বলুন কি নামে ডাকব?'

'ইজি। শুধু ইজি বলে ডাকবেন। ডাকতে ইজি, শুনতে ইজি…আর আপনি-আপনিটা বাদ দেবেন দয়া করে। বিচ্ছিরি লাগে।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল। 'ছেলেগুলো কে?'

'ও আমার ছেলে কিশোর…' বলে থমকে গেলেন মেরিচাচী। বাইরের লোকের কাছে কিশোরকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দেন। ইজিকে বোধহয় বাইরের লোক ভাবতে পারলেন না, তাই শুধরে দিয়ে বললেন, 'আসলে আমি ওর চাচী। ওর বাবা আমার স্বামীর বড় ভাই ছিল। মা-বাবা দুজনেই কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে ওর, ও তখন শিশু; তারপর থেকে আমার কাছেই মানুষ…'

'অ,' মিস কোয়াড্রুপল বলল, 'নিশ্চয় আপনার কোন ছেলেপুলে হয়নি, তাই কিশোরকেই…ঠিক আছে, বুঝলাম।…এই ছেলে দুটো কে?'

'ওরা কিশোরের বন্ধু। ও মুসা আমান…আর ও, রবিন মিলফোর্ড।'

'হাউ ডু ইউ ডু, বয়েজ! আমি তোমাদের ইজি আন্টি। কিছু একটা বলে তো কাউকে ডাকতে হয়। আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বড়, নাম ধরে ডাকা মানাবে না। আর আমি সেটা পছন্দও করব না। ইজি আন্টি বলেই ডাকবে। বোঝা যাচ্ছে, দিনে-রাতে প্রতিদিন বহুবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আমার।' মেরিচাচীর দিকে তাকাল মিস কোয়াড্রুপল, 'চলুন, ম্যা'ম, আমার ঘর…'

মিস কোয়াড্রুপলকে নিয়ে মেরিচাচী বেরিয়ে গেলেন।

'কি বুঝলে?' রবিন আর মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর।

'বুঝলাম,' জোরে বলতে গিয়েও সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল মুসা। চট করে তাকাল দরজার দিকে। ভয়, মিস কোয়াড্রুপল শুনে ফেলল কিনা। 'একেবারে ধেনো-মরিচ! সাংঘাতিক ঝাল!'

'কদ্দিন টিকবে মেরিচাচীর কাছে, সেটা হলো আসল কথা,' রবিন বলল।

'মনে হয় টিকে যাবে,' কিশোর বলল। 'দেখলে না, কথাগুলো কেমন সহ্য করে নিল চাচী। মিস কোয়াড্রুপল কাজের হবে, বুঝে গেছে চাচী…'

কথা শেষ হলো না তার। সামনে রাখা ছোট শর্ট-ওয়েভ রেডিও-সেটটায় বেজে উঠল একটা ধাতব কণ্ঠ: 'বোরিস কলিং কিশোর পাশা! শুনতে পাচ্ছ?'

সচকিত হয়ে উঠল কিশোর। এই মেসেজটার জন্যেই উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ। জবাব দিল, 'কিশোর বলছি! কোথায় আপনারা, বোরিসভাই?'

'রকি বীচ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলাম, তাই দেরি হয়ে গেছে। ল্যান্ড করতে তৈরি হচ্ছে রোভার। অ্যাটাকান থেকে পুরোটা পথ আমাদের পিছু পিছু এসেছে কারা যেন। আমাদের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে রয়েছে ওদের প্লেন।

কাউকে চিনতে পারছি না।'

মাইক্রোফোনের আরও কাছে মুখ নিয়ে গেল কিশোর। 'চাচা কেমন আছে?'

'কোন পরিবর্তন নেই।'

'ঠিক আছে, আসুন আপনারা। আমরা অ্যাম্বুলেন্স রেডি করে রাখছি।'

'হো-কে (ও-কে)! ওভার অ্যান্ড আউট।'

দেরি না করে ডাক্তারকে ফোন করল কিশোর। ল্যান্স নায়ার ওদের পারিবারিক ডাক্তার। আগেই জানিয়ে রাখা হয়েছিল তাঁকে, রাশেদ পাশা ভীষণ অসুস্থ। তিনি কথা দিয়েছেন, এয়ারপোর্টে অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

ঘরে ঢুকলেন মেরিচাচী।

খবর জানাল কিশোর, 'চাচা আসছে। এয়ারপোর্টে যাচ্ছি আমরা। চাচী, তৈরি হয়ে নাও।'

'আমি তৈরিই আছি।' একেবারে সময়মত চলে এসেছে ইজি। বাঁচাল আমাকে। কখন যাবি?'

'এখনই।'

'চল্।...এক মিনিট দাঁড়া, ইজিকে বলে আসি।'

ইয়ার্ডের ঝরঝরে পিকআপটার ড্রাইভিং সীটে বসল মুসা। তার পাশে উঠে বসলেন মেরিচাচী। পেছনের খোলা ট্রাকে চড়ল কিশোর আর রবিন।

ইঞ্জিনের বিকট শব্দ তুলে সামনের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল ট্রাক। ফিরে তাকাল কিশোর। গেটে 'বিক্রি বন্ধ' সাইন বোর্ডটা ঠিকমত ঝোলানো আছে কিনা দেখল। মাল বিক্রি করার মত কেউ নেই এখন ইয়ার্ডে।

রাশেদ পাশার বর্তমান অবস্থার জন্যে দায়ী তাঁর গোয়েন্দাগিরির নেশা। তিন গোয়েন্দার সহপাঠী এবং বন্ধু বিড ওয়াকারের বাবা মিস্টার ড্রেক ওয়াকার একটা কনস্ট্রাকশনের কাজ নিয়েছেন। অ্যাটাকানের বুনো অঞ্চলে রাস্তা বানাচ্ছেন তিনি। ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছেন। তাঁর ধারণা, স্যাবটাজ করছে কেউ।

কন্সট্রাকশন কোম্পানির ব্যবহার করা বাতিল মাল কিনতে গিয়ে স্যাবটাজের কথা শোনেন রাশেদ পাশা। মালগুলো একটা অর্ধেক তৈরি করা ব্রিজের। হঠাৎ করে ধসে পড়েছে। কাউন্টি ইন্সপেক্টর দোষারোপ করছে মিস্টার ওয়াকারকে। বলছে বাজে মাল ব্যবহারের কারণে ব্রিজের এই দুরবস্থা। কিন্তু মিস্টার ওয়াকার বলছেন তিনি খারাপ জিনিস ব্যবহার করেননি। কেন ধসে পড়ল কারণ খুঁজতে গিয়ে একটা সন্দেহজনক জিনিস নজরে পড়েছে তাঁর–ব্রিজের একটা ইস্পাতের স্তম্ভের নাট-বল্টু খোলা। বুঝে গেছেন, স্যাবটাজ করা হয়েছে। কথায় কথায় সেটা রাশেদ পাশাকে জানিয়েছেন। পুরানো মাল বেচাকেনার পাশাপাশি ইয়ার্ডে 'শখের গোয়েন্দা'র সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে বসে আছেন রাশেদ পাশা বহুদিন থেকেই। সুযোগ পেলেই কেস নিয়ে তদন্ত শুরু করেন। মেরিচাচী ঠাট্টা করে বলেন, 'চাচা-ভাতিজা মিলে যে কাণ্ড শুরু করেছ, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড নামটা বদলে পাশা ডিটেকটিভ ইয়ার্ড রেখে দাও। মানাবে ভাল।'

ওকিমুরো কর্পোরেশনের একটা প্লেনে করে রাশেদ পাশাকে অ্যাটাকানে দিয়ে এসেছিল ইয়ার্ডের ব্যাভারিয়ান কর্মচারী রোভার। কন্সট্রাকশন সাইটে যাবার পরদিন

রহস্যময়ভাবে নিখোঁজ হলেন তিনি। সেদিনই বোরিসেরও যাবার কথা। কিন্তু গিয়ে বসের দেখা পেল না। ভাবল, জরুরী কাজে কোথাও গেছেন। রাতে ফিরে আসবেন। কিন্তু তিনি এলেন না। অ্যাটাকানের একটা ছোট্ট শহর ওয়াইল্ড টাউনে হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে রাত কাটাল বোরিস।

পরদিনও ফিরলেন না রাশেদ পাশা। ফিরলেন না তার পরদিনও। পুরো একটা হপ্তা প্রচণ্ড উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটল বোরিসের।

সাত দিন পর ফিরলেন রাশেদ পাশা। খালি হাতে। সঙ্গে যে ব্রীফকেসটা থাকে সচরাচর সেটাও নেই। ভয়ানক অসুস্থ। প্রলাপ বকছেন। স্থানীয় ছোট হাসপাতালটায় নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে। ডাক্তার বললেন, নিউমোনিয়া। জটিল হয়ে গেছে রোগটা। দেরি না করে বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মেরিচাচীকে ফোন করল বোরিস। এক মুহূর্ত দেরি না করে রোভারকে প্লেন সহ ওয়াইল্ড টাউনে পাঠিয়ে দিতে বলল।

রকি বীচ বিমান বন্দরে পৌঁছল গাড়ি। কিশোরের ভাবনায় বাধা দিল রবিন, আকাশের দিকে হাত তুলে বলল, 'ওই যে প্লেনটা! এসে গেছে!'

দুই

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পিকআপ থেকে নেমে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের পাশে দাঁড়াল সবাই। প্লেন নামার অপেক্ষা করছে। সবার চোখ আকাশের দিকে। প্লেনটাকে দেখছে।

রানওয়েতে নামল নীল-সাদা, সিঙ্গল-ইঞ্জিন প্লেনটা। দৌড়ে এসে থামল অ্যাম্বুলেন্সের কাছে।

প্লেনটাকে দেখে ওমরের কথা মনে পড়ল কিশোরের। কারণ এটাকে চালু করার পেছনে ওমরের অবদান অনেক। আপাতত রকি বীচে নেই সে। নিউ ইয়র্কের একটা নতুন বিমান কোম্পানি তাকে ডেকে নিয়ে গেছে জরুরী কিছু কাজ করে দেয়ার জন্যে।

নতুন মনে হলেও প্লেনটা নতুন নয়, তবে ওকিমুরো কর্পোরেশনের হ্যাঙ্গারে নতুন সংযোজন। চাচার সঙ্গে এয়ারপোর্টের ছাউনিতে পুরানো মাল কিনতে গিয়ে ইঞ্জিন ছাড়া বডিটা দেখতে পায় কিশোর। প্রায় অক্ষত। ওমরের সঙ্গে আলোচনা করে কিনে নেয় ওটা। অনেক খোঁজ-খবর করে একই মডেলের একটা অল্প ব্যবহৃত ইঞ্জিন জোগাড় করল ওমর। এনে জুড়ে দিল বডিতে। বডির অল্পবিস্তর মেরামত সেরে রঙ করে নিলে চমৎকার একটা বিমান পাওয়া গেল।

প্রথম থেকেই প্লেনটার প্রেমে পড়ে গেছে রোভার। প্লেনটা মেরামতের সময় প্রচুর সাহায্য করেছে সে। আকাশে ওড়ার তার বেজায় শখ। ওমরের সাগরেদ হয়ে চালানোটা শিখে নিয়েছে। এখন সুযোগ পেলেই উড়াল দেয়।

প্লেন থামতেই সাদা কোট পরা দুজন অ্যাটেনডেন্ট লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল

অ্যাম্বুলেন্স থেকে। ছুটে গেল প্লেনের দিকে।

তিন গোয়েন্দাও এগোল।

খুলে গেল কেবিনের দরজা। মাথা বের করল বোরিস। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্ট্রেচারেই শোয়ানো আছে তোমার চাচাকে।'

লাফ দিয়ে প্লেনে উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা। রাশেদ পাশার অবস্থা দেখে মুখে রা সরে না কারও। এ কি চেহারা হয়েছে! বিধ্বস্ত, ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য। ক'দিনেই চোয়াল বসে গেছে। সারা মুখের মধ্যে চোখে পড়ছে কেবল গোঁফজোড়া। চোখ বোজা। সাবধানে স্ট্রেচারটা নিচে দাঁড়ানো দুই অ্যাটেনডেন্টের হাতে তুলে দিল তিন গোয়েন্দা।

মৃদু স্বরে ফুঁপিয়ে উঠলেন মেরিচাচী।

অ্যাম্বুলেন্সের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্ট্রেচার। পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঝুঁকে তাকিয়ে ডাক দিল কিশোর, 'চাচা! অ্যাই চাচা! শুনছ?'

চোখের পাতা কেঁপে উঠল রাশেদ পাশার। ঠোঁট নড়ল। বিড়বিড় করে কি যে বলছেন কিছু বোঝা গেল না।

'প্রলাপ!' বোরিস বলল। 'সারাক্ষণ এ-ই চলছে। বহু চেষ্টা করেছি, একটা বর্ণও বুঝতে পারিনি।'

অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেয়া হলো স্ট্রেচার। প্লেনের দিকে ফিরল বোরিস। ককপিট থেকে হাত নাড়ল রোভার। তারপর প্লেনটাকে ট্যাক্সিইং করে নিয়ে চলে গেল হ্যাঙ্গারের দিকে। ছাউনিতে রেখে বাড়ি ফিরবে।

অ্যাম্বুলেন্সে রাশেদ পাশার সঙ্গে উঠল মেরিচাচী আর কিশোর। মুসা, রবিন আর বোরিস পিকআপটাতে।

টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে শহরমুখো ছুটল অ্যাম্বুলেন্স।

বোরিসের পাশে বসেছে রবিন। গাড়ি চালাচ্ছে মুসা।

রবিন জিজ্ঞেস করল বোরিসকে, 'কই, আর কোন প্লেন নামতে তো দেখলাম না। কে আপনাদের পিছু নিয়েছিল?'

'বুঝলাম না। সামনে এল না কোনমতে।'

চিন্তিত দেখাল রবিনকে। মুসাকে বলল, 'মুসা, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। আগে ইয়ার্ডে যাও। ট্রেলার থেকে আমাদের টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে আসি। হাসপাতালে আঙ্কেলের বিছানার কাছে রেখে দেব। তিনি কিছু বললেই রেকর্ড হয়ে যাবে। তাঁর কথা থেকে জরুরী সূত্র পাওয়া যেতে পারে। জানা কথা, সূত্রের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে কিশোর।'

নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে রবিনের মাথায়। কে কিডন্যাপ করেছিল রাশেদ আঙ্কেলকে? কোথায় আটকে রেখেছিল? কেউ যে তাঁকে ওয়াইল্ড টাউনে রেখে গেছে কোন সন্দেহ নেই তাতে। কারণ যা অবস্থা, নিজে নিজে আসতে পারার কথা নয়। কিন্তু কেন রেখে গেল?

বোরিস জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ইলার কোন খবর জানো?'

'গতকালও ফোন করেছিল,' রবিন জানাল। 'ভালই আছে।'

ইলা, বোরিসের স্ত্রী। ইয়ার্ড থেকে আধমাইল দূরে শহরের মাঝে একটা

অ্যাপার্টমেন্টে থাকে ওরা।

ইয়ার্ডে পৌঁছল গাড়ি। আবার যেতে হবে। তাই গেটের বাইরে গাড়ি রাখল মুসা। লাফিয়ে নেমে টেপ রেকর্ডার আনতে দৌড় দিল রবিন। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকল। একটা নতুন ক্যাসেট ভরল রেকর্ডারে। বেরিয়ে এসে পিকআপে চড়তে যাবে, শাঁ করে ইয়ার্ডের গেটে এসে থামল একটা ট্যাক্সি। লাফ দিয়ে সেটা থেকে কিশোরকে নামতে দেখে হাঁ হয়ে গেল রবিন। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার?'

'একটা সূত্র পেলাম মনে হচ্ছে!' পকেট থেকে একটা খাম বের করল সে। সাদা রঙের এক ধরনের পদার্থ বের করে দেখাল।

'কোথায় পেলে?' জানতে চাইল রবিন।

'চাচার প্যান্টের পকেটে। এসো। জিনিসটা এখুনি পরীক্ষা করে দেখব।'

মুসা বলল, 'পরে করলে হবে না?'

'না, এখনই করতে হবে। দেরি করলে অনেক সময় সূত্রের আর কোন দাম থাকে না।'

'আমি আসব?'

'আসবে?...না, ঠিক আছে, তুমি বসে থাকো। বেশিক্ষণ লাগবে না আমাদের।'

ল্যাবরেটরির দিকে ছুটল কিশোর। তিন গোয়েন্দার নতুন গবেষণাগার। গ্যারেজের ওপরের ঘরটাকে ল্যাবরেটরি বানিয়েছে ওরা। জঞ্জালের নিচে মোবাইল হোমের হেডকোয়ার্টারে জায়গা খুব কম। বাধ্য হয়ে ওখান থেকে সরিয়ে আনতে হয়েছে ল্যাবরেটরিটা। কম্পিউটার সহ নানা রকম আধুনিক যন্ত্রপাতি বসিয়েছে নতুন ল্যাবরেটরিতে।

কিশোর কিছু না বললেও সাহায্য লাগতে পেরে ভেবে ওদের পিছু পিছু ল্যাবরেটরিতে এসে ঢুকল বোরিস।

প্রথমে মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে সাদা জিনিসটা পরীক্ষা করল কিশোর। গম্ভীর স্বরে জানাল, 'কোন ধরনের পাথরের গুঁড়ো।'

'চুনাপাথর মনে হচ্ছে,' রবিন বলল। 'কেমিক্যাল টেস্ট করলেই তো পারি।'

একটা ফ্লাস্কে গুঁড়োগুলো নিয়ে ঝাঁকাতে লাগল কিশোর। রবিন একটা বীকার ভরে নিল পরিষ্কার চুনের পানি দিয়ে। কাঁচের টিউব দিয়ে দুটো পাত্রের সংযোগ করে দিল কিশোর। ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বোতল থেকে অ্যাসিড ঢেলে দিল গুঁড়োগুলোতে। বীকারে বুদ্বুদ উঠতে শুরু করল। ঘোলাটে হয়ে গেল চুনের পানি। তারপর আবার পরিষ্কার।

'চুনাপাথরই!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। 'বোরিসভাই, অ্যাটাকানে যেখানে ছিলেন আপনারা, তার আশেপাশে চুনাপাথরের খনি আছে?'

'না, দেখিনি। তবে অদ্ভুত চেহারার টিলাটক্কর আর পাথর আছে প্রচুর। শুনে এলাম, একটা ন্যাশনাল পার্ক বানানোর চিন্তা-ভাবনা করছে কাউন্টি। ট্যুরিস্টদের জন্যে বিশেষ আকর্ষণ হবে ওই অস্বাভাবিক পাথরের টিলাগুলো।'

'হাইওয়ে বানানো হচ্ছে যেখানে, তার কাছাকছি?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ. অনেকটাই কাছে।'

পরীক্ষা শেষ। যন্ত্রপাতিগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল দুই গোয়েন্দা। এ সময় বাজল ফোন। জবাব দিল কিশোর। 'হালো, কিশোর পাশা বলছি।...অ্যাঁ! বলেন কি!...ধরুন, বোরিসভাইকে দিচ্ছি!' বোরিসের দিকে তাকাল সে, 'বোরিসভাই, ইলাভাবী। কিছু একটা হয়েছে।'

দুই লাফে কাছে চলে এল বোরিস। থাবা মেরে রিসিভারটা কিশোরের হাত থেকে নিয়ে কানে ঠেকাল। 'কে?...ইলা?' শুনতে শুনতে ভয়ের ছাপ ফুটতে দেখা গেল ওর চোখে-মুখে। 'ঠিক আছে, আমি এখনই আসছি। চুপ করে বসে থাকো।'

রিসিভার রেখে ফিরে তাকাল বোরিস। 'অঘটন! জলদি এসো!'

সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে এল তিনজনে। মিস কোয়াড্রুপলকে দেখল সামনের দরজার কাছে দাঁড়ানো। ডাক দিল কিশোরকে, 'কি ব্যাপার, আসছ-যাচ্ছ...হুড়াহুড়ি...মিস্টার পাশা কেমন আছেন?'

'ভাল না।' বোরিস আর রবিনকে গাড়ির দিকে এগোতে বলে মিস কোয়াড্রুপলের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'আমরা জরুরী কাজে বেরোচ্ছি। বোরিসভাইর বাসায় যাব। আমরা না আসা পর্যন্ত আপনি কাউকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না।'

'ঠিক আছে, দেব না। নিশ্চিন্তে চলে যাও তুমি।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বোরিসদের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এল মুসা। দোতলায় থাকে বোরিসরা। দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। দমকা বাতাসের মত ছুটে ঢুকে পড়ল বোরিস। পেছনে তিন গোয়েন্দা।

'কি হয়েছে?' ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে উঠল বোরিস।

ইজি চেয়ারে মরার মত চিত হয়ে পড়ে ছিল মহিলা। স্বামীকে দেখে মাথা তুলল। ফোঁপাতে শুরু করল।

তার পাশে গিয়ে বসল বোরিস। 'পানি খাবে?'

মাথা ঝাঁকাল ইলা।

গ্লাসে করে পানি আনতে দৌড় দিল রবিন।

পানি খেয়ে কিছুটা আরাম বোধ করার পর কি ঘটেছিল জানাল ইলা। 'বাজার করতে গিয়েছিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে দেখি দরজা খোলা। ভাবলাম, তালা দিয়ে যেতে ভুলে গেছি। ঘরে ঢুকে দেখি অচেনা এক লোক। দৌড়ে এসে আমার মুখ চেপে ধরল। ছুরি বের করে ধমক দিল, টুঁ শব্দ করলে জবাই করে ফেলবে। ভয়ে চুপ করে রইলাম। দড়ি দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখে চলে গেল সে। দাঁত দিয়ে অনেক কষ্টে গিঁট খুললাম। ফোন করলাম কিশোরদের বাড়িতে। কিশোরকে বলার জন্যে। তুমি যে এসে গেছ, জানতাম না।'

চট করে মনে হলো কিশোরের, এ ঘটনার সঙ্গে চাচার কেসের কোন সম্পর্ক নেই তো! ইলাকে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা দেখতে কেমন?'

'বিরাট লম্বা, কালো চুল। ডাকাতের মত চেহারা!'

'ঘরে ঢুকে ভদ্রমহিলার গলায় যে ছুরি ধরে,' মুসা বলল, 'মত আর কি, ডাকাতই তো!'

দরজার তালাটা পরীক্ষা করে এল বোরিস। স্ত্রীকে জানাল, 'তালা তুমি ঠিকই

দিয়ে গিয়েছিলে। খুঁচিয়ে খোলা হয়েছে।'

বসার ঘরে কোন জিনিসে হাত দিয়েছে বলে মনে হলো না। বোরিসের সঙ্গে তার ছোট পড়ার ঘরটায় ঢুকল তিন গোয়েন্দা। কি সন্দেহ হওয়ায় ফাইলিং কেবিনেটের একটা ড্রয়ার খুলে দেখল বোরিস। দ্রুত ভেতরের জিনিসগুলো পরীক্ষা করল। মাথা নেড়ে জানাল, 'না, সবই ঠিক আছে। তাহলে নিলটা কি?'

ওপরের ড্রয়ারটা দেখিয়ে কিশোর বলল, 'ওটা কি? কার্ড ইনডেক্স মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল বোরিস। 'অপরাধীদের নামের তালিকা জোগাড় করে রেখেছি। এ রকম আরেকটা ইনডেক্স আছে তোমার চাচার পড়ার ঘরে, নিশ্চয় দেখেছ।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। বোরিসকে সহকারী বানিয়েছেন চাচা। গোয়েন্দাগিরির তালিম দিচ্ছেন।

ড্রয়ারের ভেতরে একবার দেখেই বলে উঠল বোরিস, 'এটাতেই খুঁজেছে।'

এগিয়ে এল কিশোর। দুদিক থেকে গা ঘেঁষে এল তার দুই সহকারী। সুন্দর করে সারি দিয়ে রাখা কার্ডের মধ্যে দুটো কার্ড সামান্য উঁচু হয়ে আছে। টেনে তুলেছিল, বোঝা যায়। তারপর আর ঠিক করে রাখেনি।

ঠিক করে রাখতে গিয়ে আবার কি ভেবে বের করে আনল বোরিস। দুটোই 'আর' সিরিজের কার্ড। দ্রুত একটা বিশেষ কার্ড খুঁজল সারি দিয়ে রাখা কার্ডগুলোর মধ্যে। ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোরের দিকে। 'রুক রুনাকের কার্ডটা নেই!'

'কে এই রুক রুনাক?'

ঠোঁট গোল করে মৃদু শিস দিয়ে উঠল বোরিস। 'জেলখাটা দাগী আসামী। সাংঘাতিক লোক। ভয়ানক বিপজ্জনক।'

তিন

বাকি কার্ডগুলো ঘেঁটে দেখল বোরিস। সব আছে। আর কোনটাই চুরি হয়নি।

'চাচাকে দেখে বাড়ি ফিরে তার ফাইলগুলোও ঘাঁটব,' কিশোর বলল।

বোরিসকে আর সঙ্গে নিল না কিশোর। ইলার কাছে রেখে দুই সহকারীকে নিয়ে বেরিয়ে এল। বলে এল, নতুন কিছু ঘটলে কিংবা কোন প্রয়োজন পড়লে খবর দেবে।

হাসপাতালে এসে পার্কিং লটে গাড়ি ঢোকাল মুসা।

'চাচাকে গিয়ে এখন ভাল দেখতে চাই,' কিশোর বলল।

লিফটে করে চারতলায় উঠে এল ওরা। কিন্তু ভাল আর দেখল না রাশেদ পাশাকে, আগের মতই অবস্থা। নিচুস্বরে ডাক্তার নায়ারের সঙ্গে কথা বলছেন মেরিচাচী। দুজনেই গম্ভীর। রাশেদ পাশার দিকে চোখ। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত, একই ভাবে প্রলাপ বকছেন।

কিশোরের উদ্বিগ্ন চেহারার দিকে তাকিয়ে স্বস্তি দেয়ার জন্যে ডাক্তার বললেন,

'ডাক্তার পাশা খুবই অসুস্থ, সন্দেহ নেই, তবে রোগটা এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে। নিউমোনিয়া ভাল হয়ে যাবে। তবে তাঁর স্মৃতি ফেরাতে সময় লাগবে।'

রোগীর বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল রবিন আর মুসা। মুখের দিকে তাকাল। রোগ-জর্জর ফ্যাকাসে চেহারা।

আপনমনে বলল রবিন, 'বাধালেন কি করে এ রোগ!'

'অতিরিক্ত অযত্ন,' ডাক্তার জবাব দিলেন। 'সম্ভবত অন্ধকার কোন সেঁতসেঁতে ঘরে ফেলে রাখা হয়েছিল। খাবার, পানি কোন কিছুই ঠিকমত দেয়া হয়নি।'

শক্ত হয়ে গেল কিশোরের চোয়াল। তারমানে মাটির নিচের বন্দিশালা। চাচার পকেটে চুনাপাথরের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।

বালিশে মাথা ঘোরালেন রাশেদ পাশা। চোখ মেললেন না। বিড়বিড় করে কি বললেন বোঝা গেল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মেরিচাচী। কিশোরের দিকে ফিরে বললেন, 'এ রকমই করে চলেছে সারাক্ষণ।'

বিছানার পাশের নাইট টেবিলে টেপ রেকর্ডারটা রাখল রবিন। সকেটে প্লাগ ঢোকাল কিশোর। ঘরে ঢুকল হাসি-খুশি চেহারার একজন নার্স। নাম জানাল মিস জেরিন।

'আজ এখানে আমার নাইট ডিউটি,' বলল সে।

'যদি কিছু মনে না করেন,' পকেট থেকে দুটো নতুন ক্যাসেট বের করে টেবিলে রাখল রবিন, 'একটা কাজ করে দেবেন আমাদের? মেশিনে যে ক্যাসেটটা ভরা আছে ওটা শেষ হলে নতুন আরেকটা ঢুকিয়ে রেকর্ড টিপে দেবেন। রেকর্ড হওয়াটা ড্রয়ারে রেখে দেবেন।'

ভুরু কুঁচকাল নার্স। কৌতূহল হলেও কোন প্রশ্ন করল না। 'ঠিক আছে, দেব। আর কিছু?'

'না, আপাতত এতেই চলবে। থ্যাংক ইউ।'

মেরিচাচীকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করে দিলেন ডাক্তার। 'একটুও চিন্তা করবেন না, মিসেস পাশা। ওষুধে দ্রুত সাড়া দিচ্ছে আপনার স্বামীর শরীর। নিশ্চিন্তে বাড়ি চলে যান।'

রেকর্ডারের সুইচ অন করে দিল রবিন।

মেরিচাচীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।

রান্না সেরে ফেলেছে মিস কোয়াড্রুপল। রাতের খাবারের জন্যে টেবিল সাজাচ্ছে।

'আমরা যাওয়ার পর কেউ এসেছিল, আন্টি?' ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'একজন এসেছিল, তবে ঘরে ঢোকেনি,' টেবিলে প্লেট রাখতে রাখতে জবাব দিল মিস কোয়াড্রুপল। 'ঢোকার উপায়ও ছিল না। সমস্ত দরজা ভেতর থেকে আটকে দিয়ে রান্নাঘরে কাজ করছিলাম আমি। বাইরে থেকে কথা বলেছে আমার সঙ্গে...।'

'কে এসেছিল?'

'মিস্টার হার্ডসন।'

'হার্ডসন?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

'হ্যাঁ, চালা মেরামতের কাজ করে। তোমার চাচা নাকি অ্যাটাকানে যাওয়ার আগে বলে রেখেছিল চিলেকোঠার চালাটা এসে মেরামত করে দিয়ে যেতে। ব্যস্ত ছিল বলে এতদিন আসতে পারেনি। আজ এসেছে।'

'অ, ওই হার্ডসন। করেছে মেরামত?'

'না, দেখেটেখে বলল অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। করতে সময় লাগবে। আরেকদিন এসে করে দিয়ে যাবে।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'চলো, কার্ডগুলো দেখে আসি আগে।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল মিস কোয়াড্রুপল। 'এসেই আবার ফাইল! সারাদিন অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছ। আগে খেয়ে নাও। মাংসের বড়া ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'তুমি বসে যাও। আমরা আসছি।'

দোতলার সিঁড়ির দিকে ছুটল কিশোর। রাশেদ পাশার পড়ার ঘরে ঢুকল। ডেস্ক ড্রয়ারের নিচের একটা গোপন খোপ থেকে লুকানো চাবি বের করে ড্রয়ার খুলল। মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ কার্ডগুলোয় দ্রুত হাত চালাল। 'এখানে হাত দিতে পেরেছে বলে মনে হয় না,' বলল সে। 'সব ঠিকই আছে...' আচমকা চিৎকার করে উঠল, 'কই, না তো! ঠিক নেই! রুক রুনাকের কার্ডটা কোথায়?'

'ভয় নেই, চুরি যায়নি,' টেবিলের ফাইলপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে জবাব দিল রবিন। 'এই দেখো, যা যা সঙ্গে নিয়েছেন, তার একটা মেমো করে রেখেছেন ফাইলে। শুধু কার্ডটাই নয়, রুনাকের পুরো ডসিয়ার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন অ্যাটাকানে।'

'ওহ্, তাই!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'তাহলে কোন সন্দেহ নেই আর, রুক রুনাকই আমাদের লোক।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। রুনাককে খুঁজে পেলে হয়তো কেসের সমাধান করে ফেলা যাবে।'

ড্রয়ার বন্ধ করে তালা লাগিয়ে গিয়ে বোরিসকে ফোন করল কিশোর। প্রথমে ইলা কেমন আছে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ও ভালই আছে,' বোরিস জানাল। 'তা কি খবর?'

'খুব গরম খবর,' চাচার লিখে রাখা তালিকাটার কথা জানাল কিশোর। রুনাক সম্পর্কে কতখানি জানে জিজ্ঞেস করল।

বোরিসের কথা থেকে নতুন একটা তথ্য পাওয়া গেল—রুনাকের চুলের রঙ ধূসর।

'কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?'

'লস অ্যাঞ্জেলেসেই তো থাকত, একটা ভাড়া বাড়িতে। সেখানে গেলে পেতে পারো।'

'তাহলে ওখানেই যাব আমরা,' বোরিসদের বাসায় যে লোকটা ঢুকেছিল বোরিসকে তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর করতে বলে লাইন কেটে দিল কিশোর।

নিচ থেকে শোনা গেল মিস কোয়াড্রুপলের চিৎকার, 'কিশোর, রবিন, কোথায় গেলে তোমরা! খাবার যে জুড়িয়ে গেল!'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রবিন। 'মেরিআন্টির জায়গাটা দিব্যি দখল করে নিয়েছে।'

'চাচীর চেয়েও বেশি কড়া। চলো চলো, আর দেরি করলে বাড়িসুদ্ধ মাথায় করবে।'

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল দুজনে। মুখ তুলে তাকাল মুসা। মুখের দরাজ হাসিই বলে দিচ্ছে ডজনখানেক কিংবা তারও বেশি বড়া ইতিমধ্যেই সাবাড় করে ফেলেছে সে। প্রায় গামলার সমান বড় এক বাটি সুপ এনে টেবিলে রাখল মিস কোয়াডরুপল। রান্নাঘরের বেসিন থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে টেবিলে বসল কিশোর আর রবিন। মেরিচাচীও বসেছেন টেবিলে। খাবার বেড়ে দিতে লাগলেন।

খাওয়ার পর জঞ্জালের নিচের হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

'দুটো কাজ এখন আমাদের,' দুই সহকারীকে বলল কিশোর। 'রুনাক শয়তানটাকে জেলে ভরা, আর ব্রিজ রহস্যের সমাধান করা—যে কাজটা করতে গিয়ে চাচার এই দুরবস্থা।'

আলোচনা চলতে লাগল।

রাতটা আজ এখানেই কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে রবিন আর মুসার। বাড়িতে ফোন করল রবিন। মাকে জানাল, কিশোরদের বাড়িতে থাকবে। তিনি অমত করলেন না। কিন্তু মুসার আম্মা বললেন, বাড়িতে জরুরী কাজ আছে। সেগুলো শেষ করতেই হবে। তিনি একা কুলাতে পারছেন না। অগত্যা কি আর করা। কিছুক্ষণ পর বাড়ি চলে গেল মুসা।

রাতে ঘুমাতে যাবার আগে হাসপাতালে ফোন করে জেনে নিল কিশোর, চাচার অবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে কিনা।

হয়নি। আগের মতই আছেন।

অনেক রাতে টেলিফোনের তীক্ষ্ণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। বিছানার পাশের বাতিটা জ্বেলে দিয়ে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে দৌড় দিল সে। পেছনে ছুটল রবিন। হলের এক্সটেনশনটা তুলে নিল কিশোর।

ফোন করেছে হাসপাতাল থেকে, মিস জেরিন। উত্তেজিত স্বরে বলল, 'এখুনি হাসপাতালে চলে এসো।'

বুকটা যেন ধসে গেল কিশোরের, 'বাড়ির সবাইকে নিয়ে!'

'না, শুধু তুমি এলেই হবে।'

'আসছি,' রিসিভার রেখে দিল কিশোর। ফিরে তাকাল রবিনের দিকে। 'কাপড় পরো! হাসপাতালে যেতে হবে। নিশ্চয় কিছু হয়েছে!'

দ্রুত পাজামা খুলে প্যান্ট পরে নিচে নেমে এল দুজনে। মেরিচাচীকে ডাকল না। অহেতুক দুশ্চিন্তা করবে চাচী। তারচেয়ে দেখে এসে যা বলার বলবে।

পিকআপটা নিয়ে হাসপাতালে রওনা হলো ওরা। পথে খুব একটা কথাবার্তা হলো না। চুপচাপ গাড়ি চালাল রবিন। ভাবনায় ডুবে রইল কিশোর।

হাসপাতালে পৌঁছে লিফটে উঠল। মনে হলো তিনতলায় উঠতে অনন্তকাল লেগে যাচ্ছে। লিফট থেকে বেরিয়ে ছুটে গিয়ে ঢুকল নার্সদের অফিসে।

'চাচার অবস্থা কি খব খারাপ?' নার্স-ইন-চার্জকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'নার্স

জেরিন ফোন করেছিল।'

'না,' জবাব দিল নার্স-ইন-চার্জ, 'তোমার চাচার বরং কিছুটা উন্নতিই হয়েছে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'তাহলে এমন করে যে বলল! ওফ্, জান উড়িয়ে দিয়েছিল আমাদের!'

'জান আমাদেরও উড়িয়ে দিয়েছিল। যাও, জেরিনের মুখেই শোনোগে সব।'

করিডর ধরে ছুটল আবার দুজনে। রোগীদের অসুবিধার কথা ভেবে পায়ের শব্দ যতটা সম্ভব কম করার চেষ্টা করল। অস্থির, বিধ্বস্ত, মুখচোখ লাল হয়ে যাওয়া নার্স জেরিনের সঙ্গে দেখা হলো ওদের চাচার কেবিনের বাইরে, দরজার কাছে।

'জানতেই যদি গোলমাল হবে,' রেগে উঠল নার্স, 'এখানে পাহারায় রাখোনি কেন কাউকে?'

ঢোক গিলল কিশোর। 'গোলমাল মানে? কেউ কি চাচাকে খুন করার চেষ্টা করেছে?'

'না, তা করেনি।'

'তাহলে?'

'জলদি বলে ফেলুন না, কি হয়েছে!' তর সইছে না আর রবিনের।

'ডাক্তারের পোশাক পরা একজন লোক চুরি করে তোমার চাচার ঘরে ঢুকেছিল,' নার্স জানাল।

ভারী দম নিল কিশোর। 'তারপর?'

'কফি খেতে গিয়েছিলাম,' বিমূঢ় ভাবটা এখনও কাটাতে পারেনি নার্স। 'ফিরে এসে দেখি টেপ রেকর্ডার থেকে ক্যাসেট খুলছে লোকটা। চিৎকার করে উঠলাম। মুখ তুলে আমাকে দেখেই দৌড় দিল দরজার দিকে। থামানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু পালিয়ে গেল।'

চার

হতাশ ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'সত্যি, কিশোর, ভুলই হয়ে গেছে। আমাদের কারও পাহারায় থাকা উচিত ছিল এখানে।'

'এখন আর ভেবে কি হবে,' নার্স বলল। 'চোর গেলে বুদ্ধি বাড়িয়ে তো লাভ নেই।'

'চোরটা পালানোর পর কি করলেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হাসপাতালের নাইট সুপারভাইজারকে জানালাম। পুলিশকে ফোন করল সে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে ওরা। সারা বিল্ডিং চষে বেড়াচ্ছে চোরের খোঁজে।'

'ও কি আর বসে আছে নাকি এখানে,' তিক্তকণ্ঠে বলল রবিন। 'টেপ রেকর্ডার রেখে গিয়ে কোন লাভই হলো না আমাদের।'

'শুধু ক্যাসেটটা যদি তোমাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে থাকে,' জেরিন বলল,

'তাহলে চিন্তার কোন কারণ নেই। ওটা খোয়া যায়নি।'

'মানে!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'চোরে নেয়নি! আপনি না বললেন...'

'ক্যাসেট নিয়েছে এ কথা বলিনি। বলেছি টেপ রেকর্ডার থেকে ক্যাসেট খুলছে।'

'অ! সরি! কোথায় ওটা?'

কেবিনে ঢুকে নাইট-টেবিলের ড্রয়ার খুলল জেরিন। বের করে দিল ক্যাসেটটা। 'প্রথমটা। তোমরা যেটা মেশিনে ভরে রেখে গিয়েছিলে। শেষ হয়ে গেলে তোমাদের কথামত আরেকটা ঢুকিয়েছিলাম আমি।'

'ওহ্, কি বলে যে ধন্যবাদ দেব আপনাকে,' এমন ভঙ্গিতে ক্যাসেটটা নিল রবিন, যেন ওটা ছাড়া তার জীবন বাঁচবে না। কিশোরের দিকে তাকাল, 'বাড়ি গিয়ে শুনব, কি বলো?'

মাথা কাত করল কিশোর।

রাশেদ পাশার নাড়ি দেখল নার্স। বুক পরীক্ষা করল। ফিরে তাকাল আবার গোয়েন্দাদের দিকে।

'লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'লম্বা,' নার্স বলল। 'গোঁফ আর চুল কুচকুচে কালো। আমি জুডো জানলে আজ আর পালাতে হত না বাছাধনকে। ঠিক ধরে ফেলতাম।'

চট করে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। জেরিনের চোর আর ইলার চোরের বর্ণনা এক রকম মনে হচ্ছে। জেরিনের চোরের বাড়তি একটা গোঁফ আছে কেবল।

করিডরে ভারী পায়ের শব্দ হলো। বাইরে বেরোল দুই গোয়েন্দা। জেরিনও ঘরে থাকতে পারল না। পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার এসেছেন, সঙ্গে আরেকজন পেট্রলম্যান। তার হাতে একটা দোমড়ানো সাদা জ্যাকেট।

'আরি, তোমরাও হাজির,' কিশোরের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'তোমার চাচার কথা শুনে নিজেই চলে এলাম কি হয়েছে দেখার জন্যে।'

জ্যাকেটটার দিকে আঙুল তুলল রবিন। 'চোরটা ফেলে গেল বুঝি?'

'হ্যাঁ,' চীফ বললেন। 'নিচতলায় পেছনের সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে ছিল।' চোখের পাতা সরু হয়ে এল তাঁর। 'মিস জেরিন, এ ঘর থেকে কিছু চুরি যায়নি, আপনি শিওর তো? এই যেমন ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ, ঘুমের বড়ি, এ ধরনের কোন জিনিস?'

'না, যায়নি। আমি শিওর।'

কিশোর বলল, 'কেসটা সমাধানের চেষ্টা করছি আমরা, ক্যাপ্টেন। সূত্র কিছু পাইনি এখনও। তবে চোর কেন এসেছিল, বোধহয় অনুমান করতে পারছি।'

টেপ রেকর্ডারের কথা বলল সে।

'হুঁ, তোমার অনুমান ঠিক,' মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন। 'ক্যাসেট চুরি করতেই এসেছিল। ভেবেছে, ঘোরের মধ্যে ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার মত কিছু যদি বলে ফেলেন রাশেদ পাশা।...চালিয়ে যাও। কিছু জানতে পারলে জানিয়ো আমাকে। লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে এখনই সাবধান করে দিচ্ছি পেট্রোলগার্ডদের। এখানে পাহারা রেখে যাচ্ছি। আর জ্যাকেটটা নিয়ে যাচ্ছি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্যে।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ক্যাপ্টেন।'

পুলিশ চলে গেলে নার্সকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'চোরটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়েছিল নাকি আপনার?'

'তা হয়েছে। কাপড় ধরে রাখতে পারলাম না। তখন চুল আঁকড়ে ধরলাম। ছুটিয়ে নিয়ে চলে গেল।...দাঁড়াও, আরেকটা জিনিস দিচ্ছি তোমাদের।' ড্রয়ার থেকে কাগজে মোড়া কি যেন বের করল জেরিন। কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দেখো, তোমাদের কোন কাজে লাগে কিনা।'

'কি?' আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়াল কিশোর। কাগজের মোড়কটা খুলে দেখল, দু'তিনটা চুল। 'কার এগুলো?'

'চোরটার,' হাসল জেরিন। 'ডিটেকটিভ ছবি দেখতে ভাল লাগে আমার। ডাক্তার নায়ারের কাছে শুনলাম তোমরাও শখের গোয়েন্দা। ভাবলাম, টানাটানি করে ব্যাটার চুল যখন ছিঁড়লামই, রেখে দিই, সূত্র হিসেবে কাজে লাগতেও পারে তোমাদের।'

'উহ্, কি বলে যে ধন্যবাদ দেব আপনাকে! সত্যি কাজে লাগবে, সত্যি! হয়তো এই ক'টা চুলই ওকে ধরতে সাহায্য করবে।' চুলগুলো আবার কাগজটায় মুড়ে যত্ন করে পকেটে রেখে দিল কিশোর।

টেপ রেকর্ডারটা তুলে নিল রবিন।

নার্সকে ধন্যবাদ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। দরজার বাইরে পাহারা দিচ্ছে একজন পুলিশ। ওদের দেখে বলল, 'নিশ্চিন্তে বাড়ি চলে যাও। জন পুকারের চোখ এড়িয়ে এ ঘরে একটা পিঁপড়েও ঢুকতে পারবে না আর।'

হেসে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

বাড়ি ফিরে রবিনকে নিয়ে সোজা ল্যাবরেটরিতে ঢুকল সে। মাইক্রোস্কোপের নিচে চুলগুলো রেখে পরীক্ষা করতে করতে অস্ফুট শব্দ করে উঠল।

'কি দেখলে?' জানতে চাইল রবিন।

'নিজেই দেখো, কিছু বুঝতে পারো নাকি,' মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে নিল কিশোর।

দেখতে দেখতে রবিন বলল, 'চুলটার গোড়ার কাছে ধূসর। আগাটা কালো। তারমানে রঙ করা। কলপ লাগানো।' উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর চড়ে যাচ্ছে তার। 'চুলের আসল রঙ ধূসর। আর ধূসর রঙ কার মাথায়? রুক রুনাক!'

'এবং গোঁফটা লাগিয়ে এসেছিল নকল,' কিশোর বলল।

'ক্যাসেটটা শোনা দরকার এখন,' উত্তেজনায় রবিনের গলা কাঁপছে। 'কি মনে হয় তোমার, সূত্রটুত্র পাব?'

'অত আন্দাজ-অনুমানের মধ্যে না গিয়ে শুনে ফেললেই তো হয়,' কিশোর বলল।

চালু করে দেয়া হলো ক্যাসেট। ভলিয়ুম পুরোটা বাড়িয়ে দিয়েছে কিশোর। স্পীকারের মৃদু শোঁ-শোঁর মাঝে রাশেদ পাশার দুর্বোধ্য বিড়বিড়ানি শোনা যেতে লাগল। তার মধ্যে একটা শব্দ মোটামুটি বোঝা গেল।

'লিক্স মানে কি!' রবিন বলল। 'দাঁড়াও, আবার টেনে দিয়ে শুনি।' কয়েকবার করে শোনার পর বলল, 'ফেলিক্স হতে পারে।'

'তা পারে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হয়তো রুনাকের সহকারীর নাম ফেলিক্স।'

মেশিন বন্ধ করে দিল রবিন। ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করল কিশোর। পাওয়া গেল তাঁকে। থানায়ই আছেন।

'ক্যাপ্টেন, ফেলিক্স বলে কোন অপরাধীর নাম আছে আপনাদের খাতায়? টেপে শুনলাম। ঘোরের মধ্যে চাচা একটা শব্দ বলেছে, লিক্স। আমরা ধরে নিয়েছি ফেলিক্স, কারও নাম। আপনার কি মনে হয়?'

'ও নামে কারও কথা তো এখন মনে পড়ছে না,' চীফ বললেন। 'খাতা দেখে বলতে হবে। ঠিক আছে, জানাব প রে।'

ল্যাবরেটরি থেকে নেমে এল দুজনে। মেরিচাচী বা মিস কোয়াড্রুপলকে না জাগিয়ে নিঃশব্দে রান্নাঘরে ঢুকে কোকা বানিয়ে নিল দুই গ্লাস। হাসপাতালের চোরের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

গ্লাসটা নামিয়ে রেখে রবিন বলল হঠাৎ, 'কিশোর, তাড়াহুড়োয় প্লেনটার কথাই ভুলে গেছি আমরা। যে প্লেনটা রোভারদের পিছু নিয়েছিল। এয়ারপোর্টে নামল কিনা খোঁজ নেয়া হয়নি।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে রকি বীচ বিমান বন্দরে ফোন করল কিশোর। জানতে পারল, আগের দিন বিকেলে অ্যাটাকানের রেড সিটি থেকে আরেকটা প্লেন এসেছিল। একটা এয়ারট্যাক্সি। একটু আগে চলে গেছে।

রিসিভার রেখে রবিনকে খবরটা জানাল কিশোর।

'গেছে কোথায়?' জানতে চাইল রবিন।

'লস অ্যাঞ্জেলেস।'

এত রাতে আর কিছু করা সম্ভব না। অতএব বিছানায় ফিরে গেল দুজনে।

পরদিন সকালে হাত-মুখ ধুয়ে নিচে নামল ওরা। অনেক আগেই উঠে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে মিস কোয়াড্রুপল। মাংস আর ডিম ভাজার সুগন্ধ ভুরভুর করছে বাতাসে। নাস্তা সেরে জড়তা কাটানোর জন্যে কড়া এক কাপ কফি খেল কিশোর। তারপর চলে এল চাচার পড়ার ঘরে। ফোন নিয়ে বসল। এক এক করে ফোন করতে লাগল লস অ্যাঞ্জেলেসে যে ক'টা বিমান বন্দর আছে, সবখানে।

বহু চেষ্টার পর অবশেষে অখ্যাত একটা ছোট এয়ারপোর্ট থেকে খবর পাওয়া গেল, রেড সিটির একটা এয়ারট্যাক্সি সকাল বেলা ওদের বিমান বন্দরে নেমেছে। প্লেন থেকে নেমেছে একজন মাত্র যাত্রী। টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে গেছে এতক্ষণে।

'প্লেনটা কি আছে এখনও?' জানতে চাইল কিশোর।

'আছে,' জবাব এল। 'আবহাওয়ার খবর পড়ছে পাইলট। কথা বলতে চান?' কিশোরের বয়েস আন্দাজ করতে পারেনি লোকটা, বয়স্ক লোক ভেবেছে।

চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল কিশোরের। 'চাই।'

ফোন ধরল পাইলট। জানা গেল, তার যাত্রীটির ছিল কালো চুল, কালো গোঁফ। পকেটে একশো ডলারের কড়কড়ে নোটের বিরাট এক বান্ডিল, ওটা থেকে নোট খুলে নিয়ে প্লেন ভাড়া মিটিয়েছে।

কেমন আচরণ করেছে লোকটা জানতে চাইল কিশোর।

পাইলট বলল, 'সারাক্ষণ কেমন অস্থির হয়ে ছিল। রেড সিটি থেকে রকি বীচ যাওয়ার পথে আরেকটা প্লেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের। ওটা সম্ভবত ওয়াইল্ড টাউন থেকে এসেছিল। প্লেনটা দেখেই চমকে গেল সে। বেশি কাছে যেতে বারণ করছিল। আমি গতি বাড়ালেই ধমক মারছিল। অবাকই লাগছিল আমার। ভাড়াটা অনেক বেশি দিয়েছে, তাই আর কিছু বলিনি।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'লস অ্যাঞ্জেলেসে কোথায় যাবে কিছু বলেছে?'

'না। ট্যাক্সি নিয়ে শহরের দিকে চলে যেতে দেখলাম।'

পাইলটকে ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর। কি কি কথা হয়েছে, রবিনকে জানাল। বলল, 'একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। অনেক দূরে চলে গেছে সে। চাচাকে সম্ভবত আর জ্বালাতে আসবে না।'

আবার নিচতলায় নামল ওরা। ভট ভট করে বিকট শব্দ হলো। বাড়ির সামনে এসে থামল শব্দটা। রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিল মিস কোয়াড্রুপল। 'কিসের শব্দ?'

মুচকি হাসল কিশোর। 'মুসার গাড়ির। জেলপি গাড়ি। শব্দের জন্যে সারা রকি বীচে বিখ্যাত।'

'বিখ্যাত না কুখ্যাত! বাপরে বাপ! মরা মানুষকে জাগিয়ে দেবে...'

দরজায় উঁকি দিল মুসার হাসিমুখ। শিস দিতে দিতে ঘরে ঢুকল। আরাম করে গা এলিয়ে দিল একটা চেয়ারে। খাবার টেবিলটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নাস্তা কি সেরে ফেলেছ নাকি?'

'কেন, তোমার লাগবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'অল্প-বিস্তর পেলে মন্দ হত না। বাড়ি থেকে পেট ভরে খেয়েই বেরিয়েছিলাম। গাড়িটার শব্দে হজম হয়ে গেছে।'

'গাড়ির শব্দে যে কারও খাবার হজম হতে পারে, এমন "বৈজ্ঞানিক যুক্তি" জীবনে এই প্রথম শুনলাম,' রবিন বলল। 'বদলাও না কেন? ওটা তো তোমার ক্ষতি করছে। হজম করায় আর খাওয়ায়। চর্বি জমে মরবে তো শেষে। এক কাজ করো। যাদের খিদে না লাগার রোগ আছে, তাদেরকে ভাড়া দাও, বড়লোক হয়ে যাবে।'

'বকবকানি থামাও,' হাত নেড়ে রবিনকে যেন উড়িয়ে দিয়ে মিস কোয়াড্রুপলের দিকে তাকাল মুসা। 'আন্টি, আছে কিছু?'

'বোসো। আনছি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চারটা ডিম ভাজা, ছ'টা মাংসের বড়া, আধখানা পাঁউরুটি, আর আধ জগ দুধ দিয়ে শুরু হয়ে গেল মুসার দ্বিতীয় দফা প্রাতঃরাশ। চিবাতে চিবাতে মিস কোয়াড্রুপলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আন্টি, আপনার তুলনা হয় না। আরও আগেই এ বাড়িতে চলে আসা উচিত ছিল আপনার। ইস্, কি পরিমাণ খাবার থেকে বঞ্চিত হয়েছি এতদিন, ভাবলে কষ্ট লাগতে থাকে।'

'চুপ! আস্তে!' সাবধান করল কিশোর। 'চাচী শুনলে তোমার চাঁদি ফাটাবে। বলবে, এতদিন এত কিছু বেকার খাওয়ালাম অকৃতজ্ঞ ছোঁড়াটাকে।'

মুচকি হেসে রান্নাঘরে ঢুকে গেল আবার মিস কোয়াড্রুপল।

দুই বন্ধুর দিকে তাকাল মুসা। জিজ্ঞেস করল, 'রাশেদ আঙ্কেলের খবর কি?'

রাতের ঘটনা সবিস্তারে খুলে বলল কিশোর আর রবিন।

'খাইছে!' খাবার চিবানোর ফাঁকে শুধু একটা শব্দই বেরোল মুসার মুখ দিয়ে।

মুসাকে খেয়ে ওপরে আসতে বলে আবার ফোন করতে গেল কিশোর। সঙ্গে গেল রবিন। প্রথমে করল থানায়, ক্যাপ্টেনকে। ডাক্তারের জ্যাকেটটা পরীক্ষা করে কোন সূত্র পাওয়া যায়নি, আর ফেলিক্স নামে কোন অপরাধীর নাম নেই পুলিশের খাতায়।

এরপর বোরিসকে ফোন করল কিশোর। শুনতে শুনতে ভুরু উঁচু হয়ে গেল।

'তারমানে বহুত ব্যস্ত ছিলেন আপনি, বোরিসভাই। এক মিনিট। লিখে নিচ্ছি।'

খসখস করে প্যাডে লিখে নিল কিশোর। লাইন কেটে দিয়ে রবিনের দিকে তাকাল। 'লস অ্যাঞ্জেলেসে যে জেলখানায় জেল খেটেছে রুনাক, সেটার নাম জানতে পেরেছে বোরিস। বছরখানেক আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে রুনাক। তারপর লস অ্যাঞ্জেলেসে তার এক বিধবা বোনের বাসায় উঠেছিল। মহিলার ঠিকানা জোগাড় করেছে সে। সেটাই লিখে নিলাম।'

'তাই নাকি? দারুণ!' উল্লসিত হলো রবিন। 'লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে গেলেই পারি তাহলে আমরা।'

রোভার কাজে আসেনি এখনও। তার বাড়িতে ফোন করল কিশোর। লস অ্যাঞ্জেলেসের সেই ছোট্ট বিমান বন্দরটার কথা বলে জিজ্ঞেস করল, বিকেল বেলা ওখানে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারবে কিনা। রোভার বলল, পারবে।

ঘরে ঢুকল মুসা।

তাকে সব জানাল কিশোর।

'আমারও যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু মা'র কাজ আর শেষ হয় না,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মুসা বলল, 'চিরকালই লেগে থাকে। আমি বোধহয় যেতে পারব না তোমাদের সঙ্গে।'

'না পারলে আর কি করা,' কিশোর বলল। 'আমি আর রবিনই যাব।'

'যাও। আমি ফাঁকে ফাঁকে এখানে এসে আন্টিদের দেখে যাব। কিছু ঘটলে, প্রয়োজনে বোরিসের সাহায্য নিতে পারব।'

'ঠিক আছে, সে-ই ভাল।'

লাঞ্চের পর কিশোর আর রবিন গেল হাসপাতালে। সেখান থেকে রাশেদ পাশাকে দেখে এয়ারপোর্টে। কথামত প্লেন নিয়ে অপেক্ষা করছে রোভার। বিশ মিনিট পর পাঁচ হাজার ফুট নিচের সবুজ প্রকৃতি দেখতে দেখতে চলল দুই গোয়েন্দা।

রবিন আর কিশোর দুজনেই প্লেন চালাতে পারে। পালা করে চালাতে লাগল। গন্তব্যের কাছাকাছি এসে চালানোর দায়িত্ব নিল আবার রোভার। যোগাযোগ করল টাওয়ারের সঙ্গে। নামার অনুমতি চাইল।

রানওয়ে পেরিয়ে এসে প্লেনটা থেমে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের সুটকেস তুলে নিল কিশোর। রোভারকে ধন্যবাদ দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। রবিন চলল তার পেছনে।

'যাও, সাবধানে থেকো,' রোভার বলল ওদের। 'দরকার হলেই ফোন কোরো।'

'করব!' কিশোর বলল।

প্লেন থেকে নেমে, দ্রুত টারমিনাল পেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি ডাকল সে। বোরিসের কাছ থেকে নেয়া রুনাকের বোনের ঠিকানায় যেতে বলল ড্রাইভারকে। শহরতলির একটা অতি নোংরা জায়গায় এসে ঢুকল ট্যাক্সি। ঠিকানা দেখে জরাজীর্ণ একটা বিল্ডিঙের সামনে গাড়ি থামাল ড্রাইভার।

'এটাই,' বলল সে। 'নাম্বার থারটি এইট।'

ভাড়া মিটিয়ে দিল কিশোর। ট্যাক্সি থেকে নামল রবিনকে নিয়ে।

কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে। বাড়ির কাঠামো, জানালা, দরজা, ফায়ার এস্কেপ সব খুঁটিয়ে দেখল। রবিনের দিকে ফিরে বলল, 'চলো, যাওয়া যাক।'

'আগে থাকার একটা বন্দোবস্ত করে নিলে হত না? রাস্তার শেষ মাথায় একটা হোটেল দেখা যাচ্ছে। চেহারা দেখে খুব একটা ভাল মনে হচ্ছে না, তবে থারটি এইটের কাছাকাছি থাকা যাবে।'

একমত হলো কিশোর। পুরানো হোটেলটার সামনে এসে দাঁড়াল। ভিত অনেক উঁচু। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে এসে মৃদু আলোয় আলোকিত লবিতে ঢুকল ওরা।

ভাপসা দুর্গন্ধ। নাকমুখ কুঁচকে ফেলল দুজনেই। কিন্তু গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে অনেক কিছু সহ্য করে নিতে হয়। ডেস্ক-ক্লার্কের রেজিস্ট্রি খাতায় সই করে, ৩০৭ নম্বর ঘরের চাবি নিয়ে নিল।

'ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি,' রহস্যময় ভঙ্গিতে বলল ইঁদুর-মুখো, টেকো ডেস্ক-ক্লার্ক। 'বুঝলে না? নগদ টাকা দিয়ে বিল মেটাও, আর নিজেদের ব্যাগ-ব্যাগেজ নিজেরা ঘরে নিয়ে যাও।'

'বাহ্, স্বাগত জানানোর কি ছিরি!' তিক্তকণ্ঠে বলল রবিন।

টাকা দিয়ে দিল কিশোর।

মচমচ করে প্রতিবাদ জানাতে থাকা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল দুজনে। ভাল কিছু আশা করেনি, তবে ঘর এত খারাপ হবে তা-ও ভাবেনি। দেয়ালের কাগজ ছেঁড়া, উল্টো হয়ে ঝুলে রয়েছে ছেঁড়া অংশগুলো। ছাত থেকে ঝুলছে একটা মাত্র নগ্ন বাতি। বিছানার মাঝখানটা ডেবে গেছে। দুটো নড়বড়ে চেয়ার আছে। বসতে গেলে ভেঙে পড়লে অবাক হবে না।

সুটকেস থেকে জিনিসপত্র খোলা সবে শেষ করেছে, সাইরেনের শব্দ কানে এল। জানালা দিয়ে উঁকি দিল দুজনে। ঠিক ওদের নিচে এসে থামল একটা পুলিশ কার। লাল আলো জ্বলছে-নিভছে।

'কাকে ধরতে এল?' রবিনের প্রশ্ন।

'কি জানি।'

বিছানার কাছে সরে এল কিশোর। তোয়ালে কাঁধে ফেলে বাথরুমের দিকে এগোতে যাবে, প্রচণ্ড এক লাথিতে ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজার পাল্লা, দড়াম করে বাড়ি খেল পাশের দেয়ালে।

পাঁচ

ভীষণ চমকে গিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। গাঢ় রঙের স্যুট পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। হাতে উদ্যত রিভলভার। কঠিন স্বরে গর্জে উঠল, 'যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাকো!'

'কে আপনি?' মুখ থেকে বেরিয়ে গেল রবিনের।

'ডিটেকটিভ বেক হাউল, লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ ডিপার্টমেন্ট।'

ডিটেকটিভের পেছন থেকে দু'পাশে এসে দাঁড়াল ইউনিফর্ম পরা দুজন পুলিশ।

'ঘোরো!' ধমকে উঠল আবার হাউল। 'দেয়ালের দিকে মুখ করো। হাত তোলো মাথার ওপর।'

যা বলা হলো, করতে বাধ্য হলো দুই গোয়েন্দা। একজন পুলিশ এসে দেহতল্লাশী করল ওদের। বলল, 'নেই তো কিছু।'

'কি করছেন এ সব?' এতক্ষণে প্রশ্ন করল কিশোর। 'চোর-ছ্যাঁচড় ভেবেছেন নাকি আমাদের?'

'কে তোমরা?'

আইডেনটিটি কার্ড বের করে দেখাল কিশোর আর রবিন। তারপর তিন গোয়েন্দার কার্ড এবং সেই সঙ্গে ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের অফিশিয়াল প্যাডে লেখা প্রশংসাপত্র দেখাল।

রিভলভার নামাল হাউল। 'সরি। ভুল হয়ে গেছে। তারমানে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছিল আমাদের।'

'ভুল তথ্য?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

ডিটেকটিভ হাউল জানাল, থানায় ফোন করেছিল একটা লোক; জানিয়েছে এই হোটেলের ৩০৭ নম্বর ঘরে দুজন ভয়ঙ্কর অপরাধী জায়গা নিয়েছে।

'তারমানে আমাদের পিছু লেগেছে কেউ।' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'কে হতে পারে, বলো তো?'

'বুঝতে পারছি না।'

ডিটেকটিভ বলল, 'যে-ই হোক, তোমাদের শত্রু আছে এখানে। জায়গাটা ভাল না। রকি বীচে ফিরে গেলেই ভাল করবে।'

'রুক রুনাক নামে একটা লোককে খুঁজছি আমরা,' রবিন বলল। 'চেনেন নাকি ওরকম কাউকে?'

মাথা নাড়ল হাউল। সঙ্গের অন্য দুজন অফিসারও নাড়ল।

'নামটাই হয়তো ভুল, চিনব কি করে,' ডিটেকটিভ বলল। 'এ এলাকার বেশির ভাগ অপরাধীই ছদ্মনামে ঘোরে।'

পুলিশ চলে গেল। ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল দুজনে। মড়মড় করে উঠল পুরানো চেয়ার। যেন রেগে গিয়ে প্রতিবাদ জানাল। ওদের দুজনের রাগ এখন

চেয়ারের চেয়েও বেশি।

'নিল একচোট!' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'আমরা এলাম তাকে ধরতে, তার আগেই আমাদের একহাত দেখিয়ে দিল সে। কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে আমার।'

'ভালই হলো,' কিশোর বলল। 'আগে থেকে সাবধান হয়ে গেলাম। এখন থেকে প্রতিমুহূর্তে সাবধান থাকতে হবে।'

কাছের একটা রেস্টুরেন্ট থেকে রাতের খাবার খেয়ে এল দুজনে। রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল।

'কাল সকালে উঠে আগে গিয়ে আটত্রিশ নম্বর বাড়িটাতে খোঁজ নেব,' কিশোর বলল।

রাতে আবার কে এসে কোন অঘটন ঘটিয়ে যায়, এই ভয়ে একসঙ্গে না ঘুমিয়ে পালা করে পাহারা দিল ওরা। চার ঘণ্টার শিফট। তবে আর কিছু ঘটল না। নিরাপদেই কেটে গেল রাতটা।

সকাল সকাল উঠে নাস্তা খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ৩৮ নম্বর বাড়িতে খোঁজ নিতে। বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজার মরচে পড়া ঘণ্টা বাজাল। কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পর খুলল দরজা। খুলে দিল এক মহিলা। রঙচটা মলিন গোলাপী রঙের হাউসকোট পরনে। সেফটি চেনের ওপাশ থেকে সাবধানে উঁকি দিল।

সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে রইল দুই গোয়েন্দা। ভেতরে যেতে বলল না মহিলা।

নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর। বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, রুক রুনাকের ব্যাপারে কথা বলতে চাই; প্লীজ।'

'রুক···কে?'

'রুনাক। রুক রুনাক। এ বাড়িতে তার বিধবা বোনের সঙ্গে বাস করে।'

খাটো ঘাড়ওয়ালা, বেঁটে-মোটা মহিলা কুতকুতে চোখ মেলে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। মাথা নাড়ল, 'জীবনেও শুনিনি ওই নাম।' কপালের চুল পেছনে সরানোর চেষ্টা করতে লাগল অহেতুক। 'ভুল জায়গায় চলে এসেছ তোমরা। ওই নামে কেউ থাকে না এখানে। আমার বাড়ির সব ভাড়াটেদের ভালমত চিনি আমি।'

'আগে ছিল নিশ্চয়?' অধৈর্য হয়ে উঠল রবিন।

'হয়তো ছিল, হয়তো না।'

দরজা লাগিয়ে দিতে যাবে মহিলা, হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চট করে ওপরে তাকাল রবিন। ছাতের দিকে।

'কিশোর, সরো সরো!' চিৎকার করে উঠল সে।

ছাত থেকে একটা ধাতব ডাস্টবিন ছুঁড়ে মারা হয়েছে ওদের লক্ষ্য করে। লাফ দিয়ে সরে গেল দুজনে। কিন্তু সামান্য দেরি করে ফেলেছে কিশোর। ডাস্টবিনটা তার কাঁধে আঘাত করে সিঁড়িতে পড়ল। ঘটারং-ঘট-ঘটাং শব্দ তুলে গড়িয়ে নেমে চলে গেল আঙিনায়।

'আমাদের ঢুকতে দিন!' মহিলাকে অনুরোধ করল রবিন। 'আপনার ছাতে বসে কে যেন আমাদের খুন করার চেষ্টা করছে।'

দরজার শেকলটা খুলে দিল বিস্মিত মহিলা। তার পাশ কাটিয়ে একছুটে ভেতরে

ঢুকে গেল দুই গোয়েন্দা। ছাতে ওঠার সিঁড়ি দেখতে পেল। দুড়দাড় সিঁড়ি ডিঙিয়ে ওপরে উঠে গেল দুজনে। ছাতে এসে চারদিকে তাকাল।

'ওই যে ওদিকে,' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

ছাতের কিনারে লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাট, বানরমুখো এক লোক। পলকে লাফ দিয়ে পাশের ছাতে চলে গেল।

'ধরো, ধরো!' বলে চিৎকার দিয়ে ছুটে গেল রবিন।

লাফ মারল সে। পাহাড়ে পাহাড়ে দাপিয়ে বেড়ানো রবিনের জন্যে পাঁচতলার ছাত তেমন ভয়ের ব্যাপার না হলেও কিশোরের জন্যে আতঙ্কের। কিন্তু পরোয়া করল না সে-ও। নিচে পড়লে কি ঘটবে সে-ভাবনা না করে রবিনের পেছন পেছন লাফ দিল। বানরমুখোকে অনুসরণ করে পাশের বাড়ির আলকাতরা মাখানো চালায় এসে পড়ল। কিন্তু লোকটা ওদের চেয়ে ক্ষিপ্র। চালার কিনারের ফায়ার এস্কেপ বেয়ে তরতর করে নেমে চলে গেল। শেষ কয়েক গজ বাকি থাকতে হাত ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে।

লোহার সিঁড়িটা বেয়ে কিশোর আর রবিন নেমে আসার অনেক আগেই উধাও হয়ে গেল লোকটা।

'আস্ত বাঁদর! না না, ব্যাঙ!' কাঁধ ডলতে ডলতে বলল কিশোর। 'শয়তানটা কে?'

'কেউ একজন, যে আমাদের খুন করতে চেয়েছিল,' লোকটা যেদিকে অদৃশ্য হয়েছে সেদিকে যাবে কিনা ভাবছে রবিন। গিয়ে লাভ হবে না ভেবে শেষে ধরার চিন্তা বাদ দিল।

সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে এসেছে এখন বাড়িওয়ালি মহিলা। ডাস্টবিনটা তুলে নিতে এগোল।

'ব্যথা পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোরকে।

'না, ম্যা'ম। তবে লাগতে পারত। আরেকটু হলেই আজ মারা পড়েছিলাম।'

'সে-জন্যে আমাকে দোষ দিতে পারবে না,' দু'হাতের সাগরকলার মত মোটা মোটা আঙুলগুলো একটার ফাঁকে আরেকটা ঢুকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে মোচড় দিতে লাগল মহিলা।

কিশোর বলল, 'ঠিক আছে, যদি রুক রুনাকের ব্যাপারে সব জানান আমাদের, আর কোন গোলমাল করব না।'

'বেশ। বলো, কি জানতে চাও,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল মহিলা। 'আস্তে কথা বলো। কে কোনখান থেকে শুনে ফেলে বলা যায় না।...আমি যে বলেছি, কাউকে বলতে পারবে না।'

'বলব না,' কথা দিল কিশোর।

মহিলা স্বীকার করল রুক রুনাক আর তার বোন এ বাড়িতে ভাড়া থাকত। 'এখন চলে গেছে।' হাত নেড়ে বলল, 'এর বেশি কিছু জানি না।'

মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে ওখান থেকে সরে এল ওরা। রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলল।

'বাঁদরমুখো নিশ্চয় রুনাকের দোস্ত,' রবিন বলল।

'হতে পারে। যাই হোক, রুনাক যে এখানে থাকত, এ ব্যাপারে শিওর হওয়া গেল। এ রাস্তায় বাস, এমন আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'তা বলা যায়।'

আপাতদৃষ্টিতে লোহালক্কড়ের দোকান মনে হয়, এ রকম একটা দোকানে ঢুকল ওরা। ভেতরে এসে দেখল আরও অনেক কিছুই পাওয়া যায় এখানে।

'আরে এ তো পুরো জাংক শপ!' রবিন বলল। 'দুনিয়ার যত বস্তাপচা বাতিল মাল।'

কাউন্টারে বসে থাকা বেঁটে, হোঁতকা লোকটার দিকে এগোল ওরা। চশমার পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা।

'রুনাক নামে একজনকে খুঁজতে এসেছি আমরা,' কিশোর বলল। 'এ পাড়াতেই থাকত সে। আপনি কি কিছু বলতে পারবেন?'

চোখের পাতা অবিচল রেখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। একবার কিশোরের দিকে, একবার রবিনের দিকে তাকাতে লাগল। আচমকা হো-হো হাসিতে ফেটে পড়ল।

অস্বস্তি বোধ করল রবিন। 'তারমানে আমাদের কথার জবাব দেবেন না আপনি?'

হাসি থামাল লোকটা। 'আমার সঙ্গে মজা করছ নাকি তোমরা?' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল সে। 'তাহলে কিন্তু বাপু ভাল করছ না। কিছু কেনার থাকলে কেনো, নয়তো বিদেয় হও।'

গটগট করে গিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

আর কিছু করার নেই। অগত্যা দোকান থেকে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

'লোকটার কাণ্ড দেখলে!' রবিন বলল। 'অভিনয় করে আমাদের এড়িয়ে গেল।'

রাস্তা ধরে হেঁটে চলল আবার দুজনে। নিজেদের আলোচনায় এতটাই ব্যস্ত, দুটো জোয়ান ছেলে যে ওদের পিছু নিয়েছে লক্ষ করল না। একটা ছেলে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ইচ্ছে করে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল কিশোরের গায়ে।

মারল তো মারল, উল্টো খেঁকিয়ে উঠল ছেলেটা। 'এই, দেখে হাঁটতে পারো না!'

'দেখিনি ভাই, কিছু মনে কোরো না,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।

'এঁহ, দেখিনি ভাই, কিছু মনে কোরো না!' মুখ ভেঙচে বিকৃত করে বলল ছেলেটা। 'বাপের জমিদারি পেয়েছে! গুঁতো মেরে মাপ চাইলেই হয়ে গেল!'

গালিটা হজম করতে কষ্ট হলো রবিনের। ঘুরে দাঁড়াতে গেল। ধরে ফেলল কিশোর। 'থাক, অহেতুক গোলমাল কোরো না। সময় নেই আমাদের।'

কিন্তু যেতে দিল না ছেলে দুটো। বোঝা যাচ্ছে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধানোটাই ওদের উদ্দেশ্য। রবিনের কাঁধ খামচে ধরে এক ঝটকায় তাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ফেলল একটা ছেলে। আর সহ্য করতে পারল না রবিন। দিল কষে জুডোর প্যাচ। কোথা থেকে কি হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারল না ছেলেটা। রবিনের মাথার ওপর

দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে, ছুঁড়ে ফেলা কাতলা মাছের মত ধড়াস করে। পড়েই থাকল। দ্বিতীয় ছেলেটা ধরতে গিয়েছিল কিশোরকে। তার অবস্থাও কম শোচনীয় হলো না। পেটে খেল প্রচণ্ড ঘুসি। দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল। ডান কাঁধে কারাতের ভয়ানক এক কোপ খেয়ে নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে ঝুলে গেল হাতটা। নড়ানোর সাধ্য রইল না। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ছাড়ল না কিশোর। বুকে জোরে এক ধাক্কা মেরে চিত করে ফেলে দিল রাস্তায়। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে হাঁটা দিল হোটেলের দিকে।

হোটেলের সিঁড়িতে পা রাখতে যাবে, পাশ থেকে এসে দাঁড়াল লম্বা একজন লোক। চোখের মণি দুটো অস্থির। তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে কিশোরকে বলল রবিন, 'নিশ্চয় গুণ্ডাদের সর্দার। এতক্ষণ চামচাগুলোকে পাঠিয়েছে। এখন নিজে এসেছে একটা বোঝাপড়া করতে।'

গরম আবহাওয়া, শীতের লেশমাত্র নেই, কিন্তু লোকটার গায়ে পুরানো, সুতো ওঠা ওভারকোট। ঝুল ছুঁই ছুঁই করছে মাটিতে। তার বাদামী চুলে বয়েসের রঙ। ঠোঁটের কোণে আলগাভাবে ঝুলছে নিভে যাওয়া সিগারেট।

'আই যে ছেলেরা, আই যে ছেলেরা,' বিচিত্র ভঙ্গিতে টেনে টেনে বলল লোকটা, 'এক কাপ কফি খাওয়ার পয়সা দেবে?'

'দিয়ে দিই পয়সা,' ফিসফিস করে বলল রবিন। লোকটাকে গুণ্ডা মনে করেছিল, ভিখিরি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'ভাগানো দরকার। নইলে জ্বালাবে।'

'দাঁড়াও, এখনই দিও না।' লোকটার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'এ এলাকায় কদ্দিন আছেন?'

ভিখিরির বাঁকা, লম্বা নাকের ডগাটা কেমন নেচে উঠল। চোখে শেয়ালের ধূর্ত দৃষ্টি। টাকার গন্ধ পেয়েছে। চোখের পাতা আধবোজা করে খিকখিক করে হাসল। 'বহুকাল। বহুকাল। জন্মই আমার এখানে।'

'তাহলে তো এ ব্লকের সবাকেই চেনেন, তাই না?'

'তা তো চিনিই। বিশেষ কাউকে খুঁজছ?'

'হ্যাঁ। রুক রুনাক নামে এক লোককে,' কিশোর বলল।

নাম শুনে কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে। দুই ভুরুর মাঝখানের চামড়ায় গভীর ভাঁজ পড়ল লোকটার। চোখের মণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মনে করার চেষ্টা করছে।

'হ্যাঁ, চিনি আমি রুনাককে,' অবশেষে বলল সে।

'ও এখন কোথায় আছে বলতে পারবেন?' জানতে চাইল রবিন। উত্তেজনা চাপা দিতে পারছে না। 'খুব জরুরী। ওকে আমাদের ভীষণ দরকার।'

ছেঁড়া কোটের কোনায় ডলে ডলে আঙুল পরিষ্কারের চেষ্টা চালাল ভিখিরি। কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছে না যেন।

'রুক রুনাক কোথায় আছে জানতে চাও তাহলে, অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যিই চাও?'

'বললাম তো, হ্যাঁ।'

'বেশ, বলতে পারি,' খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফে ঢাকা ভালুকের মত চোয়ালটা সামনে ঠেলে দিল ভিখিরি, 'তবে পয়সা লাগবে।'

ছয়

লাগবে যে সেটা আগেই বুঝতে পারছিল কিশোর। 'কত?'

'এমপরার। আমার নাম রুয়ানডার ডিগনিটি এমপরার। বেশি কঠিন লাগলে শুধু ডিগ বলে ডাকতে পারো।'

'আপনার নাম জানাটা জরুরী না আমাদের জন্যে। কত দিলে রুক রুনাকের ঠিকানা দেবেন?'

'পাঁচশো ডলার।'

'যান! সরুন!' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে লোকটার দিকে হাত নাড়ল কিশোর। সিঁড়িতে পা রাখল।

খপ করে কিশোরের শার্ট খামচে ধরল ডিগ। 'একটা দরাদরি তো করতে পারি আমরা, তাই না? ঠিক আছে যাও, অর্ধেক। আড়াইশো। কি বলো?'

'একটা আধলাও আমি দেব না আপনাকে,' বরফের মত শীতল কিশোরের কণ্ঠ। লোকটার নোংরা হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল।

'আরে অমন খেপে যাচ্ছ কেন? ক্ষুধার্ত একজন মানুষকে খাওয়াতে তো অন্তত পারো।'

'শুধু খাবার? আর কিছু চাইবেন না তো?'

মাথা নাড়ল লোকটা।

'বেশ, পাবেন খাবার। আগে বলুন রুক রুনাক কোথায় আছে।'

'আগে খাবার।'

'খাওয়ার পরে যদি না বলেন?'

'কথার নড়চড় করি না আমি।'

ছেলেদের আসতে বলে আগে আগে হাঁটতে শুরু করল ডিগ। ব্লকের মাঝামাঝি গিয়ে 'হারবি'জ কিচেন' নামে নোংরা একটা রেস্টুরেন্টে ঢোকাল ওদের।

ছোট একটা গোল টেবিল ঘিরে বসল তিনজনে। ছ'টা বীফ বারগারের অর্ডার দিল ডিগ, সেই সঙ্গে বড় এক বাটি সেদ্ধ বীন। খাবার আসামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল কিশোর আর রবিন, একটারও জবাব দিল না সে। মুখভর্তি খাবার চিবাতে চিবাতে এক সময় বলল, 'খাওয়ার সময় কথা বলতে পারি না আমি।'

অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগল দুই গোয়েন্দা। অবশেষে শেষ টুকরোটাও মুখে পুরে অসীম শান্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডিগ। মুখ মুছল কোটের কোনায়। তারপর কাগজ আর পেন্সিল বের করতে বলল ছেলেদের।

'ভেবেছিলে খেয়েদেয়ে ফাঁকি দিয়ে চলে যাব। উঁহুঁ। কথা যখন দিয়েছি, কথা

আমি রাখব। কোথায় পাওয়া যাবে রুনাককে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ছোট একটা পেন্সিল বের করে ডিগের ভালুক-থাবায় ফেলে দিল কিশোর। রবিন দিল এক টুকরো কাগজ।

ডিগ বলল, 'দাঁড়াও, নকশা এঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কোথায় আছে গুপ্তধন।'

'গুপ্তধন কে চায়!' রবিন ভাবল ওদের ফাঁকি দিতে চাইছে ডিগ। 'আমরা চাই রুক রুনাকের ঠিকানা।'

'গুপ্তধনই তো। নাহলে এ ভাবে খোঁজে কেউ।'

'আঁকুন,' কথা বাড়াতে ভাল লাগল না কিশোরের।

নড়তে শুরু করল পেন্সিল। কাগজের ওপর একটা নকশা ফুটে উঠছে। নাক টানল ডিগ। নাকের ডগা ডলল। 'দেখো, এই তীরচিহ্ন ধরে ধরে গিয়ে এই এক্স আঁকা জায়গাটায় পৌঁছবে। ওখানেই পাবে রুনাককে।'

'দিন।' কাগজটা নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে ভরল কিশোর।

'এখন আমাকে কিছু মিষ্টি খাওয়াও,' ডিগ বলল। 'গোটা তিনেক আইসক্রীম হলেই চলবে।'

এল আইসক্রীম। অন্য খাবারগুলোর মত এটাও তাড়াহুড়ো করে খাওয়ার চেষ্টা করল ডিগ। পারল না। দাঁতে লাগে। দাঁতের বিরুদ্ধে একশো-একটা অভিযোগ করল। তবে তারপরেও দ্রুতই শেষ করল বলতে হবে। উঠে দাঁড়াল সে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন দুই গোয়েন্দা। ওরাও উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে দিল ডিগ। 'কিছু মনে কোরো না। তোমাদের অনেক খরচ করিয়ে দিলাম। তবে বিনিময়ে অনেক দামী গুপ্তধনের সন্ধানও দিয়েছি। হাহ্ হাহ্ হাহ্ হা!'

খাবারের দাম মিটিয়ে দিল কিশোর। চলে গেল রহস্যময় অদ্ভুত চরিত্রের লোকটা।

রাস্তায় বেরিয়ে বলে উঠল রবিন, 'লোকে বলে যত রাজ্যের উদ্ভট লোকের বাস আমেরিকায়—কথাটা মিথ্যে নয়। এই ডিগ তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। জন্ম ভিখিরি, এদিকে নাম রেখেছে এমপরার। আহা!'

'তবে যাই বলো, ডিগনিটি আছে লোকটার,' হাসল কিশোর। 'রসিকও বটে...' কথা শেষ না করেই রবিনের হাত খামচে ধরল। 'ওই দেখো, কে উঁকি মারছে!'

একটা দোকানের উইনডোতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে ওদের সেই তাড়া করা বাঁদর-মুখো লোকটা। পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল দুজনে। রাস্তার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা।

মুহূর্তে নড়ে উঠল রবিন। দৌড় দিল লোকটাকে ধরার জন্যে।

গাড়ির হর্ন। টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ। আরেকটু হলেই ট্যাক্সিটা চাপা দিয়ে দিচ্ছিল রবিনকে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল সে।

লালমুখো ড্রাইভার জানালা দিয়ে মুখ বের করে ঘুসি দেখাতে শুরু করল রবিনকে। চিৎকার করে বলল, 'কবরে যাবার শখ হয়েছে!'

ফিরে তাকাল রবিন। কিশোরের নজর রবিন আর ড্রাইভারের ওপর ঘুরতে লাগল। দৌড়ে রবিনের পাশে চলে এল সে। আবার যখন বাঁদর-মুখো লোকটার দিকে ঘুরল, দেখে সে ওখানে নেই।

'এ ভাবে না দেখে আর রাস্তা দিয়ে দৌড় মেরো না,' সাবধান করল কিশোর।

'তোমরা কি হে, অ্যাঁ!' রাগ পড়েনি ট্যাক্সি ড্রাইভারের। 'এত বড় বড় ছেলে, বুদ্ধিশুদ্ধি হয়নি নাকি এখনও। এ ভাবে রাস্তা দিয়ে দৌড় মারে কেউ!' রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরেকটু হলেই তোমাকে খুনের দায়ে লাইসেন্স খুইয়ে না খেয়ে মরতে হত আমাকে। পুলিশী ঝামেলার কথা বাদই দিলাম।'

'সরি,' মাপ চাইল রবিন। 'বেঁচে যখন গেছেন এখন আর রাগারাগি না করে কিছু পয়সা রোজগার করবেন নাকি ভেবে দেখুন।'

ট্যাক্সিতে চড়ল দুজনে। ডিগের এঁকে দিয়ে যাওয়া নকশাটা বের করে ড্রাইভারকে দেখাল কিশোর। ক্রস চিহ্নটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ জায়গাটায় আমাদের নিয়ে যেতে পারবেন?'

'এ তো বালকি মনে হচ্ছে,' নকশাটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল ড্রাইভার। 'নিয়ে যেতে পারব। তবে বেশ কিছু টাকা খসবে তোমাদের।'

'কি আর করব খসলে। যান।'

নতুন শহরের দিকে ছুটল গাড়ি। একটা সুড়ঙ্গ পেরোল। বেরিয়ে এল চওড়া হাইওয়েতে। কিছুদূর চলার পর মোড় নিয়ে আরেক রাস্তায় পড়ল। আরও আধঘণ্টা চলার পর গতি কমিয়ে থামল একটা গোরস্থানের গেটের কাছে। আঙুল তুলে বলল, 'এটাই তোমাদের ঠিকানা।'

রবিন অবাক। 'এ তো গোরস্থান!'

'তাই তো,' ড্রাইভার বলল। 'যেখানে আসতে চেয়েছ সেখানেই নিয়ে এলাম।'

বিমূঢ় হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দা। কবরস্থানের ঠিকানা দিল কেন ডিগ?

ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিল কিশোর। নেমে পড়ল দুজনে।

'গুড-বাই!' হাত নেড়ে ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল ড্রাইভার।

'কিশোর!' মেজাজ খারাপ লাগছে রবিনের, 'আমার মনে হয় ডিগ ব্যাটা আমাদের ঠকিয়েছে।'

'চলো, দেখি আগে। গোরস্থানেও চাকরি করে লোকে। মালীগিরি, কবর খোঁড়া–অনেক কাজই তো আছে গোরস্থানে।'

'রুনাক এখানে চাকরি করে ভাবছ?'

'অসুবিধে কি।'

'অফিস' লেখা ছোট একটা বাদামী বিল্ডিঙের দিকে এগোল ওরা। সদর দরজা হাঁ হয়ে খোলা। ভেতরে ঢুকল ওরা। ডেস্কের ওপাশে বসে থাকতে দেখা গেল কলসের মত পেটওয়ালা এক বৃদ্ধকে। মাথার মাঝখানের টাক ঘিরে যেন মালা তৈরি করে রেখেছে সাদা চুল। ঘন ভুরু দুটোকে লাগছে সাদা ছোটখাট দুটো ঝোপের মত। ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা নাক। সব কিছু মিলিয়ে কার্টুনের চরিত্রের মত লাগছে তাকে।

'আমি এখানকার সুপারিনটেনডেন্ট,' লোকটা বলল। 'কোন আত্মীয়ের খোঁজে এসেছ?'

'না, ঠিক আত্মীয় নয়,' জবাব দিল কিশোর। মুখে ঝুলিয়ে রাখল একটা

সার্বক্ষণিক হাসি।

'আমরা এসেছি মিস্টার রুক রুনাকের খোঁজে,' রবিন বলল। 'ঠিক জায়গায় এসেছি তো?'

'নিশ্চয়ই। ও কোথায় আছে, আমাদের গ্রাউন্ডসম্যান তোমাদের দেখিয়ে দেবে।'

এখানে ঢুকে এত সহজে রুনাককে পেয়ে যাবে, বিশ্বাস হচ্ছে না রবিনের।

ছেলেদের বাইরে নিয়ে এল বুড়ো। হাত তুলে খোয়া বিছানো একটা রাস্তা দেখাল। ওভারঅল পরা একটা লোক কাঁচি দিয়ে পাতাবাহারের পাতা ছাঁটছে। ওর দিকে এগোতে যাবে, এই সময় গেট দিয়ে ঢুকল একটা শব-মিছিল। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল দলটা।

'সরি,' সুপারিনটেনডেন্ট বলল। 'মনে হচ্ছে অপেক্ষা করতে হবে তোমাদের।' ওদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়ল আবার অফিসে।

অনেক লম্বা মিছিল। রবিন গুনল, পনেরোটা লিমুজিন গাড়ি। ধীরে ধীরে ওঁদের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল। মিছিলটা চলে গেলে রাস্তায় নেমে পড়ল দুজনে। প্রায় দৌড়ে চলল গ্রাউন্ডসম্যানের দিকে।

বলতেই ওদেরকে রুনাকের কাছে নিয়ে যেতে রাজি হয়ে গেল লোকটা। খোয়া বিছানো পথ ধরে গোরস্থানের পেছন দিকে চলে এল তিনজনে। ঢালু, চ্যাপ্টা একটা জায়গায়।

এদিক ওদিক তাকাতে লাগল দুই গোয়েন্দা। কাউকে চোখে পড়ল না।

'রুনাক কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

হাত তুলে একটা নতুন কবর দেখাল গ্রাউন্ডসম্যান। কবরের মাথার কাছে বসানো ফলকটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। পড়ল মৃতের নাম-ঠিকানা। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল কবরটার দিকে।

সাত

রুক রুনাক মৃত!

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল দুই গোয়েন্দা। বিমূঢ় হয়ে গেছে। হাঁ হয়ে গেছে মুখ।

গ্রাউন্ডসম্যান ভাবল খুব শক পেয়েছে ওরা। নরম কণ্ঠে জানতে চাইল, 'তোমাদের বন্ধু ছিল নাকি ও?'

'না, বন্ধু না,' জবাব দিল রবিন। 'তবে ওকে আমাদের খুব দরকার ছিল।'

'বড় দেরি করে ফেলেছ,' আবেগ প্রবণ হয়ে উঠল গ্রাউন্ডসম্যান। 'সব প্রয়োজনের বাইরে চলে গেছে এখন ও।...বেচারা! সারা জীবন পাপ করেছে। তার জন্যে অনুশোচনাও করে গেছে প্রচুর। জেলখানায় থাকতেই অতিরিক্ত ধার্মিক হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন এখানে ওখানে ঘুরে শেষে এই গোরস্থানে চাকরি নিল। খুব ভাল

কর্মী ছিল। নিবেদিত শ্রমিক। গোরস্থানের জন্যে উপযুক্ত লোক।'

গ্রাউন্ডসম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়ে অফিসে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা। রবিন জানতে চাইল সহকর্মী সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয়েছে নাকি রুনাক।

সুপারিনটেনডেন্ট জানাল স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে রুনাকের। ওর বোনের মৃত্যুর পর একদিন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। তারপর নীরবেই চলে গেল একরাতে। 'হার্টটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যা মনে হয়,' বলল সে। 'বোনের মৃত্যুর মানসিক ধকল আর সহ্য করতে পারেনি বেচারা।'

বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। গোরস্থানের বাইরে এসে দাঁড়াল। বোকা হয়ে গেছে।

'হেসে নিশ্চয় লুটোপুটি খাচ্ছে এখন এমপরার ডিগ,' তিক্তকণ্ঠে বলল রবিন। 'কবরের ঠিকানা দেয়ার জন্যে কি খাওয়ানটাই না খাওয়ালাম।'

মুখে হাসি ধরে রাখার চেষ্টা করল কিশোর। 'বুঝলাম, আমাদের অনুমান ভুল হয়েছিল; কিন্তু লাভও হয়েছে একটা—রুক রুনাককে আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারলাম।'

'শুধু তালিকা থেকে বাদ দেয়ার জন্যে এত কিছু করার প্রয়োজন ছিল না,' গোমড়ামুখে কোনমতেই হাসি ফুটল না রবিনের। 'যা-ই বলো না কেন, নিজেকে আস্ত একটা রামছাগল মনে হচ্ছে আমার। কেসের সমাধান করব কি করে? কোন সূত্র তো পেলাম না।'

এত তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। ফুটপাথ ধরে হাঁটল কিছুক্ষণ। বিরক্তি আর হতাশা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। মগজে ভাবনার ঝড়। নানা প্রশ্ন: রুনাক ওদের লোক নাহলে তার নামের রেকর্ড চুরি গেল কেন বোরিসের ইনডেক্স থেকে? তার নামের ফাইল চাচাই বা অ্যাটাকানে নিয়ে গিয়েছিলেন কেন?

'চাচার হারানো ব্রীফকেসেই রয়েছে সম্ভবত এ প্রশ্নের জবাব,' নিজেকে বোঝাল কিশোর। 'কিন্তু সেই ব্রীফকেসটা এখন কোথায়?'

হাঁটতে হাঁটতে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'একটা ব্যাপার নিশ্চিত। চাচার এই শত্রুদের সুপার-ইনটেলিজেন্স সিসটেম রয়েছে। বাড়িতেই হোক, কিংবা লস অ্যাঞ্জেলেসে; যে প্ল্যানই করছি আমরা, কি করে যেন আগেভাগেই জেনে যাচ্ছে সব। কি করে জানছে, সেটা বের করতে না পারলে এক পা-ও এগোতে পারব না আমরা। প্রতিটি ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে জিততে থাকবে ওরা।'

একটা ট্যাক্সি ডেকে থামাল কিশোর। হোটেলের সামনে এসে নামল। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে রবিনের দিকে তাকাল, 'ওই প্রথম ব্লকটাতে আরেকবার খুঁজে এলে কেমন হয়?'

'কাকে?'

'বাঁদর-মুখোটাকে।'

'লাভ হবে না। এ ভাবে খুঁজে পাব না।'

তবুও খুঁজতে বেরোল ওরা। আলাদা হয়ে গিয়ে দুজন দুদিক থেকে। প্রতিটি বাড়ির ছাত, বারান্দা, জানালা, দরজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চলল।

আটত্রিশ নম্বর বাড়ির সামনে দিয়ে চলেছে রবিন, খুলে গেল সামনের দরজা। বেরিয়ে এল গোলাপী হাউসকোট পরা বাড়িওয়ালি। হাতে ঝাড়ু। সিঁড়ি ঝাঁট দেবে। ওর দিকে এগিয়ে গেল রবিন। কিশোরও এসে দাঁড়াল উল্টোদিক থেকে।

'রুক রুনাক যে মারা গেছে,' চাঁছাছোলা গলায় রবিন বলল, 'আমাদের বলেননি কেন?'

চমকে গেল মহিলা। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল।

'কেউ নিশ্চয় শাসিয়ে গেছে তাকে,' কিশোর বলল। 'মুখ খুলতে বারণ করে দিয়েছে।'

'তাতে লাভটা কি? রুনাক তো মরেই গেছে।'

'হয়তো নানা রকম চালাকি করে আমাদের একটা ধাঁধার মধ্যে ফেলে রাখার জন্যে।'

পাশাপাশি হেঁটে চলল দুজনে। রাস্তা পেরিয়ে এসে থামল একটা পরিত্যক্ত দোকানের সামনে। চোখ রাখল ৩৮ নম্বর বাড়ির ওপর। কিন্তু আর কিছু ঘটল না। বাড়িওয়ালি বেরোল না।

বাঁদর-মুখোর ছায়াও দেখতে পেল না আর।

বিফল হয়ে হোটেলে ফিরে এল। ডেস্ক ক্লার্ক চাবি তুলে দিল কিশোরের হাতে। 'চলে যাচ্ছ নাকি? রূম ছাড়লে এখনই ছাড়তে হবে। নইলে আরেকদিনের ভাড়া দিতে হবে।'

–'পনেরো মিনিটের মধ্যে খালি করে দিচ্ছি।'

ঘরে এসে দ্রুতহাতে সুটকেসে জিনিসপত্র ভরতে লাগল দুজনে।

একটা করে জিনিস তুলছে আর গুছিয়ে রাখছে রবিন। ওয়াশ-বেসিনের ওপর থেকে লাল হাতলওয়ালা ব্রাশটা তোলার জন্যে হাত বাড়িয়েই থমকে গেল। একটা সাদা কাগজ জড়ানো রয়েছে তাতে। যাতে খসে পড়ে না যায় সে-জন্যে ইলাস্টিক ব্যান্ড দিয়ে আটকানো।

ব্যান্ড সরিয়ে কাগজটা খুলে নিল সে। ভাঁজ খুলল। লেখা রয়েছে:

সাবধান!
লেজকাটা টিকটিকিদের জন্যে
রকি বীচই উত্তম স্থান!

নিচের সইটা বিচিত্র। পেঁচানো কয়েকটা ছোট-বড় ফাঁস যেন একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে দিয়ে তৈরি করেছে ইংরেজি 'আর', অক্ষরটা।

'কিশোর, দেখো!'

দেখে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল কিশোরের। 'রুনাক তো মৃত!'

'সত্যি কি মৃত?'

'কবরস্থানের নামের ফলক, গ্রাউন্ডসম্যান আর সুপারিনটেনডেন্টের কথা তো তা-ই প্রমাণ করে। ছদ্মনামে কোন মানুষকে কবর দেয়া হয় না।'

'তাহলে চিঠিটা লিখল কে?'

'যে-ই লিখুক, এর নামেরও আদ্যক্ষর আর। কিংবা আমাদের মগজটা গুলিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা।'

দ্রুত জিনিসপত্র গোছানো শেষ করল দুজনে। পনেরো মিনিটের বেশি দেরি হলে আবার ভাড়া চেয়ে বসবে ক্লার্ক। নিচে নেমে তাকে মেসেজটার কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কিছুই জানে না' বলে স্রেফ অস্বীকার করল ক্লার্ক। হালকা হাসি ফুটল তার ইঁদুরের মত মুখে। 'যাবার আগে রসিকতা করেছে বোধহয় তোমাদের কোন দোস্ত।'

চাবিটা ক্লার্কের সামনে ডেস্কে ফেলে দিল কিশোর।

'একটা লোকও ভাল না এখানকার!' হোটেলের সামনে থেকে সরে যেতে যেতে মন্তব্য করল রবিন।

প্রথম যে পাবলিক টেলিফোন বুদটা দেখল, তাতেই ঢুকে রোভারকে ফোন করল কিশোর। প্লেন নিয়ে আসতে বলল।

আট

রকি বীচে ফিরে প্রথমে হাসপাতালে গেল কিশোর, চাচাকে দেখতে। রবিনও গেল। হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার তখন শেষ। তবে স্পেশাল ব্যবস্থায় ওদের দুজনকে ঢুকতে দেয়া হলো। শরীরের কিছুটা উন্নতি হয়েছে রাশেদ পাশার। তবে স্মৃতিশক্তি ঠিক হতে দেরি আছে।

বাড়ি ফিরে এল কিশোর। বোরিসকে ফোন করল।

রুনাকের মৃত্যুর খবর শুনে বোরিস অবাক। 'বলো কি! তার মানে কোন লাভই হলো না ওখানে গিয়ে?'

'হলো। এই যে রুনাকের ব্যাপারটা জানতে পারলাম।'

'তার মানে মিস্টার পাশাকে কিডন্যাপ করার পেছনে অন্য কারও হাত আছে?'

'হ্যাঁ।'

'এবং সেই লোকটাই নিশ্চয় লস অ্যাঞ্জেলেসে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করেছে তোমাদের?'

'হ্যাঁ। তদন্ত করতে দিতে চায়নি, ধরা পড়ার ভয়ে।'

'হুঁ।'

মুসাকে ফোন করল তখন কিশোর। লস অ্যাঞ্জেলেসের খবর জানাল। জিজ্ঞেস করল ওদের অনুপস্থিতিতে ইয়ার্ডে কিংবা হাসপাতালে সন্দেহজনক কোন লোককে ঢুকতে দেখেছে কিনা।

দেখেনি, মুসা জানাল।

পরদিন সকালে কিশোরদের বাড়ির বারান্দায় বসে রহস্যটা নিয়ে আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা। দোতলা থেকে খুটুর-খাটুর, ভোঁ-ভোঁ, নানা রকম আওয়াজ আসছে। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে ঘর পরিষ্কার করছে মিস কোয়াড্রুপল।

হঠাৎ শোনা গেল তার চিৎকার।

লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল কিশোর। পেছনে পেছন এল মুসা আর রবিন।

রাশেদ পাশার পড়ার ঘরে ঢুকল। ওই ঘরটা পরিষ্কার করতে করতেই চিৎকার করে উঠেছে মিস কোয়াড্রুপল।

'কি হয়েছে, আন্টি?' জানতে চাইল কিশোর।

'পোকা!' হাত তুলে দেখাল মিস কোয়াড্রুপল।

ঘরের এককোণে, ছাতের ঠিক নিচে বড় একটা গুবরেপোকাকে বসে থাকতে দেখা গেল।

'অ, পোকাকে ভয় পান। দিন আমার কাছে, ফেলে দিচ্ছি,' মিস কোয়াড্রুপলের হাত থেকে ঝুল-ঝাড়নটা নিয়ে পোকাটাকে ফেলতে গেল কিশোর। বাড়ি খেয়েও নড়ল না ওটা। সরানোর অনেক চেষ্টা করেও পারল না।

হঠাৎ কি যেন কি হয়ে গেল তার! চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল পোকাটার দিকে।

'কি হলো?' জানতে চাইল মুসা।

ঠোঁটে আঙুল রাখল কিশোর। কথা বলতে নিষেধ করল। জোরে জোরে বলল, 'কি আর হবে, বেয়াড়া পোকা। থাকগে। সময় হলে আপনা-আপনি চলে যাবে। আন্টি, একটা গুবরেপোকাকে দেখে অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। গুবরেপোকা বিষাক্ত নয়। আপনার কাজ আপনি করুন। আমরা গেলাম।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সবাই।

আবার সবাইকে কথা না বলতে ইশারা করল সে। একটা টেবিল তুলে নিয়ে গেল নিঃশব্দে। তার ওপর একটা চেয়ার রেখে তাতে উঠে দাঁড়াল। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল পোকাটাকে। নড়ল না ওটা। আগের মতই নিথর। আঙুল দিয়ে ঠেলা দিল। সরাতে পারল না। দেয়ালের সঙ্গে এঁটে বসে আছে। যেন আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। হাসি ফুটল তার মুখে। সন্তুষ্ট হয়ে আপনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে নেমে এল চেয়ার থেকে।

মুখে কিছু না বলে সবাইকে ঘরের বাইরে আসতে ইশারা করল কিশোর। সবাই বেরোলে বাইরে থেকে আস্তে করে লাগিয়ে দিল দরজাটা। ফিসফিস করে বলল, 'বাগ!'

'সেটা কি আর জানি না,' কিশোরের আচরণে অবাক যেমন হয়েছে, খানিকটা বিরক্তও হয়েছে মিস কোয়াড্রুপল, রুষ্ট স্বরে বলল তাই। 'পোকা চেনার মত বয়েস হয়েছে আমার।'

'এ পোকা সে-পোকা নয়। আস্তে কথা বলুন। শুনে ফেলবে।'

রবিন বুঝে ফেলল, 'মাইক্রোফোন! এতক্ষণে বোঝা গেল, কি করে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা জেনে যাচ্ছে শত্রুপক্ষ। কোন এক সুযোগে লুকিয়ে রেখে গেছে।

'কিন্তু রাখল কি করে ওখানে?' মিস কোয়াড্রুপল বলল। 'কেউ না থাকলে আমি মুহূর্তের জন্যে বাড়ি ছেড়ে নড়ি না। কেউ ঘরে ঢোকেনি, বাজি রেখে বলতে পারি।'

'আপনি বাড়িতে থাকতেই এসে লাগিয়ে রেখে গেছে সে,' কিশোর বলল। 'সেদিন মিস্টার হার্ডসন এসেছিল না চালা মেরামত করতে। আমি এখন শিওর, ওই লোকটা মিস্টার হার্ডসন ছিল না। আপনি তাকে চেনেন না বলে সহজেই ফাঁকি দিয়ে

গেছে। সুযোগ বুঝেই এসেছিল সে। মই বেয়ে উঠে ঘরে ঢুকেছিল, আপনি টের পাননি। লোকটা দেখতে কেমন ছিল?'

'হালকা-পাতলা ছোটখাট মানুষ। পরনে কাজের পোশাক। খুব ক্ষিপ্র। মইটা বেয়ে যে ভাবে তরতর করে উঠে গেল, না দেখলে বিশ্বাস করবে না। মুখটা যেমন বানরের মত, বেয়ে উঠলও বানরের মত...'

'বানরের মত!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন।

'হ্যাঁ। কেন?'

জবাব না দিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। মাথা ঝাঁকাল কিশোর। লস অ্যাঞ্জেলেসের সেই বাঁদর-মুখো, সন্দেহ নেই।

মিস কোয়াড্রুপলের দিকে ফিরল কিশোর। 'পোকার চেহারায় বানানো একটা লিসনিং ডিভাইস ওটা।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। 'ট্র্যান্সমিটারটা নিশ্চয় রাখা আছে এ বাড়িরই কোনখানে। চিলেকোঠায় থাকতে পারে।'

চিলেকোঠায় দেখতে চলল সে। পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। একটা জানালা অর্ধেক খোলা। ওটার কাছে, মেঝের দুটো তক্তার নিচে কায়দা করে লুকানো দেখতে পেল ছোট্ট একটা যন্ত্র।

নিচু হয়ে তুলতে গেল মুসা। বাধা দিল কিশোর।

নিচে, রান্নাঘরে নেমে এল আবার সবাই। ছেলেদের গোয়েন্দাগিরিতে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে মিস কোয়াড্রুপল। মজা পাচ্ছে এখন। সঙ্গ ছাড়ছে না। ওরা যেখানে যেখানে গেল, সে-ও যেতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে।

রান্নাঘরের টেবিল ঘিরে বসল তিন গোয়েন্দা। মিস কোয়াড্রুপল বলল, 'চকলেট ড্রিংক এনে দেব?'

মাথা কাত করল কিশোর। 'দিন।' রবিনের দিকে তাকাল, 'রবিন, এটাই আমাদের সুযোগ। বাগওলাকে জানতে দেব না ওর চালাকি আমরা ধরে ফেলেছি। চাচার পড়ার ঘরে বসে বসে এখন যত দুনিয়ার ভুল তথ্য সরবরাহ করতে থাকব ওকে।'

'দারুণ হবে!' হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুসার মুখে। 'আমাদের কথা শুনে শুনে উল্টোপাল্টা জায়গায় ঘুরে মরবে সে, বেকার সব কাজ করতে থাকবে। করুক। শয়তানের শাস্তি হবে।'

মেরিচাচী ঢুকলেন। অফিসে ছিলেন এতক্ষণ। 'কি নিয়ে এত হই-চই করছিস তোরা?'

ড্রিংকের গ্লাসগুলো টেবিলে এনে রাখল মিস কোয়াড্রুপল। 'ম্যা'ম, আপনাকে এক গ্লাস দেব?'

'নাহ্, আমার লাগবে না। বরং এক কাপ চা দাও আমাকে।'

বাগটার কথা চাচীকে জানাল কিশোর। যাতে সতর্ক থাকতে পারে। বাঁদর-মুখো লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলল, 'ইয়ার্ডের আশেপাশে ওকে দেখলেই আমাদের ডাক দেবে। আমরা বাড়ি না থাকলে থানায় ফোন করে ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে জানাবে।'

ফুঁসে উঠল মিস কোয়াড্রুপল। 'পুলিশকে আর জানানো লাগবে না।

আরেকবার আমার সামনে পড়ে দেখুক না খালি, বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব! সেদিন চিনতাম না বলে ফাঁকিটা দিয়ে গেল।'

ড্রিংক শেষ করে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে চলল তিন গোয়েন্দা। প্রচুর শব্দ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চাচার পড়ার ঘরে ঢুকল। তারপর জোরে জোরে শুরু করে দিল বয়ান, পরবর্তী কাজের ফিরিস্তি।

'ওদের পেছনে লাগা বন্ধ করব না আমি,' কিশোর বলল। 'চলো, আবার যাই অ্যাটাকানে।'

'এখনই?' মাইক্রোফোনটার দিকে ইঙ্গিত করে কিশোরকে চোখ টিপে হাসল রবিন।

'অসুবিধে কি? তৈরি হতে তো সময় লাগবে না। মুসা, কি বলো?'

'আমার কোন আপত্তি নেই। বাড়ি যাব, আর সুটকেসটা নিয়ে চলে আসব, ব্যস।'

'বেশ, তাহলে তা-ই করা যাক।' টেলিফোনের রিসিভার তুলতে গিয়েও অকারণে প্রচুর শব্দ করল কিশোর। ডায়াল না করেই ফোন করার ভান করল, 'রোভার? কিশোর বলছি। প্লেনে তেল ভরে নাও। আজ বিকেলেই আবার অ্যাটাকানে যেতে হবে।'

এত জোরে খটাস করে রিসিভারটা ক্রেডলে রাখল সে, মাইক্রোফোনে শোনা যেতে বাধ্য। বাগটার দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে বলল, 'ধরতে পারি আর না পারি শান্তিতে থাকতে দেব না ব্যাটাদের।'

আরও কিছুক্ষণ বকবক করে, উল্টোপাল্টা কথা বলে হাসিমুখে বেরিয়ে এল তিনজনে। নিচের বারান্দায় এসে বসল। ঘরে বা বদ্ধ জায়গায় বসে খোলাখুলি আলোচনা করা নিরাপদ নয়। আরও কোনখানে বাগ লুকিয়ে রেখেছে, কে জানে।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করা?'

'ওরা কি করে, তার অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না। ওরা কিছু করলে, তখন আমরাও কিছু করার সুযোগ পাব।'

'তাই বলে একেবারে চুপচাপ বসে থাকব? এ ভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে ভাল্লাগছে না আমার। তারচেয়ে চলো, বিডদের বাড়িতে চলে যাই। আড্ডাও মারা যাবে, টেবিল-টেনিসও খেলা যাবে।'

বিডদের বাড়িতে চমৎকার একটা টেবিল টেনিস খেলার টেবিল আছে। তবে খেলার চেয়ে অন্য কারণে ওখানে যেতে আগ্রহ দেখাল কিশোর। 'বেশ, চলো, ওখানেই যাই। মিস্টার ওয়াকারের সঙ্গেও কথা বলা যাবে। আরও আগেই বলা উচিত ছিল আমাদের।'

নয়

বিডদের বাড়িতে পৌঁছে দেখা গেল মিস্টার ওয়াকার নেই। বাইরে গেছেন, কাজে।

তবে তাঁর আসার সময় হয়ে গেছে। মিসেস ওয়াকার বিডের ঘরে গিয়ে বসতে বললেন ওদের। বিডের ঘরে টম আর রিচি রয়েছে, এ খবরটাও জানালেন।

তিন গোয়েন্দাকে দেখে হই-হই করে উঠল বিড়রা। বিড, টম, রিচি ওদের বন্ধু। এক স্কুলে পড়ে। প্রথম দুজন তদন্তের কাজে বহুবার সাহায্য করেছে ওদের। আর এবার তো বিডের বাবার কেস নিয়েই তদন্ত করছে তিন গোয়েন্দা।

টমাস মার্টিনের ডাক নাম টম। পেটানো স্বাস্থ্য, ছয় ফুট লম্বা, বক্সিং তার প্রিয় খেলা। বিড ওয়াকার কিছুটা খাটো, সুদর্শন, কালো চোখ। রিচি বুমারের শরীরটা রোগাটে, কিন্তু বেশ চটপটে সে। ভাল ছবি আঁকতে পারে।

'তোমার চাচার জন্যে, সত্যি, খুব খারাপ লাগছে আমার,' কিশোরকে বলল বিড। 'আব্বার কাজ করতে গিয়েই বিপদে পড়লেন…'

'সেটা নিয়েই আলোচনা করতে এসেছিলাম আঙ্কেলের সঙ্গে। কিন্তু তিনি তো বাড়ি নেই।'

'বোসো তোমরা। আব্বা চলে আসবে।' মুসার দিকে তাকাল বিড, 'তুমি আসায় ভালই হয়েছে। শুধু শুধু বসে গ্যাঁজানো লাগল না আর। একদান টেবিল টেনিস হয়ে যাক। কি বলো?'

মুসার তো সেটাই উদ্দেশ্য। কোন রকম ভান-ভণিতার মধ্যে না গিয়ে রাজি হয়ে গেল সে।

বিডদের টেবিল টেনিস-রূমটা নিচতলায়। বন্ধুদের সেখানে নিয়ে চলল সে। হলঘর পেরোনোর সময় আবার মিসেস ওয়াকারের সঙ্গে দেখা। বললেন, 'না খেয়ে কেউ যেতে পারবে না আজ। তোমাদের জন্যে স্পেশাল রান্না হচ্ছে।'

হুল্লোড় করে উঠল ছেলের দল।

মুসার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন মিসেস ওয়াকার। 'ফ্রুটকেক, পুডিং, আইসক্রীম তো থাকছেই। বলো তো, মাংস দিয়ে কি করা যায়?'

'আর বলবেন না, আন্টি,' সড়াৎ করে জিভের জলটুকু গিলে ফেলল মুসা। 'রান্না হতে নিশ্চয় সময় লাগবে। বেশি আলোচনা করলে সহ্য করতে পারব না এতক্ষণ। তারচেয়ে আপনার যা ভাল মনে হয় রেঁধে ফেলুনগে। কিছুই পড়ে থাকবে না ট্রে'তে, এটুকু কথা দিতে পারি।'

হাসতে হাসতে চলে গেলেন মিসেস ওয়াকার।

খেলার ঘরে এসে ঢুকল ওরা।

একদান শেষ হওয়ার আগেই বাড়ি ফিরে এলেন মিস্টার ওয়াকার। তিন গোয়েন্দার আসার খবর শুনে খেলার ঘরে উঁকি দিলেন।

'হাই, বয়েজ,' আন্তরিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কেমন আছ?'

খেলা থেমে গেল।

ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসলেন তিনি।

'আপনার কাছেই এসেছি, আঙ্কেল,' কিশোর বলল। 'আপনার কাজের কথা জানতে। ব্রিজটার কি খবর?'

'ভাল না। আবার অ্যাটাক হয়েছিল, জানো তো?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কি করে জানব?'

'বিড বলেনি?'

বিড বলল, 'আমি ভাবলাম, তোমার মুখ থেকেই সব শুনুক ওরা, তাই বলিনি। আর আমি তো সব জানিও না।'

'আবার কি হলো?' জানতে চাইল কিশোর।

'ব্রিজটা আবার মেরামত শুরু করেছিল আমার লোকেরা, কিন্তু কিছুটা করতে না করতেই আবারও ধসে পড়ল। এবার খুঁজে পাওয়া গেছে একটা অ্যাসিটিলিন টর্চ। ওটা দিয়ে ব্রিজের স্ট্রেস পয়েন্টগুলো কেটে দিয়েছে। কাটা জায়গাগুলো পুটি দিয়ে বন্ধ করে রঙ করে দিয়েছে, যাতে কিছু বোঝা না যায়। ধসে পড়ার আগে বোঝা যায়ওনি।'

'খাইছে!' মুসা বলল, 'কি সাংঘাতিক! কেউ জখম-টখম হয়নি তো?'

'না, ভাগ্য ভাল, সে-রকম কোন অঘটন ঘটেনি, তাহলে তো বিপদেই পড়ে যেতাম,' জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন মিস্টার ওয়াকার। 'ভাবছি স্যাবটাজ কে করছে সেটা না জানা পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখব।'

'অনেক লোকসান হয়ে যাবে তো তাহলে আপনার,' টম বলল।

'হলে আর কি করব।'

রবিন বলল, 'এটা নিয়েই আলোচনা করছিলাম আমরা এতক্ষণ। কিশোর একটা বুদ্ধি বের করেছে। এখন তো স্কুল ছুটি। দল বেঁধে সবাই অ্যাটাকানে চলে যেতে পারি আমরা। আপনার প্রজেক্টে কাজ করার ছুতোয় রহস্যটার সমাধানের চেষ্টা করতে পারি।'

'তাহলে তো খুব ভালই হয়,' প্রস্তাবটা লুফে নিলেন মিস্টার ওয়াকার। 'তা কিভাবে কি করবে ঠিক করেছ কিছু?'

মুখ খুলতে যাচ্ছিল কিশোর, এ সময় দরজায় উঁকি দিলেন মিসেস ওয়াকার। 'কিশোর, তোমার ফোন।'

মিস্টার ওয়াকারের দিকে তাকিয়ে, 'আসছি' বলে উঠে চলে গেল কিশোর।

কয়েক মিনিট পর ফিরে এল। চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ। হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল সে। দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছে ব্যাটারা।'

'মানে?' বুঝতে পারল না মুসা।

'রোভার ফোন করেছিল। এয়ারপোর্ট থেকে জরুরী খবর দিয়েছিল তাকে। গিয়ে দেখে আমাদের প্লেনটার প্রপেলার উড়িয়ে দিয়েছে। দূর থেকে হাই পাওয়ারড রাইফেল দিয়ে গুলি করে। এমনভাবে নষ্ট করেছে, রোভার বলল, সারাতে সময় লাগবে।'

'বুঝেছি,' মাথা দোলাল রবিন। 'ওই যে মিছিমিছি বললে তখন, আজ বিকেলেই অ্যাটাকানে যেতে চাও, সেটা শুনে ফেলেছে ব্যাটারা। যেতে যাতে না পারি সে-জন্যে প্লেনটাকে বিকল করে দিয়েছে।'

কি নিয়ে আলোচনা করছে, তিন গোয়েন্দা ছাড়া কেউ বুঝল না। তাদেরকে অন্ধকারে না রেখে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানাল কিশোর।

'হুঁ,' শোনার পর চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মিস্টার ওয়াকার. 'বিপজ্জনক

লোক। এরমধ্যে তোমাদের নিয়ে যেতে ভরসা পাচ্ছি না আমি।'

'বিপদের কথা ভেবে লাভ নেই,' কিশোর বলল। 'গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে ঝুঁকি নিতেই হবে। অপরাধীরা কি আর সহজে ছেড়ে দেয়।...যাকগে, যা বলছিলাম তখন, আমরা আপনার প্রজেক্টে কাজ নেব। আপনার যে ফোরম্যান শ্রমিকদের চাকরিতে নিয়োগ করে, তার নাম কি?'

'আপাতত দায়িত্বে আছে এরিক বোম্যান।'

'লোকটা কি ভাল? বিশ্বাস করেন তাকে?'

'তা করি।'

'আপাতত বললেন কেন?'

'আসল যে লোক–কার্ল হ্যারিস, ওখানকার স্থানীয়, সে গেছে সাতদিনের ছুটিতে। তার জায়গায় কাজ করছে এরিক।'

প্ল্যানটা বলল তখন কিশোর। প্রত্যেকেই কাজ করবে ওখানে, তবে একেকজন একেক জায়গায়। যেমন, যন্ত্রপাতির মেকানিক হবে বিড। টমকে দেয়া যেতে পারে ট্রাক চালানোর কাজ। রিচি টাইমকীপার। কেউ কোথাও কাজে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা দেখতে পারে।

খুশি মনে শিস দিয়ে উঠল রিচি। 'খুব ভাল হয় তাহলে। বসে বসে টাইম দেখব, সেই সাথে ছবি আঁকার সুযোগ পাব।'

'আর আমার কাজটা কি হবে?' মুসা জানতে চাইল।

'শ্রমিক,' কিশোর বলল। 'শাবল-গাঁইতি নিয়ে কাজ করবে, আর কান খাড়া করে শুনবে সঙ্গী শ্রমিকদের আলাপ-আলোচনা।'

'স্পাই?'

'তাই তো, আর কি?' বিড বলল। 'চুরি করে পরের কথা শোনাটাই হলো স্পাইয়ের কাজ। জিরো জিরো সেভেন নম্বরটা তো হাতছাড়া হয়ে গেছে, তোমাকে এইট দেয়া যেতে পারে।'

'জেমস বন্ড হওয়ার কোন ইচ্ছেই আমার নেই,' নাক কুঁচকাল মুসা। 'ওই স্পাইটাকে আমার একদম ভাল লাগে না। সুযোগ দিলেই মানুষ খুন! আরও যে কি সব কাণ্ডকারখানা করে না...'

'আমি আর রবিনও শ্রমিকের কাজ করব,' মুসাকে থামিয়ে দিল কিশোর। 'ব্রিজের শ্রমিক।'

'তা তো বুঝলাম,' কিশোরের দিকে তাকালেন মিস্টার ওয়াকার, 'কিন্তু স্যাবটাররা যদি বুঝে ফেলে তুমি মিস্টার পাশার ভাতিজা?'

'কি করে বুঝবে? নামটাও বদলে ফেলব,' জবাব দিল কিশোর। 'আর চিনে যদি ফেলেই, তখনকারটা তখন দেখা যাবে। বরং বিডকে চেনে কিনা ওখানকার লোকেরা, তা-ই বলুন। কন্ট্রাকটরের নিজের ছেলে গোপনে মেকানিকের চাকরি করতে গেছে প্রজেক্টে, এটা অনেক বেশি সন্দেহ জাগাবে স্যাবটারদের। যদি জানে।'

'না, জানার কোন কারণ নেই। বিড একবারও দেখতে যায়নি আমার ওখানকার প্রজেক্ট।'

'ওর নামটাও বদলে নিতে হবে। বিড থাকুক, তবে ওয়াকার রাখা চলবে না কিছুতেই। বরং ফারগুসন হয়ে যাক। কি বলো, বিড?'

'বিড ফারগুসন হতে কোন আপত্তি নেই আমার,' হাসল সে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবতার পর মিস্টার ওয়াকার বললেন, 'প্ল্যানট্যান তো ভালই করলে, কিন্তু তোমাদের এই বিপদের মধ্যে নিয়ে যেতে কিছুতেই মন সায় দিচ্ছে না আমার।'

'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, আঙ্কেল,' অভয় দিয়ে বলল কিশোর। 'বিপদ হলেও সেটা কাটাতে জানি আমরা। আপনি তো জানেন, গোয়েন্দাগিরি আমরা নতুন করছি না। অনেক বড় বড় বিপদে পড়েছি, বেরিয়েও এসেছি। অত ভাবছেন কেন?'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন মিস্টার ওয়াকার, 'যা ভাল বোঝো করো। আমার কাজ আছে, কয়েকটা জরুরী টেলিফোন করতে হবে। আমি যাই।'

দশ

পুরোদমে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা চলল গোয়েন্দাদের মাঝে–তিনের জায়গায় এখন ছয়জন। দলপতি কিশোর পাশা। যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে সে, তবে মতামত প্রদানের অধিকার সবারই আছে। রবিন প্রস্তাব রাখল, শত্রুপক্ষের নজর এড়ানোর জন্যে আলাদা আলাদা ভাবে রকি বীচ ত্যাগ করবে ওরা। তাতে অমত দেখা গেল না কারোরই।

কিশোর বলল, 'কাল সকালের বাসে অ্যাটাকান রওনা হব আমরা। ওখানে গিয়ে সবার দেখা হবে আবার।'

আলোচনা শেষে, বিডদের ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে যার যার বাড়ি ফিরে চলল ওরা। কিশোরকে গাড়িতে করে পৌঁছে দিতে চলল রবিন। তাকে ইয়ার্ডে নামিয়ে দিয়ে, মুসাকেও পৌঁছে দেবে ওদের বাড়িতে। যেতে যেতে লুকানো মাইক্রোফোনের ব্যাপারটা নিয়ে কথা হলো। রবিনের বিশ্বাস, শত্রুপক্ষ পুরোপুরি ধোঁকা খেয়েছে।

'এবার গিয়ে বলব, ক্যানাডায় স্যামন ধরতে যাচ্ছি আমরা, কিংবা হরিণ শিকারে,' হেসে বলল মুসা। 'আমাদের ওপর থেকে পুরোপুরি নজর সরিয়ে নেবে তখন।'

'অতটা বোকা মনে করার কোন কারণ নেই ওদের,' কিশোর বলল। 'দু'একবার ঠকলেও আমার ধারণা, শেষ পর্যন্ত আমাদের চালাকিটা ধরে ফেলবে ওরা। তবে ফাঁকিবাজিটা যতক্ষণ পারা যায় চালিয়ে গেলে মন্দ হয় না।'

ইয়ার্ডে ফিরে সোজা চাচার পড়ার ঘরে চলে এল কিশোর। মজাটা খোয়াতে রাজি নয় রবিন ও মুসা, তাই ওরাও সঙ্গে এল। মেরিচাচী, মিস কোয়াড্রুপল বা আর কারও সঙ্গে দেখা হলো না। ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল কিশোর। ভোঁতা গলায় জোরে জোরে বলল, 'রবিন, কেসটা আমাদের জন্যে বড় জটিল হয়ে গেছে।

আমার মনে হয় এবার এটা থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত আমাদের। পুলিশ যা পারে করুকগে।'

মুচকি হেসে চোখ টিপল রবিন। মাইক্রোফোনটার দিকে বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বলল, 'তা ঠিক। ওদের সঙ্গে পারব না আমরা।'

মুসা বলল, 'তারচেয়ে চলো ক্যানাডায় চলে যাই। ওখানকার পাহাড়ী নদীতে স্যামন শিকার করার শখ আমার বহুদিনের।'

দরজায় টোকা পড়ল। উঠে গিয়ে খুলে দিল কিশোর। মেরিচাচী দাঁড়িয়ে আছেন। ইশারায় ওদের বেরিয়ে আসতে বললেন। নিয়ে চলে গেলেন নিচতলায়। রান্নাঘরে ঢুকে ফিসফিস করে বললেন, 'তোরা এমন তাড়াতাড়ি উঠে চলে এলি, ডাকতেও পারলাম না।'

'কি হয়েছে?' মেরিচাচীর ভঙ্গি দেখেই বুঝে ফেলেছে কিশোর, কিছু একটা ঘটেছে।

'আয়, দেখাচ্ছি।'

কথা শুনে অন্যপাশ থেকে বেরিয়ে এল মিস কোয়াড্রুপল।

একটা টর্চ তুলে নিলেন মেরিচাচী। ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে এলেন পাশের আঙিনায়। আলো ফেললেন বাড়ির ছাতের দিকে। নিজের অজান্তেই 'খাইছে' শব্দটা বেরিয়ে এল মুসার মুখ থেকে। তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। নাইলনের একটা দড়ি নেমে এসেছে ওপর থেকে। ওপরের প্রান্ত চিমনির মাথায় বাঁধা। দড়িটা নেমে এসেছে চিলেকোঠার জানালার পাশ দিয়ে। নিচের প্রান্ত ঝুলছে মাটি থেকে ফুটখানেক ওপরে।

'ইজি আর আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম,' মেরিচাচী জানালেন। 'ফিরে এসে দেখি ওটা ওখানে।'

'ওটা বেয়ে কেউ ওপরে উঠেছে,' রবিন বলল।

মুহূর্তে সচল হয়ে উঠল তিনজনে। হুড়মুড় করে রান্নাঘরে ঢুকে, হল পেরিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল চিলেকোঠায়। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল কিশোর। প্রথমেই চোখ গেল জানালার নিচে। রেডিওটা নেই।

ওদের চালাকি নিশ্চয় ধরে ফেলেছে শত্রুপক্ষ। সেজন্যেই নিয়ে গেছে রেডিওটা।

দ্রুত জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। মুখ বের করে দিয়ে গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে দেখল, মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়েছে দড়িটা। হাত বাড়ালেই ধরতে পারে।

'বাঁদর-মানব!' কিশোরও এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে।

ঝুলন্ত দড়িটা টেনে দেখল কিশোর। খুব শক্তভাবে আটকানো।

রবিন বলল, 'ফাঁস ছোঁড়ায়ও ওস্তাদ লোকটা। নিচ থেকে ছুঁড়ে কেমন সুন্দর ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে চিমনির মাথায়। কিন্তু ফেলে গেল কেন?'

কেন ফেলে গেল, অনুমান করল কিশোর। ও দড়িটা খুলে নেয়ার আগেই মেরিচাচী আর মিস কোয়াড্রুপল চলে এসেছিল। তাড়াহুড়ো করে তখন বাড়ির অন্যপাশের ড্রেনপাইপ বেয়ে নেমে গিয়েছিল সে।

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন দু'তিন বার চিমটি কাটল কিশোর। কি ভাবছে, জানতে চাইল তার দুই সহকারী।

'একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়,' নিচুস্বরে বলল কিশোর। বুদ্ধিটা কি, জানাল দুজনকে।

'ঠিক!' উৎফুল্ল হয়ে উঠল রবিন। 'আমার মনে হয় কাজ হবে।'

'তাহলে করে দেখা যাক,' মুসা বলল।

কিশোর বলল, 'করব।'

এগারো

অ্যাটাকান যাওয়ার কথা মেরিচাচীকে জানাল কিশোর। চুপচাপ শুনলেন তিনি। বিপদ আছে বললেন, তবে রহস্যের সমাধান করার জন্যে এ ছাড়া আর কোন উপায়ও বাতলে দিতে পারলেন না।

'তোর চাচাকে দেখতে গিয়েছিলাম,' মেরিচাচী জানালেন। 'আগের চেয়ে উন্নতি হয়েছে, কিন্তু এখনও ঘোরের মধ্যেই রয়েছে। খুব অত্যাচার করেছে তার ওপর,' রাগ দানা বাঁধল মেরিচাচীর কণ্ঠে। 'তার অসমাপ্ত কাজটা তোদের শেষ করা উচিত।'

কিশোর তো এটাই চায়। বোরিসের বাসায় ফোন করল সে। ওদের পরিকল্পনার কথা জানাল। বোরিসেরও পছন্দ হলো ওদের প্ল্যান। মনেপ্রাণে চাইছে সে, ওরা সফল হোক।

'নিশ্চিন্তে চলে যাও,' বোরিস বলল, 'আমি এদিকটা সামলাব। ইয়ার্ডের ওপর তো রাখবই, তোমার চাচার ওপরও নজর রাখব।'

রবিন আর মুসাকে তখনই গিয়ে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়ে আসতে বলে, ঘরে এসে নিজের সুটকেস গোছানো শুরু করল কিশোর। পোশাকের লেবেল কেটে ফেলে দিতে লাগল। এমন কোন চিহ্নই রাখল না, যাতে ওর ছদ্মবেশ ফাঁস হয়ে যায়, চিনে ফেলে ওকে শত্রুরা।

দূরবীনটা ভরছে, এ সময় ঘরে ঢুকলেন মেরিচাচী।

'ভারী সোয়েটারটা নিয়েছিস?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'অ্যাটাকানে এখন নিশ্চয় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।'

'কি আর এমন ঠাণ্ডা হবে,' কিশোর বলল। 'এখান থেকে কত আর দূরে। তা ছাড়া এখন গরমকাল। এমন করে বলছ তুমি, চাচী, যেন দক্ষিণ মেরুতে যাচ্ছি।'

'ওসব বুঝিটুঝি না। নিয়ে যা। বনের মধ্যে রাতের বেলা কনকনে ঠাণ্ডা পড়ে।'

'ঠিক আছে, বাবা, নিচ্ছি,' তর্ক করার চেয়ে মেনে নেয়াটা ভাল মনে করল কিশোর। আলমারি খুলে ভারী একটা সোয়েটার বের করে ভাঁজ করতে লাগল।

সুটকেস গোছানো হয়ে গেলে রবিন আর মুসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল সে। বেশিক্ষণ লাগল না। ওরাও দুজনে দুটো সুটকেস নিয়ে হাজির হয়ে গেল।

মেরিচাচীকে বলল কিশোর, 'চাচী, তুমি আমাদের বাস ডিপোতে পৌঁছে দিয়ে এসো।'

ট্যাক্সি নিয়ে চলে যেতে পারে ওরা। তাঁকে পৌঁছে দেয়ার কথা বলাতে অবাকই হলেন মেরিচাচী। তবে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। হয়তো ট্যাক্সি ডাকার ঝামেলায় যেতে চাইছে না কিশোর।

মিস কোয়াড্রুপলকে সাবধানে থাকতে বলে ছেলেদের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। ঝরঝরে পিকআপটায় চড়ল সবাই। কয়েক মিনিট পর পুরানো ইঞ্জিনের বিকট গর্জনে নীরব রাতের শান্তি নষ্ট করে মেইন রোড ধরে ছুটে চলল গাড়িটা বাস ডিপোর দিকে।

ডিপোতে পৌঁছে দেখা গেল, গেটের সামান্য ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাটাকানের বাস। যাত্রার জন্যে প্রস্তুত।

কিশোর বলল। 'চাচী, তুমি চলে যাও। আমাদের জন্যে অহেতুক দুশ্চিন্তা কোরো না।'

কয়েক মিনিট পর ডিজেল ইঞ্জিনের ভারী ঝিরঝির শব্দ তুলে গেট দিয়ে বেরিয়ে এল বাস। মেইন রোড ধরে রওনা হলো গন্তব্যের দিকে। চার ব্লক যেতে না যেতেই ড্রাইভারের কাঁধে হাত রাখল কিশোর, 'ভাই, আমাদের এখানে নামিয়ে দিন।'

'সে-কি? মাত্র তো রওনা হলাম,' ড্রাইভার অবাক। 'এখনও বহু দেরি। এটা লোক্যাল বাস না।'

'জানি, ভাই। কিন্তু একটা ভুল হয়ে গেছে আমাদের। নেমে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। টিকিটের পয়সা ফেরত চাইব না।'

'ঠিক আছে, গেটের কাছে যাও।'

পরের মোড়ে ব্রেক কষল ড্রাইভার। টপাটপ লাফিয়ে নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা। ইয়ার্ডে ফিরে চলল। রাতের নির্জন ফুটপাথ ধরে প্রায় দৌড়ে চলল ওরা। তিন গোয়েন্দার অনেকগুলো গুপ্তপথের একটা দিয়ে ঢুকে পড়ল ইয়ার্ডের ভেতরে। সুটকেসগুলো গ্যারেজের পেছনে রেখে ছায়ার মত নিঃশব্দে সরে এসে ঘাপটি মেরে বসে পড়ল রডোডেনড্রনের ঝোপের আড়ালে। টানটান উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। চিমনিটার দিকে নজর।

ফিসফিস করে বলল মুসা, 'আসবে তো?'

'কথা বোলো না,' কিশোর বলল। 'আসবে।'

কিশোরের ধারণা, লোকটা ভেবেছে তার দড়ি কারও চোখে পড়েনি। দিনের বেলায়ও যাতে না পড়ে, সে-জন্যে রাতেই কোন এক সময় এসে এটা খুলে নিয়ে যেতে চাইবে। নিজের গতিবিধির কোন প্রমাণ রাখতে চাইবে না। তিন গোয়েন্দাকে শহর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে থাকলে অসতর্ক হয়ে পড়বে। দড়িটা নিতে এসে তেমন সাবধান থাকবে না।

আধঘণ্টা পেরোল। পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তারাখচিত আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাল রবিন। কালো মখমলের মত আকাশে বেশ খানিকটা সরে গেছে কালপুরুষ। একভাবে বসে থেকে থেকে পেশীতে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে তার।

'কিশোর, আমার মনে হয় না কেউ আসবে…'

মুসার কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে মাঝপথেই থেমে গেল ওর কথা। বাড়ির একপাশ ধরে একটা ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। এমনিতেই ছোট শরীর, তার ওপর শিম্পাঞ্জির মত সামনে গুড়ি মেরে হাঁটছে বলে আরও ছোট দেখাচ্ছে। মুসার কানে মুখ রেখে বলল রবিন, 'বাঁদর-মানব!'

'শশশ্!' কথা বলতে নিষেধ করল কিশোর।

দাঁড়িয়ে গেল মূর্তিটা। কান পেতে রইল। আবার এগোল। দড়িটার দিকে।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে তিন গোয়েন্দা। এখন তাড়া করলে পালিয়ে যেতে পারে। সুযোগের অপেক্ষায় রইল ওরা। ধরতেই হবে ওকে আজ, কোনমতে হাতছাড়া করা চলবে না।

আবার দাঁড়াল ছায়ামূর্তি। কান পাতল। বোঝার চেষ্টা করছে, বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল। মাত্র পাঁচ ফুট লম্বা। বিড়ালের মত নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। দেয়ালে পা ঠেকিয়ে প্রায় হেঁটে হেঁটে উঠে যেতে শুরু করল ওপরে।

কনুইয়ের গুঁতোয় দুই পাশে বসা দুই সহকারীকে কাজ শুরু করার ইঙ্গিত দিল কিশোর। আস্তে করে উঠে রান্নাঘরের পেছনের দরজার কাছে চলে গেল রবিন। ছিটকানিটা খুলে রেখে গিয়েছিল কিশোর। দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকে পড়ল রবিন। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উঠে চলল ওপরে।

কিশোর ততক্ষণে মুসাকে নিয়ে চলে এসেছে দড়িটার কাছে। তাকে উঠে যেতে বলল।

দড়িতে টান পড়তে নিচে তাকাল লোকটা। পরক্ষণে ওঠার গতি বেড়ে গেল তার। তরতর করে উঠে যেতে শুরু করল। ওপর থেকে টর্চের আলো পড়ল তার গায়ে। রবিন রয়েছে ওখানে। বুঝে গেল লোকটা, আটকা পড়ে গেছে। হাত ছেড়ে দিয়ে যে লাফিয়ে নামবে, তারও উপায় নেই। পড়তে গেলে মুসার গায়ে ধাক্কা খাবে। মাটিতে তো রয়েছেই আরও একজন।

মরিয়া হয়ে দোতলার একটা জানালা সই করে লাফ দিল সে। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল চৌকাঠ। এক দোলা দিয়ে প্রায় ডিগবাজি খেয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। জানালা দিয়ে যে ঢুকে যেতে পারে মনে ছিল না কিশোরের। দৌড় দিল ঘরের দিকে। কয়েক সেকেন্ড পরেই চিৎকার-চেঁচামেচি আর ফটাস ফটাস শব্দ কানে আসতে লাগল। ছুটে ঘরে ঢুকে কিশোর দেখল, দুটো ছাতা দিয়ে সমানে লোকটাকে পিটিয়ে চলেছেন মেরিচাচী, আর মিস কোয়াড্রুপল। সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে আছে লোকটা। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

শয়তান কোথাকার!

বাঁদর!

আমার গায়ের ওপর এসে পড়ে!

সাহস কত!

বাড়ি মারায় যেমন কেউ কারও চেয়ে কম নয়, গালাগালিতেও ওস্তাদ। দুটো কাজ পাল্লা দিয়ে করে চলেছেন মনিব-কর্মচারী।

বেচারা বাঁদর-মানবের জন্যে মায়াই লাগল ওই মুহূর্তে কিশোরের। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকল না। লোকটা সোজা হওয়ার আগেই গিয়ে তার গায়ের ওপর পড়ল। ওপর থেকে নেমে আসছে তখন রবিন। কিশোর যে দরজা দিয়ে ঢুকেছে, সেটা দিয়ে ঢুকছে মুসা। চেপে ধরল এসে লোকটাকে।

ছোটখাট হলে কি হবে। লোকটার গায়ে জোর কম না। তা ছাড়া অসম্ভব ক্ষিপ্র। ছাড়া পাওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বুনো জানোয়ারের মত লড়াই করছে। হাত-পাগুলো কিলবিল করছে সাপের মত। কোনমতেই চেপে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

কিন্তু এতজনের বিরুদ্ধে পারার কথা নয়। পারলও না। তবে বেশ কিছু রাম-খামচি আর আঁচড় সহ্য করতে হলো তিন গোয়েন্দাকে।

মেরিচাচী গেলেন পুলিশকে ফোন করতে। সাইরেন বাজাতে বাজাতে এসে হাজির হলো ওরা। গটমট করে ঘরে ঢুকল একজন অফিসার। হাতকড়া পরিয়ে দিল লোকটার হাতে।

ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারও এসেছেন।

বাঁদর-মানবকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'একে চেনেন, ক্যাপ্টেন?'

জ্বলন্ত চোখে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

ভুরু কুঁচকে তাকে ভালমত দেখলেন ক্যাপ্টেন। মাথা দোলালেন। 'হুঁ, চিনতে পারছি। পুলিশের ওয়ান্টেড লিস্টে আছে। পুরানো পাপী। ওর নাম ড্যান ক্লকাস।'

লস অ্যাঞ্জেলেসে ওদের সঙ্গে কি আচরণ করেছে ও, ক্যাপ্টেনকে জানাল কিশোর। 'আমার ধারণা,' বলল সে, 'ব্রিজ স্যাবটাজের সঙ্গে এ ব্যাটাও কোনভাবে জড়িত।'

বন্দির দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'ড্যান, কে তোমাকে এ কাজ করতে বলেছে?'

ভ্রূকুটি করল ড্যান। জবাব দিল না। এরপরের কোন প্রশ্নেরই জবাব দিল না সে।

'থানায় নিয়ে যাও,' হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেন। 'হাজতে ভরে রাখোগে। দেখা যাবে কদ্দিন মুখ বন্ধ রাখতে পারে। জবাব না দিলে জামিন পাওয়া কঠিন করে তুলব আমি ওর জন্যে।'

বন্দিকে নিয়ে চলে গেল পুলিশ। চিমনি থেকে গিয়ে দড়িটা খুলে আনল রবিন। 'ভাল জিনিস। আমাদের কাজে লাগতে পারে।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'কি বলো?'

'রেখে দাও।'

গ্যারেজের কাছ থেকে সুটকেসগুলো নিয়ে এল ওরা। দড়িটা গুটিয়ে বান্ডিল করে নিজের সুটকেসে ভরে রাখল রবিন।

বারো

দ্বিতীয়বারের মত সেদিন মেরিচাচী আর মিস কোয়াড্রুপলকে বিদায় জানিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

হাসল রবিন। 'এবার কি সত্যি সত্যি অ্যাটাকানে যাচ্ছি আমরা?'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে,' জবাব দিল কিশোর।

ট্যাক্সি নিয়ে বাস টার্মিনালে চলে এল ওরা। একটা বাস ছাড়ার মুখে। তাতে টিকেট আছে দুটো। মুসা বলল, 'তোমরা দুজন চলে যাও। আমি পরের বাসে আসছি।'

রবিন আর কিশোর উঠে বস তাতে। ছেড়ে দিল বাস। এখনও অন্ধকার। বাসের ভেতরের আলো নিভিয়ে দিল ড্রাইভার। সীটে এলিয়ে পড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা।

সেদিন ভোর রাত থেকে সকাল পর্যন্ত একে একে রকি বীচ ছাড়ল মুসা, বিড, টম আর রিচি। একেকজন একেক সময় যাত্রা করেছে, তাই দিনের বিভিন্ন সময়ে গন্তব্যে পৌঁছল ওরা। বিশ্বস্ত কর্মচারী এরিক বোম্যানকে ওদের যাওয়ার খবর জানিয়ে রেখেছেন মিস্টার ওয়াকার। সুতরাং কাজ পেতে কোন অসুবিধে হলো না ছেলেদের। উইকএন্ড বলে সেদিন আর কাজ করা লাগল না। শুরু করতে করতে সোমবার।

সোমবারটা খুব ব্যস্ত একটা দিন কাটল চারজনের—মুসা, বিড, টম আর রিচির। কিশোর আর রবিনের দেখা নেই। মঙ্গলবারে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল চারজনে।

নতুন ঢেলে দেয়া কংক্রীটের স্তরের গোড়ায় বেলচা দিয়ে মাটি ফেলতে ফেলতে উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছে মুসা, 'কোথায় গেল কিশোর আর রবিন?'

যেখানে কাজ চলছে, সেখানটায় ঘন বন। বিড, টম আর রিচিকে শ্রমিকদের ভিড়ে কাজ করতে দেখল মুসা। প্রচণ্ড গরম। শার্ট খুলে ফেলেছে বিড। শুধু প্যান্ট পরে কাজ করছে। রাস্তার ধারে একটা ট্রাক্টর মেরামত করছে। টম চালাচ্ছে একটা কংক্রীট মিক্সার। ব্রিজের একটা স্তম্ভে ক্লিপবোর্ড রেখে লেখায় ব্যস্ত রিচি।

কানের কাছে ধমকে উঠল একটা কর্কশ কণ্ঠ, 'অ্যাই, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? কাজ করতে কষ্ট লাগে?'

চমকে ফিরে তাকাল মুসা। বালিরঙ চুল, কঠিন চোখ একটা লোককে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। আগে কখনও দেখেনি। অনুমান করল, এই লোকই কার্ল হ্যারিস। নিশ্চয় আজই ফিরেছে। আগে ফিরলে দেখত।

'বহুত নতুন লোক নিয়ে ফেলেছে দেখছি এরিক,' লোকটা বলল। 'কবে এলে?'

ঘটনার আকস্মিকতায় কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে মুসা। 'ইয়ে···এই তো···শনিবার দুপুরে···মিস্টার বোম্যান চাকরি দিয়েছেন।'

'নাম কি?'

ঢোক গিলল। 'ডেভিড।'

'পুরো নাম!'

'ডেভিড কারদার!'

'হুঁ। ঠিকমত কাজ করো। ফাঁকি দিলে ঘাড় ধরে বের করে দেব। কি, বুঝলে?'

মুসাকে জবাব দেয়ার সুযোগ না দিয়ে গটমট করে চলে গেল হ্যারিস। আবার বেলচা চালাতে শুরু করল মুসা। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখছে চারপাশের অচেনা অদ্ভুত পরিবেশ। রাস্তার ধার থেকে শুরু হয়েছে পাইন বন। তার মধ্যে রাখা পাঁচটা ট্রেলার। চারটে ব্যবহার হয় বাংক হাউস হিসেবে। পঞ্চমটা অপেক্ষাকৃত বড়। ওটা রান্নাঘর।

সেদিকে তাকাতেই পেটের মধ্যে খামচি দিতে শুরু করল যেন ক্ষুধার আগুন। যে হারে পরিশ্রম করছে, তাতে স্বাভাবিকের চেয়ে চারগুণ বেশি খাবার দরকার, মনে হলো তার। টিফিনের সময় কি হলো? সবচেয়ে কাছের শহরটাও এখান থেকে বেশ দূরে। কাছে হলে একছুটে গিয়ে এক ঠোঙা বার্গার কিনে নিয়ে আসত।

চওড়া, তীব্রস্রোতা নদীটার ওপর ঘুরে বেড়াতে লাগল তার চঞ্চল দৃষ্টি, যার ওপর তৈরি হচ্ছে ব্রিজটা। একপাশ থেকে অর্ধেক এগিয়ে গেছে ব্রিজ। দুই-দুইবার ধসে পড়েছে। তৃতীয়বারের মত খাড়া করতে ব্যস্ত শ্রমিকরা।

অবচেতনভাবেই আবার কাজে বিরতি দিয়ে ফেলল মুসা। কিশোর আর রবিনের জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

'হাই, কারদার!' সিমেন্ট মিক্সার থেকে লাফ দিয়ে নেমে মুসার দিকে এগিয়ে আসছে একজন চৌকোনা চেহারার লোক।

'কাকে ডাকছেন?'

'তোমাকে, তোমাকে। তোমার নাম কারদার না?'

'হ্যাঁ, মিস্টার বোম্যান,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল মুসা।

নতুন যারা আসে এখানে তারাও শীঘ্রি জেনে যায় ফোরম্যান এরিক বোম্যানের বদমেজাজের কথা। নতুনদের ওপর মাতব্বরিও তার বেশি। কার্ল হ্যারিসকে ডিঙিয়ে হলেও কর্তৃত্ব দেখানোর লোভ সে ছাড়তে পারে না।

'স্ট্যাচু অভ লিবার্টির মত মূর্তি সেজে থাকার জন্যে তোমাকে বেতন দেয়া হচ্ছে না। কাজ করো, জলদি!'

বিব্রত হয়ে আবার তুলে রাখা আলগা মাটিতে বেলচার খোঁচা মারল মুসা।

'হাত চালাও,' মাথা ঝাঁকাল বোম্যান, 'জ্যান্ত মানুষের মত আচরণ করো।'

ব্যথা হয়ে যাওয়া কোমর ঠিক করার জন্যে কয়েক মিনিট পর সোজা হলো মুসা। খানিক দূরে হাফপ্যান্ট পরা দুটো ছেলেকে দেখল বড় একটা গাছের কাণ্ড কাঁধে তুলে নিতে। আনন্দে বুকের মধ্যে রক্ত ছলকে উঠল তার। ওই তো কিশোর আর রবিন!

ওর দিকে চোখ পড়তেই সামান্য মাথা হেলাল কিশোর। চিনতে পারার ইঙ্গিত। কাজ বন্ধ করল না। দুজনে মিলে কাণ্ডটা বয়ে নিয়ে চলল ব্রিজের দিকে।

শিস দিতে আরম্ভ করল মুসা। তার বেলচা থেকে এখন বেদম গতিতে মাটি উড়ে গিয়ে পড়ছে কংক্রীটের ঢালাইয়ের গায়ে। খুশিতে অস্থির। ভীষণ একটা দুশ্চিন্তা গেছে।

'বাহ্, লিবার্টি, এই তো কাজ শিখে গেছ!' চিৎকার করে বলল বোম্যান।

তীক্ষ্ণস্বরে সাইরেন বেজে উঠল। দুপুরের খাওয়ার সময় হয়েছে। থমকে গেল যন্ত্রপাতির শব্দ, চাকাওয়ালা বড় বড় মেশিনগুলো যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল যার যার জায়গায়। রান্নাঘরের দিকে এগোল শ্রমিকের মিছিল। ট্রেলারে ঢুকল। ভারী তক্তা কেটে পায়া দিয়ে কোনমতে দাঁড় করানো লম্বা টেবিলে খাওয়ার ব্যবস্থা। খেতে খেতে কথা বলতে লাগল শ্রমিকরা। হাসাহাসিও চলল।

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে একই জায়গায় বসল ছয় গোয়েন্দা। কিন্তু কথা শুরু করল এমন ভঙ্গিতে, যেন সবে পরিচিত হচ্ছে। রবিনের কাছ থেকে সামান্য দূরে বসেছে লম্বা এক তরুণ। হাতের থাবা বিশাল, গলাটা অতিরিক্ত লম্বা। ঠেলে বেরোনো কণ্ঠমণি।

'আমি রিবান,' ছেলেটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রবিন। 'রিবান হিউক্লক।'

লাজুক ভঙ্গিতে ওর হাত ধরল ছেলেটা। মাথার বাদামী চুলের বোঝা নেমে এসেছে চোখের ওপর। চুলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে জবাব দিল, 'আমি নরম্যান হেগ।'

'এদিকেই বাড়ি নাকি?'

'হুঁ!'

আলোচনায় অংশ নিতে আগ্রহী নয় ছেলেটা। দুটো একটা কথা বলে জবাব সারছে, লক্ষ করল রবিন। অনেকটা দায়সারা গোছের। ছেলেদের টেবিলেই বসেছে ফোরম্যান বোম্যান। হুমকির পর হুমকি দিয়ে চলল।

'শোনো, কুকার,' বিডকে বলল ফোরম্যান, 'জলদি জলদি ট্রাক্টরটা মেরামত করে যদি সারতে না পারো, আজ রাতেই প্রোজেক্টের সীমানা পার করিয়ে দিয়ে আসা হবে তোমাকে।'

'করে ফেলব, স্যার,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিল বিড।

'স্যার স্যার করে তোয়াজ করার দরকার নেই আমাকে! আমি চাই কাজ। যা করতে বেতন দেয়া হচ্ছে তোমাকে, সেটা করছ দেখলেই খুশি হব। তেল দিয়ে সুবিধে করতে পারবে না।'

'দেব না, মিস্টার বোম্যান!'

'আর হিউক্লক, তোমাকে বলি, কাজকর্ম তো কিচ্ছু করো না,' রবিনকে ধরল এবার বোম্যান। 'খালি কথা বলো, দেখেছি আমি। কি অত কথা তোমার? খবরের কাগজের রিপোর্টার ছিলে নাকি?'

খাবার চিবাতে চিবাতে কোনমতে স্বাভাবিক জবাব দেয়ার চেষ্টা করল রবিন, 'সরি।'

রুটির তৃতীয় টুকরোটা মুহূর্তে সাবাড় করে চতুর্থটার জন্যে হাত বাড়াল মুসা। বোম্যানকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মাঝপথে থামিয়ে দিল হাতটা।

মন্তব্য করতে ছাড়ল না বোম্যান। 'বডি বিল্ডার দরকার নেই আমাদের।

আমাদের দরকার কাজের লোক। অত না খেয়েও কাজ করা যায়।'

কি আর করে বেচারা মুসা। লজ্জা পেয়ে আধপেটা খেয়েই উঠে পড়ল। ফোরম্যানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাক্রমে তার কনুইয়ে ধাক্কা লেগে গেল। কফি খাচ্ছিল ফোরম্যান। কাপের কফি ছলকে পড়ল কাপড়ে। আর যায় কোথায়। 'বলদ কোথাকার!' লাফিয়ে উঠে মুসার কলার চেপে ধরল ফোরম্যান। অন্য হাতটা মুঠোবদ্ধ হয়ে ঘুসি মারার ভঙ্গিতে দ্রুত এগিয়ে আসতে শুরু করল।

চোখের পলকে সাপের মত ছোবল হানল যেন হেগের বিশাল থাবা। সাঁড়াশি-কঠিন আঙুল চেপে বসে গেল ফোরম্যানের কব্জিতে। একচুল নড়াতে পারল না আর বোম্যান।

'আমি হলে ঘুসিটা ফিরিয়ে নিতাম, মিস্টার বোম্যান!' মোলায়েম স্বরে বলল হেগ, রাগের লেশমাত্র প্রকাশ পেল না কণ্ঠস্বরে।

তেরো

হেগের কারণে মুসার চোয়ালটা অল্পের জন্যে বেঁচে গেল। তার দিক থেকে হেগের দিকে ঘুরে গেল বোম্যান। ঠিক সেই মুহূর্তে ছুটে এসে পাহাড়ের মত দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল কার্ল হ্যারিস।

হেগের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে বলল, 'তোমার এই বেয়াদবির কারণ? জানো, এখানকার সবাইকে কন্ট্রোল করার দায়িত্ব বোম্যানের?'

বোম্যানের হাতটা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল হেগ, 'সরি, মিস্টার হ্যারিস।'

ফোরম্যানের এই খেপে যাওয়া স্তব্ধ করে দিয়েছে মুসাকে। গোয়েন্দাদের অবাক করে দিয়ে আচমকা মুসার দিকে ঘুরে দাঁড়াল বোম্যান। 'আমি দুঃখিত, কারদার। এ ভাবে মেজাজ খারাপ করা উচিত হয়নি আমার। সবার ওপর এত বেশি খবরদারি করা লাগে, মেজাজ খিঁচড়ে যায়। কেউ কাজ করতে চায় না।'

'আমিও দুঃখিত, মিস্টার বোম্যান,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

'আমাদের দুর্ভাগ্য চলতে থাকলে কি ঘটবে জানো?' উপস্থিত শ্রমিকদের দিকে অনেকটা অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকাল বোম্যান। 'ওয়াকার কোম্পানি প্রতিদিন কয়েক হাজার ডলার করে গচ্চা দিতে থাকবে। এত লোকসান দিলে লালবাতি জ্বলবে কোম্পানির। আমাদেরও চাকরি শেষ।'

বিড বলল, 'মিস্টার ওয়াকারের ব্যবসা শেষ করে দেয়ার জন্যেই নিশ্চয় এ সব অঘটন ঘটানো হচ্ছে, তাই না?'

'মনে হয়,' বোম্যান বলল। 'মিস্টার ওয়াকারকে ভাল মানুষ পেয়ে এই কাণ্ড করছে।'

'হয়েছে, কথা অনেক হয়েছে,' অধৈর্য হয়ে উঠল হ্যারিস। 'কাজে যাও সবাই।'

ভারী বুটের শব্দ তুলে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল শ্রমিকরা। হেগকে ধন্যবাদ দিল মুসা, তাকে সাহায্য করার জন্যে। দ্রুত একবার মাথা ঝাঁকিয়ে

অন্যদিকে সরে গেল হেগ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার সরব হয়ে উঠল প্রোজেক্ট এলাকা। একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আলোচনা করার মোটামুটি সুযোগ পেয়ে গেল কিশোর আর রবিন।

'কে যে শত্রু আর কে মিত্র বোঝা বড় কঠিন,' রবিন বলল। 'তবে এত তাড়াতাড়ি কাউকে সন্দেহ করাও সম্ভব না।'

একটা ব্যাপারে একমত হলো দুজনে, ভয়ানক বদমেজাজী হলেও বোম্যান লোকটা খারাপ না।

'মিস্টার ওয়াকারের জন্যে সত্যি সত্যি ভাবে সে,' কিশোর বলল।

'হ্যারিসও বদমেজাজী,' রবিন বলল। 'তাকেও তো খারাপ মনে হয় না। তাহলে কারা ঘটাচ্ছে এখানে অঘটনগুলো? কাকে শত্রু মনে করব?'

বাকি দিনটা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলেও কথা তেমন বলতে পারল না ওরা।

'নতুন কিছু জানলে?' মুসার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না।'

একই প্রশ্ন করল সে বিড, টম আর রিচির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়। একই জবাব পেল। না!

সান্ধ্য-খাবারের শেষে রবিনকে একান্তে ডেকে নিল কিশোর। 'আজ রাতে খানিকটা খোঁজ-খবর করব ভাবছি।'

শ্রমিকদের মাঝখানে ঘুরঘুর শুরু করল দুজনে। বাংক ট্রেলারের সামনে বসে অলস গল্প করছে ওরা। কেউ কেউ সিগারেট টানছে। একটা গাছের গুঁড়িতে বসল কিশোর। কাছেই ঘাসের ওপর কনুই রেখে আধশোয়া হলো রবিন। অনির্দিষ্ট ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করতে করতে যেন ওদের কাছাকাছি হলো বিড।

'হাই,' সবাইকে শুনিয়ে জোরে জোরেই বলল সে। 'এখানে কাজ করতে কেমন লাগছে?' আরও কাছে এসে কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আসতে এত দেরি হলো কেন তোমাদের?'

যেন অলস আলোচনা করছে, মুখের ভাবটা এমন করে রাখল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'ওয়াইল্ড টাউনে খানিকটা তদন্ত করে এলাম। এরিক বোম্যানের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি। ফেলিক্স নামেও কেউ নেই শ্রমিকদের মধ্যে।'

কাজে লাগতে পারে ভেবে কি কি যন্ত্রপাতি এনেছে, জানাল কিশোর। 'দূরবীন এনেছি। এক বান্ডিল দড়ি। আর একটা মিনি শর্ট-ওয়েভ রেডিও সেট। আমরা যে ট্রেলারে ঘুমাব, তার নিচে চাকার এক্সেলের ফাঁকে লুকিয়ে রেখেছি।'

'ভাল,' হাসি ফুটল বিডের মুখে। 'তোমরা তো দেখা যাচ্ছে অনেক কিছুই এনেছ। আমরা এসেছি শুধু শরীরের পেশী সম্বল করে।'

অন্ধকার হয়ে আসছে। পাহাড়ের দিক থেকে বয়ে এল ঠাণ্ডা বাতাস। শ্রান্ত শ্রমিকেরা এক এক করে উঠে চলে গেল। যার যার ট্রেলারে গিয়ে ঢুকল।

কিশোর আর রবিন একই ট্রেলারে থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। একটার ওপর আরেকটা বাংক। কিশোরের ওপরে, রবিনে নিচে। মাঝরাতের দিকে আস্তে করে বাংকে উঠে বসল দুই গোয়েন্দা। সাবধান রইল যাতে শব্দ না হয়। অন্য বাংকে

শোয়া লোকগুলোর ঘুম ভাঙানো চলবে না। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল। রওনা হলো পাশের ট্রেলারটার দিকে, যেটাতে হ্যারিস আর বোম্যান থাকে। কথা শোনা গেল ভেতর থেকে।

কিশোরের কাঁধে চড়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিল রবিন। বোম্যান ঘুমাচ্ছে। সাধুদের মত আসন-পিঁড়ি হয়ে বসেছে হ্যারিস। তাস খেলছে দুজন শ্রমিকের সঙ্গে। ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে হেগ।

কি জানি কেন জানালার দিকে মুখ ঘোরাল একজন শ্রমিক। চট করে মাথা নুইয়ে ফেলল রবিন। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। ট্রেলারের ধাতব বডিতে কান লাগিয়ে ভেতরের কথা শোনার চেষ্টা করল দুজনে। তাস খেলোয়াড়দের ভাষার মধ্যে বিচিত্র কিছু অশুদ্ধ শব্দ ঢুকে যাচ্ছে। ইংরেজিতেই কথা বলছে লোকগুলো, কিন্তু এ রকম শব্দ কখনও শোনেনি দুই গোয়েন্দা। যেমন: পেয়ার অভ বিনস, অয়েলার, হাফ স্টাম্প, ক্লবি জয়েন্ট, লঙ নিট, বাথ ইন দা ক্যানাল, বাইস, ব্যারন।

'কি মানে এ সব শব্দের!' ফিসফিস করে বলল রবিন।

উঠে দাঁড়ানোর শব্দ হলো। হ্যারিসের গলা শোনা গেল, 'হেগ, কাল তোমাকে লং নিট হতে হবে।'

'খেলা শেষ। উঠে পড়েছে ওরা,' রবিন বলল।

দ্রুত ওখান থেকে সরে এল দুজনে। নিজেদের ট্রেলারে উঠে পড়ল।

পরদিন সকালে কাজে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে দুজনে, ফিসফিস করে রবিনকে বলল কিশোর, 'রবিন, শব্দগুলো আমার ধারণা এক ধরনের স্ল্যাং, জেলখানার কয়েদীরা ব্যবহার করে।'

'তাই নাকি!' চমকে গেল রবিন। 'তারমানে এক দঙ্গল জেলখাটা কয়েদীর মধ্যে এসে পড়েছি। এ তো ভীমরুলের চাক!'

কাজ করতে বেরোল ওরা। বোম্যান ওদের তক্তা বওয়ার কাজ দিল। বড় বড় তক্তা বয়ে নিয়ে যেতে হবে ছুতার মিস্ত্রিদের কাছে। ওই কাঠ দিয়ে ফাঁপা স্তম্ভ তৈরি করবে ওরা। তার মধ্যে ঢালাইয়ের মশলা ঢেলে দিয়ে আসল স্তম্ভগুলো বানানো হবে। কাজের জায়গায় চার বন্ধুকেই দেখতে পেল ওরা। হেগকে চোখে পড়ল না কোথাও।

সকাল শেষ হয়ে দুপুরের দিকে গড়াচ্ছে। কফি ব্রেক। সামান্য সময়ের জন্যে কফি খাওয়ার বিরতি। কাজ থামিয়ে কফি খেতে লাগল শ্রমিকেরা। এ সময়টার অপেক্ষাই করছিল কিশোর। হামাগুড়ি দিয়ে বাংক ট্রেলারের নিচে ঢুকে গেল। লুকানো জায়গা থেকে বের করে আনল খুদে রেডিওটা। শার্টের নিচে করে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে রবিনের হাতে গুঁজে দিল। 'ব্রিজের নিচে চলে যাও। পিলারের আড়ালে লুকিয়ে, বোরিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে শব্দগুলোর মানে জেনে এসো। জেলখানায় গার্ডের কাজ করেছে সে এক সময়। বলতে পারবে।'

ব্রিজের নিচে চলে গেল রবিন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল কিশোর।

বোরিসের সঙ্গে যোগাযোগ করল রবিন। শব্দগুলোর কথা বলে বলল, 'কিশোরের ধারণা, এ সব শব্দ জেলখানায় কয়েদীরা ব্যবহার করে।'

বোরিস বলল, 'ঠিকই অনুমান করেছে সে। কয়েদীরাই ব্যবহার করে ওসব শব্দ।'

শব্দগুলোর মানে বলতে লাগল বোরিস, মুখস্থ করে নিতে লাগল রবিন:

পেয়ার অভ বিনস – দূরবীন
অয়েলার – তোষামোদকারী
হাফ স্ট্যাম্প – ভবঘুরে
ক্লবি জয়েন্ট – জুয়ার আড্ডা
লং নিট – নজর রাখার লোক
বাথ ইন দা ক্যানাল – পানিতে ডুবে মৃত্যু
বাইস – দুই বছরের সাজা
ব্যারন – সুবিধাভোগী কয়েদী

কথা শেষ হলে বোরিসকে ধন্যবাদ দিয়ে সুইচ অফ করে দিল রবিন।

মনে পড়ল, গতরাতে হেগকে 'লং নিট' হতে হবে বলেছিল হ্যারিস। তারমানে কোথাও পাহারা দিতে পাঠানো হয়েছে তাকে। কারও ওপর নজর রাখতে। সে-জন্যেই বোধহয় আজ শ্রমিকদের মাঝে দেখা যাচ্ছে না।

রেডিওটা শার্টের নিচে লুকিয়ে ফেলে বেরোতে যাবে, এই সময় এমন কিছু চোখে পড়ল, থমকে দাঁড়াল সে। একটা সিমেন্টের বস্তার আড়ালে সাবধানে লুকানো রয়েছে তিনটে ডিনামাইটের স্টিক। বিস্ফোরণ ঘটানোর যন্ত্রের সঙ্গে এখনও যুক্ত করা হয়নি।

'তাহলে এই ব্যাপার! তৃতীয়বার ব্রিজ ওড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ডিনামাইটের সাহায্যে!' স্টিকগুলো তুলে নিল সে। ঠিক এই সময় পাখির ডাক কানে এল। শিস দিয়ে সঙ্কেত দিচ্ছে তাকে কিশোর। কেউ আসছে।

রবিন ওখান থেকে সরে যাবার আগেই ঢাল বেয়ে হুড়মুড় করে নেমে এল বোম্যান। জ্বলন্ত চোখে তাকাল রবিনের দিকে। 'অ, তুমি তাহলে শয়তানদের দলের লোক, যারা আমাদের ভোগাচ্ছে!' রবিনের হাত থেকে স্টিকগুলো কেড়ে নিল সে। 'কোনখান থেকে জোগাড় করলে এগুলো?'

বার বার বলতে লাগল রবিন, সে নির্দোষ, ব্রিজের নিচে গিয়েছিল ছায়ায় বসে শরীর জুড়োতে, তখনই ডিনামাইট স্টিকগুলো চোখে পড়ে তার।

কিছুতেই বিশ্বাস করল না বোম্যান। 'দারুণ! দারুণ গল্প ফেঁদেছ হে! বানিয়ে বলার ওস্তাদ তুমি!' স্টিকগুলো নিয়ে শার্টের নিচে লুকিয়ে ফেলল যাতে আর কারও চোখে না পড়ে। তাহলে হই-চই হবে। রবিনকে আগে আগে হাঁটতে বলে নিজে পেছন পেছন এল ছাউনিতে, যেখানে কাজ করছে কার্ল হ্যারিস।

স্টিকগুলো বের করে দিয়ে বোম্যান বলল, 'এগুলো সহ এই ছেলেটাকে ধরলাম ব্রিজের নিচ থেকে।'

একটা মুহূর্ত হতবাক হয়ে রইল হ্যারিস। তারপর ফেটে পড়ল। 'শয়তান কোথাকার! জেলে পাঠিয়ে তারপর ছাড়ব!'

'কিন্তু ডিনামাইট আমি রাখিনি,' প্রতিবাদ জানাল রবিন। 'মনে করে দেখুন; আমি এসেছি মাত্র গতকাল। তার আগেই কেউ এগুলো রেখে দিয়েছিল ব্রিজের

নিচে।'

'দেখো, হিউক্রুক,' বোম্যান বলল, 'মিথ্যে বলে পার পাবে না। তোমাকে দেখামাত্র আমার সন্দেহ হয়েছে, একটা গোলমাল বাধাতে এসেছ তুমি।'

রাগ কমে এল হ্যারিসের। টেবিলে পেন্সিল ঠুকতে ঠুকতে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকাল রবিনের দিকে। 'বোম্যান, এবারকার মত ছেড়ে দাও। এরপর যদি আর কোন রকম শয়তানি করে ধরা পড়ে, সোজা পুলিশের কাছে।'

'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন দিলাম ছেড়ে।' পিস্তল তোলার ভঙ্গিতে রবিনের দিকে তর্জনী উদ্যত করল সে, 'তবে মনে থাকে যেন। আর কোন শয়তানি চাই না।'

রবিনকে নিয়ে গিয়ে গ্র্যাডার মেশিন চালানো শিখিয়ে দিতে লাগল বোম্যান। 'কেন শেখাচ্ছি জানো? যাতে চোখে চোখে রাখতে পারি।'

খানিক পরে কিশোরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। 'আই, এদিকে এসো। প্যান চালানো শেখো।' বড় বড় চাকাওয়ালা একটা মাটি বহনকারী মেশিনের দিকে হাত নাড়ল বোম্যান, রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে মেশিনটা, 'নেমর, এই ছেলেটাকে চালানো শিখিয়ে দাও তো, যাতে তোমাকে সাহায্য করতে পারে।'

দৈত্যাকার মেশিনটার ওপরে উঠে গেল কিশোর। রবারের চাকাগুলো তার চেয়ে উঁচু। নেমরের রোদে-পোড়া চামড়া, পেশীবহুল শরীর, চওড়া মুখ।

ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে চলল আবার মেশিন। কি করে চালাতে হয় এটা শিখিয়ে দিতে লাগল কিশোরকে। রাস্তার ধারে মাটির স্তূপ ফেলল মেশিনটা। নতুন সহকারীর দিকে ফিরল সে। 'খুব সহজ একটা কাজ দেয়া হয়েছে তোমাকে, খোকা। তারমানে ব্যারনের লোক তুমি।'

'কার!' বলেই বুঝল কিশোর, ভুল প্রশ্ন করে ফেলেছে সে। একেবারে চুপ হয়ে গেল নেমর। বোবা। বহু চেষ্টা করেও আর একটা শব্দও তার মুখ থেকে বের করাতে পারল না সে। শুধুই কাজ করে যেতে হলো নীরবে।

ছুটির পর নদীর পাড়ে গেল সে হাত-মুখ ধুতে। সেখানে দেখা হলো রবিনের সঙ্গে।

ব্যারনের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলাতে কিভাবে মুখে কুলুপ এঁটে ফেলেছে নেমর, রবিনকে জানাল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'নেমর কোন ট্রেলারে থাকে, জানো নাকি?'

'জানি। কাল রাতে দেখেছি। হ্যারিসের ট্রেলারে।'

'তাহলে আজ রাতেও আড়ি পাততে হবে।'

বাকি চারজনের সঙ্গেও কথা বলল কিশোর। অস্বাভাবিক কোন কিছু নজরে পড়েনি কারও। তবে মুসা জানাল, তাকে বোধহয় সন্দেহ করে বসে আছে বোম্যান আর হ্যারিস দুজনেই। ওদের আচরণেই সেটা প্রকাশ পেয়েছে।

অনেক রাতে ট্রেলার থেকে নেমে গিয়ে হ্যারিসের ট্রেলারে কান পাতল কিশোর। ভেতরে কথাবার্তা চলছে, নিচু স্বরে, তবে কণ্ঠস্বর চেনার মত যথেষ্ট জোরে। নেমর আর হ্যারিস। প্রায় দম বন্ধ করে শুনতে লাগল কিশোর। কথা বলার সময় সেই বিচিত্র শব্দ ব্যবহার করছে ওরা।

হ্যারিসকে রিবান-রিবান করতে শুনল কিশোর। তারমানে রবিনকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ডিনামাইট স্টিকের কথাও বলল হ্যারিস। নেমর বলল, 'ওই কায়জার ছোঁড়াটার ব্যাপারটা কি? আমি ভেবেছিলাম সে-ও একজন অ্যাপল, কিন্তু না।'

কায়জার এখানে কিশোরের ছদ্মনাম। নিজের নাম শুনে কান আরও খাড়া করে ফেলল সে।

তৃতীয় একটা কণ্ঠ বলল, 'আমি শুনলাম গ্রেপভিল জেলে বাইস খেটে এসেছে কায়জার।'

ওকেও ওরা জেলখাটা কয়েদী মনে করেছে! এ জন্যেই নেমর ওভাবে কথা বলেছিল। ভেবেছিল, কিশোর ব্যারনকে চেনে। মনে মনে নিজেকে প্রচুর লাথি-ঝাঁটা মারতে লাগল কিশোর। ইস্, কেন যে মুখটা বন্ধ রাখল না তখন! কেন জিজ্ঞেস করতে গেল, "কার!" নেমরের বিশ্বাসভাজন হতে পারলে ওর কাছ থেকে তথ্য আদায় করতে পারত।

হঠাৎ কাছেই একটা শব্দ হলো। ঝট করে বসে পড়ল কিশোর। মুহূর্তে ঢুকে পড়ল ট্রেলারের তলায়। অন্ধকারকে চিরে দিল যেন একটা টর্চলাইটের আলো।

চোদ্দ

দম বন্ধ করে পড়ে রইল কিশোর। আলোটা ঘোরাফেরা করতে লাগল ট্রেলারের প্রবেশ পথের কাছে। তারপর ভেতরে ঢুকে গেল। ক্যাঁচকোঁচ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

একটা কণ্ঠ বলল, 'হেগ যে। কাজ নেই কর্ম নেই, খালি তো দেখি ঘুরে বেড়াচ্ছ।'

'আরকিটনে!' রেগে উঠল হেগ। মেঝেতে দুটো ভারী বুট ছুঁড়ে ফেলার শব্দ হলো। বাংকে চড়ার খচমচ। তারপর নীরবতা।

অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর। কিন্তু আর কোন কথা শোনা গেল না। নিজের ট্রেলারে ফিরে এল সে। জেগে আছে রবিন। ফিসফিস করে তাকে বলল, 'জেল খেটে আসা কয়েদীগুলো এখানে বড় ধরনের কোন শয়তানীর মতলবে আছে। কিন্তু শক্ত ঘাঁটিতে এসে পড়েছি আমরা, রবিন। এদের সঙ্গে পারা খুব কঠিন। বোরিসের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

আবার বেরিয়ে এল দুজনে। সঙ্গে টর্চ নিয়েছে। রেডিওটা নিয়েছে রবিন। ঢুকে পড়ল রাস্তার ধার ঘেঁষে থাকা বনের মধ্যে।

ওঅর্ক ক্যাম্পের কাছ থেকে সরে আসার পর টর্চ জ্বালল কিশোর। তবে একনাগাড়ে জ্বেলে রাখল না। মাঝে মাঝে জ্বেলে ঘন বনের মধ্যে পথ দেখে দেখে এগোতে লাগল। গতি খুব ধীর।

কিছুদূর এগোনোর পর রবিন বলল, 'থামব নাকি এখানে?'

'না। ট্রেলারের এত কাছে, পাহারা থাকতে পারে।'

গাছের শেকড় বেরিয়ে আছে যত্রতত্র। আলো নিভিয়ে এগোতে গেলেই পা বেধে যাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে। অবশেষে পাইনের একটা জটলার মাঝখানে ছোট্ট একটা খোলা জায়গায় ঢুকল ওরা। চাঁদ উঠছে। আলো পড়েছে খোলা জায়গাটায়। বড় একটা পাথর দেখা গেল। পাথরটায় পিঠ দিয়ে বসে পড়ল দুজনে।

'হয়েছে,' কিশোর বলল। 'এখন লাগাও, বোরিসকে।'

ট্রান্সমিটার অন করল রবিন। রকি-বীচকে খুঁজতে লাগল। সাড়া নেই।

আবার চেষ্টা করল রবিন। এবারও সাড়া নেই।

'ব্যাটারি আছে তো?' জানতে চাইল কিশোর।

'আছে।'

এ সময় একজন হ্যাম অপারেটরের কণ্ঠ ভেসে এল স্পীকারে। জোরাল, স্পষ্ট। কোথায় করতে চাইছে রবিন, জিজ্ঞেস করল।

জানাল রবিন। বলল, জরুরী কল। দয়া করে অপারেটর যদি এর মধ্যে না ঢুকে পড়ে খুশি হবে।

'ঠিক আছে, সরে যাচ্ছি। গুড লাক। ওভার অ্যান্ড আউট।'

'খোদাই জানে,' কিশোর বলল, 'কয়েদীগুলোও শুনছে নাকি।'

'শুনলে গেছি!' আবার বোরিসকে ডাকল রবিন। নানা রকম প্রতিবন্ধকতার মাঝে অস্পষ্ট শোনা গেল বোরিসের কণ্ঠ। বহু কষ্টে নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কণ্ঠটাকে শোনার পর্যায়ে নিয়ে এল রবিন। বলল, 'বোরিসভাই?...রবিন। রাশেদ আঙ্কেল কেমন আছেন?'

বোরিসের জবাবটা খুশি করার মত। দ্রুত সেরে উঠছেন রাশেদ পাশা। 'শরীর ঠিক হয়ে যাচ্ছে। তবে স্মৃতিশক্তি এখনও ধোঁয়াটে,' জানাল সে। 'এক্স-রে করে বোঝা গেছে কি কারণে এ অবস্থা হয়েছে তাঁর। ডাক্তাররা সন্দেহ করছেন ঘাড়ের পেছনে আঘাত পেয়েছেন তিনি। অন্তত আরও হপ্তাখানেকের আগে স্মৃতিশক্তি ঠিক হবে না তাঁর। বেশিও লেগে যেতে পারে।'

'তারমানে উন্নতি হচ্ছে। খুশির খবর।'

'হ্যাঁ।'

রেডিওটা কিশোরের হাতে তুলে দিল রবিন।

'বোরিসভাই,' কিশোর বলল, 'ওরকম আরও কিছু শব্দ শুনেছি। মানেগুলো বলুন তো। প্রথমেই ধরুন, অ্যাপল—আমাকে অ্যাপল বলে ডেকেছে ওরা। অ্যাপল কাকে বলে?'

'প্রতারক,' হাসি শোনা গেল বোরিসের। 'ওরা তোমাকে চোর-ছ্যাঁচড় ভাবছে, কিশোর। ভালই!'

'মেরিচাচীকে বলবেন না!' কিশোরও হাসল।

'কাগজ-কলম আছে? জেলখানায় ব্যবহৃত কতগুলো শব্দ বলে দিচ্ছি তোমাকে, লিখে নাও। বুঝতে পারছি, কাজে লাগবে ওখানে।'

কাগজ আর পেন্সিল বের করে দিল রবিন। টর্চ জ্বেলে ধরে রাখল তার ওপর। কিশোর লিখে নিতে লাগল:

কপ আ হীল – দৌড় দেয়া
টিন স্টার – স্থানীয় শেরিফ
টর্চম্যান – সিন্দুক ভাঙে যে চোর
চীজার – সহজে খোলা যায় এমন সিন্দুক
আরকিটনে – চুপ করো
বিগ নোট – ধনী লোক
বিন্ডলস্টিফ – ভবঘুরে
ইন দা বিং – নিঃসঙ্গ লোক
ফিঙ্গার ম্যান – খবর প্রদানকারী
ইকুয়ালাইজার – বন্দুক বা পিস্তল

হঠাৎ কেটে গেল যোগাযোগ।

'হায় হায়, কি হলো?' বলে উঠল রবিন।

'আবহাওয়ার কারণে গোলমাল করছে হয়তো,' কিশোর বলল। 'অনেক শব্দ শিখলাম। কাজ চালিয়ে নিতে পারব। চলো, ফিরে যাই। কে আবার কোনদিক থেকে এসে দেখে ফেলে।'

'ও-কে, অ্যাপল,' হাসল রবিন।

নিঃশব্দে চলার চেষ্টা করল ওরা। কিন্তু পড়ে থাকা শুকনো ডাল-কুটোর জন্যে সেটা অসম্ভব। পায়ের নিচে পড়ে মটমট করে ভাঙছে। নীরবতার মাঝে মনে হচ্ছে বোমা ফাটছে। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছে কিশোর।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল রবিন। 'কিশোর, দেখো!'

ফেরার সময় এখন সরু একটা পায়েচলা পথ ধরে এগোচ্ছে ওরা, আসার সময় দেখেনি এটা। সামনে পথটা দু'ভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে। সেটাই দেখাচ্ছে রবিন। ডানে মোড় নিয়েছে যেটা–কিশোর অনুমান করল–সেটা গেছে ক্যাম্পের দিকে। বাঁয়েরটা গেছে পাহাড়ের একটা শৈলশিরার দিকে। এগিয়ে এসে বাঁয়ের পথটার ওপর টর্চের আলো ফেলে ভাল করে দেখতে লাগল সে। পুরু হয়ে বিছিয়ে থাকা পাইনের পাতার মধ্যে আধপোড়া একটা ম্যাচের কাঠি দেখতে পেল।

'তারমানে এটাতেও লোক চলাচল আছে,' বলল সে। 'কারা চলাচল করে? শ্রমিকদের কেউ?' নিজেকেই করল প্রশ্নগুলো।

'চলো না পাহাড়ের দিকে এগিয়ে দেখি।'

'কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে তো।'

'হোক। এসেছিই তো তদন্ত করতে। দেখা যাক না কিছু পাওয়া যায় নাকি।'

'তা বটে। তবে খুব বেশি দেরি করা চলবে না আমাদের। এখনও অনেক কাজ বাকি। এত সহজে ধরা পড়ে গেলে সব বাদছাদ দিয়ে চলে যেতে হবে।'

শুরুর দিকে এগোনো তেমন কঠিন হলো না। দেখে দেখে এখানে চলার মত যথেষ্ট চাঁদের আলো আছে। কিন্তু যতই উঁচুতে উঠতে লাগল, ঢেউয়ের মত উঁচু-নিচু হয়ে এল পথ ভূমি, কষ্টকর হয়ে উঠল পথচলা।

হঠাৎ আবার দাঁড়িয়ে গেল রবিন। 'কিশোর, কোথায় যাচ্ছি আমরা? এমন কোনখানে না তো যেখান থেকে পাহারা দেয় ওরা, চতুর্দিকে নজর রাখে?'

জবাব দেয়ার পরিবর্তে রবিনের কব্জি চেপে ধরে এক টানে একটা পাইনের আড়ালে নিয়ে এল কিশোর। কতগুলো পাইনের মাঝে একটা ফাঁকের দিকে হাত তুলে বলল, 'ওখানটায় কি যেন নড়তে দেখলাম মনে হলো!'

'আমি তো কিছু দেখছি না।'

'চলো, দেখে আসি।'

মাথা নুইয়ে, শরীরটাকে সামনে বাঁকা করে যতটা সম্ভব উচ্চতা কমিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল দুজনে। মাঝে মাঝেই থেমে গিয়ে কান পাতছে শব্দ শোনার আশায়। ঝনঝন করে ধাতব শব্দ শোনা গেল।

পাইনের মাঝের ফাঁকের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। গাছপালা এত ঘন, চাঁদের আলো ঢুকতে পারছে না। ফাঁকটা কি, বুঝতে অসুবিধে হলো না। রবিন বলল, 'গুহামুখ মনে হচ্ছে। নাকি ফাটল?'

'গুহাই মনে হচ্ছে,' তিরিশ ফুট দূরের একটা গাছ দেখাল কিশোর। মাটি থেকে কিছুটা ওপরে কাণ্ডের গায়ে একটা বাক্স-মত জিনিস দেখা যাচ্ছে।

অন্ধকারের মধ্যে গাছের সঙ্গে মিশে থেকে ভাবতে লাগল ওরা, এরপর কি করবে? গুহাটায় কি কেউ আছে? কি আছে দেখার জন্যে ভেতরে ঢোকার ঝুঁকি নেয়াটা কি উচিত হবে? নাকি এখনকার মত ফিরে গিয়ে পরে সময় করে আবার আসবে?

'চমকে দেয়ার সুযোগটা এখন আমাদের হাতে,' অবশেষে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর।

পা টিপে টিপে আবার এগিয়ে চলল ওরা। এখন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে, ফাঁকা জায়গাটা একটা গুহামুখ।

'আমি টর্চ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে একছুটে ঢুকে পড়বে,' কিশোর বলল।

কিন্তু আলো জ্বালতেই জ্বলজ্বল করে উঠল একজোড়া চোখ। সেই সাথে ভয়ঙ্কর এক ক্রুদ্ধ গর্জন।

'ভালুক! ভালুক!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

গুহার ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল জানোয়ারটা।

একটা মুহূর্তও আর দাঁড়াল না দুই গোয়েন্দা। ঘুরে দিল দৌড়। গর্জন করতে করতে ঝোপঝাড় ভেঙে গাছপালার ভেতর দিয়ে ওদের পিছু নিল ভালুকটা।

পা যেন মাটি ছুঁচ্ছে না গোয়েন্দাদের, উড়ে চলেছে। হঠাৎ ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল ভালুকটা। বিকট এক হাঁক ছাড়ল। মনে হলো, ঝড়াৎ করে টান পড়ল কিসে যেন। একটু পরেই বুঝতে পারল ওরা, ভালুকটা আর পিছু নিচ্ছে না। থামল দুজনে। থরথর করে কাঁপছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

'উহ্, আমি তো মনে করেছিলাম আজই জীবনের শেষ দিন!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'কালো ভালুক। কত্তবড় দেখেছ? একথাবা মেরে তোমার মুণ্ডু আলাদা করে দিতে পারবে।'

ভালুকটা দাঁড়াল কেন দেখার জন্যে খুব সাবধানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে আবার ফিরে চলল ওরা।

'ওই যে,' হাত তুলে দেখাল রবিন।

গায়ে আলো ফেলল কিশোর।

বিস্ময়ে নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ার অবস্থা হলো দুজনের। লম্বা শেকলে বাঁধা ভালুকটা। মুখ বাড়িয়ে গলা টানটান করে, থাবা মেরে ধরার চেষ্টা করছে দুই ফুট দূরে গাছের গায়ের বাক্স-মত জিনিসটা।

'আরি কি কাণ্ড!' কিশোর বলল, 'ও তো মৌচাক!'

'কি নিষ্ঠুরতা!'

রাস্তাটা পাহারা দেয়ার জন্যে ভালুকটাকে আটকে রেখেছে এখানে কেউ। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা মৌচাকের-মুলো ঝুলিয়ে রেখেছে চোখের সামনে, এমন জায়গায় যাতে কোনমতেই ধরতে না পারে। খেপতে থাকে ভালুকটা। শেকলটা এতখানি লম্বা রেখেছে, যাতে রাস্তার ওপর চলে আসতে পারে ওটা। রাস্তা দিয়ে কেউ যেতে চাইলে তাকে তাড়া করতে পারে। অতবড় ভালুকের তাড়া খেয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হবে পথিকের। ভাগ্য খারাপ হলে নাগালের মধ্যেও পড়ে যেতে পারে। তাতে মৃত্যু সহ মারাত্মক জখম হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা।

'সাধারণত মানুষের কাছ থেকে সরেই থাকে ভালুক,' নিজেকেই যেন বোঝাল কিশোর, 'কিন্তু এটা সরবে না। মানুষের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা তৈরি হওয়ার যথেষ্ট কারণ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। দুর্দান্ত প্রহরী।'

মারাত্মক নখগুলোর নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে মৌচাকটা খুলে আনল কিশোর। ছুঁড়ে ফেলল ভালুকটার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিরে ফেলল ভালুকটা। গোগ্রাসে মধু খেতে শুরু করল।

'এসে মৌচাকের অবস্থা দেখলে চমকে যাবে লোকটা!' হেসে বলল রবিন।

এখানে এই 'ভালুক-ফাঁদ' পেতে পাহারা দেয়ার কি মানে, কার কাজ, ওদের কেসের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা ভাবতে ভাবতে ঢালু পথ ধরে ফিরে চলল দুজনে।

ঢালের গোড়ায় প্রায় চলে এসেছে, চমকে দিল একটা কণ্ঠ, 'অ্যাই কে ওখানে! কে?'

'হ্যারিস!' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'শুয়ে পড়ো। দেখে ফেললে মুশকিল হবে।'

একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল দুজনে। নিথর পড়ে রইল। নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে। গুলির শব্দ হলো। শিস কেটে মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল বুলেট। থ্যাক করে গিয়ে বিঁধল একটা গাছে। তারপর চুপচাপ। কিছুক্ষণ পর শুকনো ডাল মাড়ানোর শব্দ কানে এল ওদের।

আস্তে আস্তে দূরে চলে গেল শব্দ। ভারী দম নিল রবিন। 'চলে গেছে। গুলি করল কেন, বলো তো?'

'অস্থিরতা! আর কি হতে পারে?'

ঝোপ থেকে বেরিয়ে সাবধানে রাইফেলধারী লোকটার পিছু নিল ওরা। কিন্তু আবার কিছুদূর গিয়ে থেমে যেতে হলো। অদ্ভুত ব্যাপার। গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে এক ধরনের গোলাপী আভা।

'ঘটনাটা কি!' রবিন বলল। 'সূর্য উঠতে তো এখনও বহু দেরি।'

কালো আকাশকে কেমন ভূতুড়ে আলোয় রাঙিয়ে দিল সেই আজব আলো।

'এ কি-রে বাবা!' আবার বলল সে। 'এমন ভূতুড়ে কাণ্ড তো জীবনে দেখিনি!'

'বিপজ্জনক কিনা বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলল।

'দাবানল! বনে আগুন লেগেছে।'

কিন্তু রবিনের কথা যে ঠিক নয় বুঝতে পারল যখন ওদের চোখের সামনেই আলোটা নিভে গিয়ে আবার অন্ধকার হয়ে গেল আকাশ।

রহস্যময় ব্যাপার। ভাবতে ভাবতে ক্যাম্পে ফিরে চলল ওরা। কয়েক ফুট পর পরই থেমে, কান পেতে শুনে নিয়ে তারপর এগোয়। কোথায় কোন্ ঝোপের মধ্যে ওদের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে রয়েছে কার্ল হ্যারিস, কে জানে। চিকন ঘাম দেখা দিল ওদের। ট্রেলারটা দেখা গেল অবশেষে।

'দেখো!' থমকে দাঁড়াল কিশোর। চাঁদের আলোয় হ্যারিসকে দেখা যাচ্ছে, পা ছড়িয়ে বসে আছে ওদের ট্রেলারের দরজার পাশে। দুই হাঁটুর ফাঁকে খাড়া করে ধরে রেখেছে রাইফেলটা।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রবিন। 'ঢুকব কি করে?'

হ্যারিসের দৃষ্টি অন্য দিকে সরানোর চেষ্টা করল ওরা। একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল রবিন। ট্রেলার থেকে বেশ খানিকটা দূরে পড়ল পাথরটা। শব্দ শুনে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল হ্যারিস। একই দিকে আরেকটা পাথর ছুঁড়ল রবিন।

ছুটে ট্রেলারের অন্যপাশে চলে গেল হ্যারিস। দেখা যাচ্ছে না এখন ওকে আর।

'দৌড় দাও!' কিশোর বলল। 'আসার আগেই ঢুকে পড়তে হবে।'

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়িমরি করে ছুটল দুজনে। ঢুকে পড়ল ট্রেলারে। যত তাড়াতাড়ি পারল কাপড় খুলে উঠে পড়ল যার যার বাংকে। মাথার নিচে বালিশটা ঠিক করে দিতে যাবে কিশোর, হাতে ঠেকল একটা কাগজ। হাত বাড়িয়ে বিছানার মাথার একপাশ থেকে টর্চটা তুলে নিয়ে আলো ফেলল কাগজে। টম লিখে রেখে গেছে:

বিপদে পড়েছে রিচি। চাকরি থেকে বিদেয় করে দেয়া হতে পারে। 'এইচ' এবং 'বি'-এর ছবি আঁকার সময় ধরা পড়েছে।

পনেরো

ফিসফিস করে মেসেজটার কথা রবিনকে জানাল কিশোর। ঠিক এই সময় খুলে গেল ট্রেলারের স্ক্রীন ডোর। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে হ্যারিস। হাতে রাইফেল। পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওদের বাংকের কাছে। চোখ বুজে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল দুজনে।

হঠাৎ যেন চমকে গিয়ে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল কিশোর, 'কিছু হয়েছে, মিস্টার হ্যারিস?'

'অ্যাঁ...না না, কিছু না...' বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেল এখন হ্যারিসই। 'বনের

মধ্যে গিয়ে হারাও-টারাও নাকি আবার, সেজন্যে সাবধান করে দিতে এসেছিলাম। রাতে এখানে বনে ঢুকলে ভয়ানক বিপদ হতে পারে।'

কথাবার্তায় যেন ঘুম ভেঙে গেছে এমন ভঙ্গি করে উঠে বসল রবিনও। মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে হাই তুলতে লাগল। জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার হ্যারিস, সব সময় ওই ইকুয়ালাইজারটা বয়ে বেড়ান নাকি আপনি?'

রবিনের উদ্দেশে ধমকে উঠল কিশোর, 'আহ্, আরকিটনে!'

আরেকটু হলে হাত থেকে রাইফেলটা ফেলেই দিয়েছিল হ্যারিস। ঠেলে বেরিয়ে এল চোখ। কথা বলতে মুখ খুলেও কি ভেবে বন্ধ করে ফেলল। আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল ট্রেলার থেকে।

'দিলাম একটা চিন্তার মধ্যে ফেলে,' হাসল রবিন।

'আপাতত দিলাম বটে, তবে মন বলছে সাবধান থাকতে হবে আমাদের। এখনও অন্ধকারেই রয়ে গেছি আমরা। খেলাটা কি ওদের, তা-ই জানি না।'

কয়েক ঘণ্টা ঘুম কম দিয়েও ঠিক সময়ে ঝরঝরে শরীর নিয়েই উঠতে পারল কিশোর আর রবিন। নাস্তার সময় রিচির পাশে বসল কিশোর। বলল, 'কি হয়েছে শুনেছি।' ছুরি-কাঁটা-চামচের টুং-টাং ঢেকে দিল ওদের কথার শব্দ। তা ছাড়া নিচু গলায় কথা বলছে। 'তোমাকে চাকরি থেকে বের করে দিলে এমন ভান করবে যেন কতই না দুঃখ পেয়েছ, ওই চাকরিটা ছাড়া চলছিল না তোমার। তারপর সোজা চলে যাবে ওয়াইল্ড টাউনে, প্রিন্স হোটেলে উঠবে। ওখানে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল রিচি। আর কোন কথা বলার সুযোগ হলো না, কারণ, কার্ল হ্যারিস উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল চাপড়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'থামো! থামো! চুপ করো!'

চুপ হয়ে গেল সবাই। থেমে গেল গুঞ্জন। রিচির দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি ফুটল হ্যারিসের মুখে। 'রিচি, ছবি আঁকার যখন এতই শখ তোমার, অন্যখানে গিয়ে আঁকো। এখানে নয়। তোমাকে সে-সুযোগই করে দেয়া হলো। চাকরি থেকে বরখাস্ত।'

বোকা হয়ে গেল যেন রিচি। বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কখন বরখাস্ত করা হলো?'

'এই তো, এখন।' পকেট থেকে বাদামী রঙের একটা খাম টেনে বের করে ছুঁড়ে দিল রিচির দিকে। 'বেতনের টাকা, যে কদিন কাজ করেছ। দয়া করে এখন বিদেয় হও।'

বড়ই মর্মাহত হয়েছে যেন এমন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল রিচি। আবার গুঞ্জন শুরু হলো। খামটা হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে ট্রেলার থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'বড়ই দুঃখ পেয়েছে বেচারা,' সবাইকে শুনিয়ে বেশ স্পষ্ট করেই বলল কিশোর, 'ভাবতেই পারেনি এমন করে চাকরি খোয়াবে!'

কনস্ট্রাকশন সাইটে শুরু হলো আরেকটা ব্যস্ত দিন। প্যান-এ চড়ে নেমরের পাশে বসল কিশোর। বিশাল মোটরটা বিকট গর্জন তুলে চালু হয়ে গেল নেমরের হাতের ছোঁয়ায়। খামচি দিয়ে নিজের বিশাল হাতায় আলগা মাটি তুলে নিয়ে রাস্তার

ধারে ফেলতে এগিয়ে চলল যন্ত্রটা। ফেলে দিয়ে আরেক হাতা মাটি নেয়ার জন্যে যখন ফিরছে, নেমরের সঙ্গে খানিকটা বাতচিত করার লোভ সামলাতে পারল না কিশোর।

'আপনি আমাকে বিন্ডলস্টিফ ভেবেছিলেন, তাই না?' বলল সে। এতটাই অবাক হলো নেমর, নিজের অজান্তে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। দুজনেই সীট থেকে উড়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু কথা বন্ধ করল না কিশোর। বলল, 'আসলে আমি একজন টর্চম্যান, কিন্তু চীজার খুলতে আমাকে ধরে ফেলেছিল টিন স্টার। কপড আ হীল, বুঝলেন তো, কিন্তু হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।'

ব্রেক ছেড়ে দিল নেমর। 'আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম, তুমি ব্যারনের লোক। আমার কাছে নাম কা ওয়াস্তে কাজ দিয়ে রেখে দিয়েছে। রসি জ্বালতে পাঠাবে, তাই না?'

রসি জ্বালতে! দ্রুত ভাবনা চলল কিশোরের মগজে। রাতের বেলার গোলাপী আলোর কথা বলছে নাকি? আগের দিন বোকার মত প্রশ্ন করে সন্দেহ জাগিয়েছিল। আজ আবার কি করে বসে কে জানে! সাবধানে বলল, 'হ্যাঁ, রসি।'

জবাবটা ঠিকই হয়েছে বোধহয়। ওর দিকে ফিরে হাসল নেমর। 'ভাল একখান আবিষ্কার। পাহাড়ীরা ভয় যা পায় না। ধারেকাছে ঘেঁষে না।'

কথা বলার সময় রাস্তার দিক থেকে নজর সরে গেছে নেমরের। ঘটে গেল অঘটন। বিরাট এক পাথরে গিয়ে ধাক্কা মারল যন্ত্রটা। কাত হয়ে যেতে শুরু করল একপাশে।

'লাফ মারো, লাফ মারো!' চিৎকার করে উঠল নেমর। সে নিজেও সীট থেকে উঠে ঝাঁপ দিল। দেখাদেখি লাফ দিল কিশোরও। রাস্তার পাশের নরম মাটিতে উড়ে গিয়ে পড়ল সে। ব্যথাট্যথা তেমন পেল না। বিকট শব্দে গোঁ-গোঁ করছে মস্ত ইঞ্জিনটা, চাকাগুলো পাগলের মত ঘুরছে।

রাস্তার কঠিন অংশে গিয়ে পড়েছে নেমর। তাকে সাহায্য করতে ছুটে গেল কিশোর আর অন্যান্য শ্রমিকেরা। ডান পা চেপে ধরে গোঙানো শুরু করেছে সে। ছুটে এল বোম্যান। মুখের ভঙ্গিটা যা করেছে দেখার মত। খেঁকিয়ে উঠল, 'এ কি করলে, নেমর? তোমাকে তো ভাল ড্রাইভার বলেই জানতাম!'

ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে এল একজন। নেমরের ডান পা থেকে ওভারঅল ছিঁড়ে ফেলে দিল। জখমটা পরীক্ষা করে দেখে বলল, 'ভেঙে গেছে মনে হচ্ছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

সাময়িক একটা স্প্লিন্ট বেঁধে দেয়া হলো নেমরের পায়ে। ব্যথায় মুখচোখ কুঁচকে ফেলেছে বেচারা। ধরাধরি করে স্ট্রেচারে তোলা হলো তাকে। দুজন শ্রমিক বয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে একটা ছোট ট্রাকের পেছনে তুলে দিল। হাইওয়ের যে অংশটুকু তৈরি হয়ে গেছে, সেটা ধরে দ্রুত ছুটে চলে গেল ট্রাকটা।

কিশোরের দিকে তাকাল বোম্যান, 'কি হয়েছিল?'

পুরোপুরি না জানার ভান করল কিশোর। 'জানি না।'

ভ্রূকুটি করল ফোরম্যান। 'মিছে কথার ওস্তাদ একেকজন। কারও মুখ থেকে কোন কথা আদায় করা যায় না। সঙ্গী জোগাড় করো একজন। প্যানটাকে টেনে

তোলার ব্যবস্থা করো।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'রিবান, এসো তো। সাহায্য করো।'

বিডও এগিয়ে এল সাহায্য করতে। ক্রেনের সাহায্যে তুলে আনা হলো দানবীয় যন্ত্রটা। দক্ষ হাতে নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিসগুলো মেরামত করে দিতে লাগল বিড। একসঙ্গে কাজ করার সময় কথা বলার সুযোগটা ছাড়ল না তিনজনে।

'কয়েকবার ব্যারন-ব্যারন করেছে নেমর,' কিশোর বলল। 'মনে হয় ব্যারন ওদের বস্।'

'কিন্তু কে সে?' রবিনের প্রশ্ন। 'কোথায় থাকে?'

'চুপ!' সাবধান করল কিশোর।

পাথর বহনকারী একটা ট্রাক এসে থামল ওদের পাশে। পেশল একটা লোক লাফ দিয়ে নেমে এল ড্রাইভারের সীট থেকে। বিড আর রবিনের কাছ থেকে কিশোরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখল লোকটা। 'হেলিক্স।'

চকিতে দুটো ভাবনা খেলে গেল কিশোরের মগজে: প্রলাপের ঘোরে তার চাচা যে শব্দটা উচ্চারণ করেছেন সেটা 'ফেলিক্স' নয় 'হেলিক্স'; আর হেলিক্স মানে পেঁচানো। হুমকি দিয়ে লেখা প্রথম নোটটায় সই করা পেঁচানো অক্ষরটার কথা মনে পড়ল তার। নিশ্চয় 'হেলিক্স' শব্দটা ব্যবহার করছে এরা বিশেষ কিছু বোঝাতে, কিংবা এটা ওদের পাসওয়ার্ড।

'ও-কে!' ডান হাতের আঙুল তুলে বাতাসে একটা পেঁচানো ফাঁসের মত আঁকল কিশোর। মনে হলো সন্তুষ্ট হয়েছে ড্রাইভার। কিশোরকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল সে।

'আজ রাতে তোমাদের একটা কাজ করতে হবে, কায়জার,' ড্রাইভার বলল।

'কি কাজ?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কিশোরের কণ্ঠ।

'টিকটিকির মত ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে টম, যেখানে সেখানে নাক গলাচ্ছে। খতম করে দিতে হবে তাকে, বাথ ইন দা ক্যানাল।'

ডুবিয়ে মারতে হবে! মনে মনে ভয় পেয়ে গেল কিশোর। তবে চেহারাটা স্বাভাবিক রাখল। 'আপনার নামটা জানা হলো না এখনও।'

'রব ব্রোকার।'

'কিন্তু টম আমাকে বন্ধু মনে করে।'

'তাহলে তো আরও ভাল হলো। তোমাকে আর রিবানকে প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যায়। তোমরা দুজনে ভজিয়ে-ভাজিয়ে আজ রাতে কাজটা সেরে ফেলবে। কথাটা মনে থাকে যেন।'

প্যানের কাছে ফিরে এল কিশোর। মনের মধ্যে ভাবনার ঘূর্ণিপাক। ট্রাক-ড্রাইভার যা বলে গেল সেটা শুনে রবিন আর বিডও ভড়কে গেল।

'টমকে বাঁচাতে হবে!' রবিন বলল।

'তা তো বাঁচাবই,' কিশোর বলল। 'মরতে কি আর দিই। একটা বুদ্ধিও বের করে ফেলেছি।'

ঠিক হলো, সুযোগমত কোন এক সময় টমকে সাবধান করে দেবে বিড। কি করতে হবে বলে দেবে। জানিয়ে রাখবে, রাতে ওকে নিতে আসবে কিশোর আর রবিন।

সান্ধ্য-খাবারের পর পাথর ছোঁড়া নিয়ে জোরে জোরে তর্ক শুরু করল দুই গোয়েন্দা, আসল উদ্দেশ্য বিডের দিক থেকে সবার নজর সরিয়ে দেয়া যাতে সে গিয়ে টমের সঙ্গে কথা বলতে পারে। কিশোর বলল, পাথর ছুঁড়ে সে রবিনের চেয়ে বেশি দূরে নিতে পারবে। রবিন বলল, পারবে না। আগেই ইঙ্গিত দিয়ে রাখা হয়েছে মুসাকে। তর্ক শুনে এগিয়ে এল। দুজনের ঝগড়াটা আরও উসকে দিল সে। শেষে গোল একটা পাথর বেছে নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামল ওরা। দেখতে দেখতে দর্শক জমে গেল, ঘিরে দাঁড়াল ওদের। পক্ষও নিয়ে ফেলল। চিৎকার করে উৎসাহ দিতে লাগল। তিনজনের যে কেউ পাথর ছুঁড়ুক, চিৎকার করে ওঠে দর্শকরা।

মজা পেয়ে এমনকি হ্যারিসও এগিয়ে এল। বলল, 'আমি তোমাদের চেয়ে দূরে নিতে পারব।'

আসলেই পারল। মুসার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি দূরে। আরও কয়েকজন জুটে গেল, প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এগিয়ে এল। তাদের মধ্যে বিডও রয়েছে। তবে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারল না। কয়েকবার ছুঁড়েই যেন বিরক্ত হয়ে ভিড়ের মধ্যে থেকে সরে গেল বিড, আসলে কেটে পড়ল। কিশোরের ইঙ্গিত পেয়ে টমও চলে গেল বিডের পিছু পিছু। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল আবার।

ততক্ষণে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে মুসা। তার প্রতিদ্বন্দ্বী এখন একমাত্র হ্যারিস। আর একবার করে ছুঁড়তে হবে, তারপরই স্থির হয়ে যাবে জয়-পরাজয়। মুসাই জিতল। হ্যারিসের চেয়ে কয়েক ইঞ্চি দূরে ছুঁড়ে ফেলে। হই-হই করে উঠল তার ভক্তরা। তিক্তকণ্ঠে বোম্যান বলল, 'কাজের সময় যদি এই দৃঢ়তা নিয়ে বেলচা চালাতে পারতে, অনেক এগিয়ে যেত আরও কাজ।'

'হ্যাঁ, স্যার,' গুরুত্ব দিল কিনা, কিছুই বোঝা গেল না মুসার কথা শুনে।

সূর্য ডুবল। দ্রুত নেমে আসছে অন্ধকার। মিলিয়ে যাচ্ছে দিনের আলো। লম্বা লম্বা পাইন গাছগুলোকে কালো লাগছে এখন, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বনের প্রহরীর মত। ওঅর্ক ক্যাম্পে নেমে এসেছে স্তব্ধতা। হঠাৎ করে বড় বেশি চুপচাপ হয়ে গেছে সব কিছু। এখানে আসার পর এমন পরিস্থিতি আর দেখেনি কিশোর।

আরও কিছুক্ষণ পর। ট্রেলারের ওয়াশ-রুমে হাতমুখ ধোয়ার সময় ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল দুই গোয়েন্দা।

'টমের বাথ ইন দা ক্যানালের খবরটা কজনে জানে কে জানে!' রবিন বলল।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে জবাব দিল কিশোর, 'শিওর হয়ে বলার উপায় নেই। সমস্যাটাই এটা। কতজনে মিলে এখানে ষড়যন্ত্র করছে, কিছুই জানি না আমরা।'

বাংকে শুয়ে ম্যাগাজিন পড়ে সময় পার করতে লাগল ওরা। বিশ্রী একটা অনুভূতি হচ্ছে দুজনেরই। মনে হচ্ছে যেন ট্রেলারের সব ক'জোড়া চোখ গোপনে লক্ষ করছে ওদের।

সাড়ে এগারোটায় ট্রেলারে ঢুকল রব ব্রোকার। এগিয়ে এল কিশোরের বাংকের

কাছে। 'কিশোর, এই নাও তোমার জিনিস। এটা দিয়ে কাজ সারবে। রবিনকে নিয়ে চলে যাও এখনই।' কিশোরের হাতে একটা জিনিস গুঁজে দিয়ে চলে গেল সে। শক্ত কাপড়ের আট-দশ ইঞ্চি একটা পাইপ বানিয়ে তাতে ঠেসে বালি ভরা হয়েছে। ভয়ানক অস্ত্র। এ দিয়ে মাথায় কিংবা ঘাড়ে বাড়ি মেরে বেহুঁশ তো বটেই, অনায়াসে মেরে ফেলা যায় একজন মানুষকে।

কাপড় পরতে গিয়ে লক্ষ করল কিশোর, অন্য কোন বাংকের একজন লোকও চোখ মেলে নেই। রবের আগমন যেন কারও চোখে পড়েনি, কিংবা পড়লেও দেখে না দেখার ভান করছে।

পাঁচ মিনিট পর টমকে গিয়ে তার বাংক থেকে ডেকে ওঠাল দুজনে। রবিন বলল, 'টম, ওঠো, একটা জিনিস দেখাব তোমাকে।'

'এত রাতে!' বিরক্ত হলো টম। 'পরে। এখন ঘুমাচ্ছি।'

'না, এখনই দেখাতে হবে। ওঠো জলদি করো।'

'আহ্, কি এমন জিনিস···' গজগজ করতে করতে উঠে বসল টম। চোখ ডলল। কাপড় পরে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দার সঙ্গে। হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ করল কিশোর, ওদের পিছু নিয়েছে রব আর আরও একজন লোক।

ক্রমাগত বিরক্তি প্রকাশ করেই চলল টম। 'কি এমন জিনিস রাত দুপুরে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছ আমাকে!' জোরে জোরে বলল সে।

'চলো না, নদীর ধারে,' রবিন বলল। 'গেলেই দেখতে পাবে।'

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। স্রোতের শব্দ লক্ষ্য করে অনুমানে সেদিকে এগোল। এসে দাঁড়াল পানির কিনারে। পেছনে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। রবিন বলল, 'জলদি! এসে গেল ওরা!'

কাপড়ের ডাণ্ডাটা বের করে টমের মাথা সই করে বাড়ি মারল কিশোর। চিৎকার দিয়ে মাথা নিচু করে পানিতে পড়ে গেল টম।

'টমও যে তোমার মত এত ভাল অভিনয় করতে পারে জানতাম না!' হেসে বলল রবিন। 'মাথায় তো লাগেইনি।'

হাসি বেশিক্ষণ টিকল না ওদের। ঘুরে দাঁড়াতে যাবে, প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল পেছনের লোক দুজন। আঘাত লাগল মাথায়। দুজনেই উল্টে গিয়ে পড়ল নিচের খরস্রোতা নদীর পানিতে।

ষোলো

কিশোরের মনে হতে লাগল নায়াগ্রা জলপ্রপাতের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়েছে। টন টন ওজনের পানি চেপে ধরে তার ফুসফুস থেকে বাতাস বের করে দিচ্ছে। বুকে যেন জগদ্দল পাথরের চাপ।

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল মাথার ভেতরটা। চিত হয়ে ভাসছে। বুকের চাপটা নেই আর। কানে এল টমের কণ্ঠ, 'কিশোর, কিশোর! ঠিক আছ তুমি?'

তার দুই বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধারের কায়দায় সাঁতরে নিয়ে চলেছে টম। পাথরে ভরা তীরে টেনে তুলতে তুলতে বলল, 'নাও, আর কোন ভয় নেই।'

মাথার মধ্যে দপদপ করছে কিশোরের। পানি গিলেছে প্রচুর। কোনমতে ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল, 'রবিন···কোথায়?'

'ওকে পাইনি। চিন্তা কোরো না। আমার মনে হয় সে ভালই আছে। উঠে পড়বে কোনখান দিয়ে।'

কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না কিশোর। মাতালের মত টলোমলো ভঙ্গিতে উঠে বসল। 'আমাদের সঙ্গে বেইমানী করেছে শয়তানগুলো!' মাথার যেখানটায় ব্যথা করছে সেখানে হাত দিয়েই গুঙিয়ে উঠল। 'নিশ্চয় ওরা আমাদের পরিচয় জেনে গেছে।···টম, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, আমার জীবন বাঁচালে।···রবিনকে খুঁজে বের করা দরকার।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। টলছে। ঘোরটা কাটানোর জন্যে বার বার মাথা ঝাড়া দিতে লাগল। তারপর টমের সাহায্য ছাড়াই হাঁটার চেষ্টা করে দেখল পারে নাকি। পারছে। 'নদীর কিনার ধরে ভাটির দিকে এগোতে হবে। চলো।'

পানির কিনারে পাথরের ছড়াছড়ি। ঘন ঝোপঝাড়েরও অভাব নেই। বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সব কিছুই। এগোনোটা সহজ হলো না। তবু দমল না ওরা। গর্জন করে বয়ে যাওয়া পানিকে একপাশে রেখে এগিয়ে চলল। হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল কিশোর। মাথার মধ্যে ঘুরছে। দুর্বল লাগছে। কিন্তু থামল না।

আধঘণ্টা পর নদীর একটা বাঁকের কাছে এসে পৌঁছল। পলি পরে তৃতীয়ার চাঁদের মত একফালি চরা তৈরি করেছে। ওটার মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে রয়েছে দুটো নিথর দেহ। দৌড় দিল টম। পেছনে গেল কিশোর। কাছে পৌঁছে দেখা গেল দেহ দুটোর অর্ধেক রয়েছে পানিতে, অর্ধেক বালিতে।

'রবিন!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'রবিন! তুমি নাকি?'

একটা দেহের পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে ততক্ষণে টম। কিশোরও এসে বসল তার পাশে। চাঁদ আছে, তবে জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতা নেই। ভূতুড়ে আলোয় দেহ দুটোকে চিনতে পারল ওরা। একটা রবিনের, আরেকটা বিডের।

গুঙিয়ে উঠল বিড। নড়েচড়ে চোখ মেলল।

রবিনের মুখে মুখ রেখে ফুঁ দিতে শুরু করল কিশোর। পানিতে ডোবা মানুষের চিকিৎসা।

ধীরে ধীরে উঠে বসল বিড। পরিশ্রমে কাহিল।

তাজা অক্সিজেন পেয়ে স্বাভাবিক ভাবে কাজ শুরু করল আবার রবিনের ফুসফুস। চোখের পাতা খুলে গেল। কিশোরের দিকে তাকিয়ে মলিন হাসি হাসল।

'যাক, বেঁচে গেল!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল টম। রবিনের হাত আর পায়ের তালু ডলে ডলে গরম করে দিতে লাগল সে।

মিনিট পনেরো পর রবিন আর বিড কথা বলার অবস্থায় ফিরে এল। বিড জানাল, কিশোর আর রবিন বেরিয়ে আসার পর পরই ওদের ট্রেলারে গিয়েছিল সে। দরজা থেকেই দেখে ওদের জিনিসপত্র ঘাঁটছে কার্ল হ্যারিস। রবিনেব সটকেসে তিন

গোয়েন্দার একটা কার্ড পেয়ে গিয়ে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত গজরাতে শুরু করল। বিডকে দেখতে পায়নি সে।

'ইস্‌সি!' নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল রবিনের। 'সব তো সরিয়ে ফেলেছিলাম, ওটা যে কি করে রয়ে গেল...'

বিড বলতে থাকল, ট্রেলার থেকে বেরিয়ে এল হ্যারিস। গোপনে তার পিছু নিল সে। রব আর আরেকজন লোককে ট্রেলার থেকে ডেকে বের করে এনে জলদি কিশোরদের পিছু নিতে বলল।

'আড়ি পেতে সবই শুনলাম,' বিড বলল। 'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি লোক দুটোকে ঠেকানোর কোন উপায় দেখতে পেলাম না। পিছু নিলাম ওদের।' টমের পানিতে পড়া, কিশোর আর রবিনের পড়ে যাওয়া, লুকিয়ে থেকে সবই দেখেছে সে। কিশোরকে বলল, 'দেখলাম, সাঁতরে গিয়ে তোমাকে ধরে ফেলল টম। আমি ধরতে গেলাম রবিনকে।'

'তোমরা না থাকলে আজ কিশোর আর আমি দুজনেই যেতাম,' কৃতজ্ঞ স্বরে বলল রবিন।

'আমাদের আসল পরিচয় নিশ্চয় ফাঁস হয়ে গেছে গুণ্ডাগুলোর কাছে,' শুকনো গলায় বলল টম। 'ক্যাম্পে আর ফিরে যেতে পারব না। একমাত্র সহায় এখন মুসা। হ্যারিস আর তার গুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগসূত্র এখন ও।'

বালিতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে এরপর কি করবে সে-পরিকল্পনা করতে লাগল চারজনে। আশা করল, মুসা সন্দেহের বাইরে থাকতে পারবে। কিন্তু শত্রুর দলের মাঝে একা থাকাটা ওর জন্যে এখন ভীষণ বিপজ্জনক। পরিস্থিতিটা তাকে জানানো দরকার।

কি করবে ঠিক হয়ে যেতে উঠে পড়ল ওরা। হেঁটে চলল আরও ভাটির দিকে। পুরানো একটা ব্রিজ পেরোল। এগিয়ে চলল ক্যাম্পের দিকে। রবিনের টর্চটা পানি-নিরোধক। পানিতে ভিজে তাই নষ্ট হয়নি। সেটার আলোয় পথ দেখে দেখে এগোল।

মুসা আর বিডের বাংক একই ট্রেলারে। সুতরাং ডেকে আনার ভারটা নিল সে। অন্য তিনজন গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা করতে লাগল।

আস্তে করে ট্রেলারে ঢুকে পড়ল বিড। ঘুমন্ত মুসার মুখ চেপে ধরে কানে কানে বলল, 'খবরদার, কথা বলবে না। আমার সঙ্গে এসো।'

মুখ চেপে ধরা সত্ত্বেও আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় গোঁ-গোঁ করে উঠল মুসা। তবে কথা বাড়াল না। বেরিয়ে এল বিডের পেছন পেছন বাইরের অন্ধকারে। বনের মধ্যে নিয়ে এল যেখানে অপেক্ষা করছে অন্য তিনজন।

কি ঘটেছে সংক্ষেপে সব মুসাকে জানাল ওরা। ঘুম বহুদূরে চলে গেছে এখন তার। বলে উঠল, 'খাইছে! দোজখের দুয়ার দেখে এসেছ তোমরা!...তারমানে আমিই একমাত্র সন্দেহের বাইরে রইলাম। কতক্ষণ থাকতে পারব কে জানে। কার্ডটা যেহেতু দেখেছে, তিন নম্বর গোয়েন্দাটাকে এখন গরু-খোঁজা খুঁজবে ওরা। ক্যাম্পে একা থাকা এখন সাংঘাতিক বিপজ্জনক হয়ে যাবে আমার জন্যে।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল, 'সে-জন্যেই তো ডেকে আনলাম। কি করবে ভেবে

দেখো।'

'ভাবাভাবির কি আছে এতে। থাকব। ধরাটা পড়ি তো আগে। ভাগ্যিস, পুরো নামটাই বদলে নিয়েছিলাম আমি। আসল নামের সঙ্গে কোন মিলই নেই। তোমাদের সঙ্গে এক ট্রেলারে থাকলেও বিপদ হত।'

'ভুলটা আমারই,' তিক্তকণ্ঠে বলল রবিন। 'আরও ভালমত দেখা উচিত ছিল সুটকেসটা।'

'যা হবার হয়ে গেছে,' কিশোর বলল। 'পুরানো কথা ভেবে আর এখন লাভ নেই।'

কি কি করতে হবে মুসাকে বলে দিল সে। জরুরী কিছু জানতে পারলে প্রিন্স হোটেলে যোগাযোগ করে রিচিকে জানিয়ে দেবে। 'রিচির কাছ থেকে সুযোগমত জেনে নেব আমরা,' কিশোর বলল। 'আগের মতই কাজ করে যাবে। চোখকান খোলা রাখবে।'

'গুড-বাই' জানিয়ে বিদায় নিল মুসা। তার সঙ্গে ক্যাম্পে গেল আবার বিড। কিশোররা যে ট্রেলারে থাকত তার নিচে লুকানো দূরবীন, রেডিও আর দড়িটা নিয়ে আসার জন্যে। মুসা তার ট্রেলারে ঢুকতে যাবে, এ সময় বিড জিজ্ঞেস করল, 'খাবার-টাবার কিছু আছে তোমার কাছে?'

রেডি স্টক সব সময়ই কিছু না কিছু থাকে মুসার কাছে। কাছাকাছি দোকান-পাট নেই এখানে যে প্রয়োজন হলেই গিয়ে কিনে নিয়ে আসবে। 'আছে।'

'দেবে?'

মুচকি হেসে ভেতরে ঢুকে গেল মুসা। বেরিয়ে এল একটা কাগজের ব্যাগ নিয়ে। 'নাও, রুটি আর পনির আছে এতে। আমার সমস্ত স্টক দিয়ে দিলাম। এ উপকারের কথা মনে রেখো কিন্তু।'

হাসল বিড। 'বিদেশ-বিভুঁইয়ে মুসা আমান তার খাবার হাতছাড়া করেছে, এতবড় কথাটা কি ভোলা যায়।...কিন্তু সব দিলে কেন? কিছুটা রেখে দাও।'

'না না, নিয়ে যাও। সকাল হলেই তো পেয়ে যাব আমি। বনের মধ্যে তোমরাই কিছু জোগাড় করতে পারবে না।'

জিনিসপত্র নিয়ে কিশোরদের কাছে ফিরে এল বিড। ঘুরে রওনা হলো ওরা। বনের গভীর থেকে গভীরে ঢুকে যেতে লাগল। সেই জায়গাটায় চলে এল যেখানে আকাশে গোলাপী আলো দেখে গিয়েছিল আগের রাতে কিশোর আর রবিন। থামল ওরা। রেডিওতে বোরিসের সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছে।

সব শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল বোরিস। ভয় পেয়ে গেল।

'এখন আর ভয় নেই,' কিশোর বলল। 'ওদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে চলে এসেছি আমরা।' বোরিসকে অনুরোধ করল ওয়াইল্ড টাউন পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে। নেমর আর হাসপাতালে তাকে দেখতে যাওয়া ভিজিটরদের ওপর যাতে কড়া নজর রাখে পুলিশ।

'হো-কে!' জবাব দিল বোরিস। 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ সব নজর রাখারাখির মধ্যে না গিয়ে দলটাকে পাকড়াও করে ফেলাই ভাল।'

কিশোর বলল, আগে পালের গোদা অর্থাৎ 'ব্যারন'টাকে খুঁজে বের করা

দরকার। তাকে বাদ দিয়ে বাকিদের ধরলে লাভ হবে না। তা ছাড়া ব্রিজ স্যাবটাজের পেছনে কারণটা কি, সেই রহস্যও ভেদ করতে হবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপেক্ষা করতে রাজি হলো বোরিস। বার বার সাবধান করল অহেতুক ঝুঁকি না নেয়ার জন্যে। রাশেদ পাশার খবর জানাল, ভাল, উন্নতি হচ্ছে; তবে স্মৃতিশক্তি এখনও ধোঁয়াটে। আর ড্যান ক্লকাসও এখনও মুখ খোলেনি পুলিশের কাছে।

'রাখি এখন, বোরিসভাই। যোগাযোগ রাখব,' কিশোর বলল।

'হো-কে! ওভার অ্যান্ড আউট!'

'এরপর কি?' কিশোর রেডিওর সুইচ অফ করে দিতে জিজ্ঞেস করল টম।

'আপাতত বিশ্রাম,' কিশোর বলল। 'সকালে উঠে ব্যারনের সন্ধানে বেরোব।'

ওর কথা শেষও হলো না, ভোঁতা, ভারী একটা বিস্ফোরণের শব্দ ভরে দিল বাতাস।

'ডিনামাইট!' চিৎকার করে উঠল বিড।

সতেরো

বিস্ফোরণের পর পরই দেখা গেল গোলাপী আলো। অরোরা বোরিয়ালিসের মত ছড়িয়ে পড়ল দিগন্তে। পাঁচ মিনিট রইল সেই আলোর আভা, তারপর মিলিয়ে গেল।

'ওটাই রসি,' কিশোর বলল। নেমরের সঙ্গে আলোচনার কথা মনে পড়ল। 'আমার ধারণা, স্থানীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাহাড়ীদের ভয় দেখিয়ে দূরে রাখার জন্যেই এই চালাকি করছে কেউ।'

'চালাকির দরকারটা কি?' টমের প্রশ্ন।

'কিছু তো একটা করছেই। সেটা যাতে কেউ গিয়ে দেখে না ফেলে, সেজন্যে তাদের ভয় দেখাচ্ছে।'

'সেই কিছুটা যে কি, জানতে পারলে হত!' রবিন বলল।

'লোকগুলো, বিশেষ করে তাদের দলনেতা ভয়ঙ্কর লোক,' কিশোর বলল। 'আমাদের দিয়েই সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। নির্দ্বিধায় একরাতে শেষ করে দিতে চাইল তিনজনকে। কেউ বেইমানী করলে কিংবা আদেশ অমান্য করলে তার ভাগ্যে কি জুটবে অনুমান করতে কষ্ট হয় না।'

'ব্রিজ আর রাস্তা তৈরির সঙ্গে এই রসির কি কোন সম্পর্ক আছে?' কিশোরের দিকে তাকাল বিড। 'কিশোর, কি মনে হয় তোমার?'

'আছে,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে বিস্ফোরণের শব্দটা অবাক করেছে আমাকে। ডিনামাইটের মত মনে হয়নি।...কথা অনেক হলো, এখন ঘুমানো দরকার। কাল বেরোব রসিকে খুঁজতে।'

গোলাপী আভা পুরোপুরি মিলিয়ে গেছে। গাছের জটলার একটা আড়াল খুঁজে নিল ওরা, যার মধ্যে ঢুকে থাকলে সহজে কারও চোখে পড়বে না। মাটিতে ঝরা

পাতার পুরু কার্পেট। নরম বিছানার কাজ দেবে। শুয়ে পড়ল সবাই। মিনিটখানেকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

চোখে রোদ পড়তে সবার আগে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। হাই তুলতে তুলতে উঠে বসল। জাগাল অন্য তিনজনকে।

'সারাটা দিন ঘুমাতে পারতাম আজ,' বিড বলল। উঠে দাঁড়িয়ে পেশীর আড়ষ্টতা কাটানোর চেষ্টা করতে লাগল সে।

'ঘুমালে আর রসিকে খুঁজতে যেতে হবে না,' রবিন বলল।

কয়েক মিনিট ঘোরাঘুরি করে পরিষ্কার পানির একটা ঝর্ণা খুঁজে বের করল বিড। হাতমুখ ধুয়ে এসে নাস্তা সেরে পেট পুরে পানি খেয়ে নিল ঝর্ণা থেকে। কিশোর আর রবিন আলোচনা করে ঠিক করল, পাহাড়ের দিকের সেই পায়েচলা পথটা ধরে এগোবে যেটা দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। অদ্ভুত গোলাপী আলোটা ওদিকেই দেখা যায়।

ঢাল বেয়ে একসারিতে উঠতে শুরু করল ওরা। ভালুকের গুহার পাশ কাটিয়ে এল দূর দিয়ে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রবিন। আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, 'কিশোর, দেখেছ!'

সবাই তাকাল। পাহাড়ের চূড়ার দিকে।

টম জিজ্ঞেস করল, 'কি দেখেছ?'

'ওই যে, মাঝের সবচেয়ে উঁচু পাইন গাছটা। গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে থাকো।'

মুহূর্ত পরে সবারই চোখে পড়ল জিনিসটা। উজ্জ্বল কোন কিছুতে রোদ পড়ে ঝিক করে উঠেছে।

'দূরবীন!' বুঝে ফেলল কিশোর।

'বলে কি!' চমকে গেল বিড। 'প্রহরী। তারমানে কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে দলের আস্তানা।'

পাহারা বসানোর উপযুক্ত জায়গা ওই গাছটা, সবাই একমত হলো এ ব্যাপারে। দূরবীন হাতে ওই গাছের মাথায় বসে থাকলে সমস্ত উপত্যকাটা নজরে আসবে। নতুন যে রাস্তাটা বানানো হয়েছে, সেটাও দেখতে পাবে। পায়েচলা যে পথটা ধরে এসেছে ওরা, সেটা দেখতে পাওয়াও বিচিত্র নয়।

রাস্তায় থাকার আর সাহস পেল না কিশোর। সরে গেল গাছের আড়ালে। গাছপালার আড়ালে থেকে রাস্তার ধার দিয়ে এগোল আবার ওরা।

'কাছে গেলে গাছটা খুঁজে বের করা সহজ হবে না,' কিশোর বলল।

তার অনুমান ঠিক। কাছে গিয়ে গাছটা আলাদা করে চিনতে পারল না। বকের মত গলা বাড়িয়ে দিয়ে খুঁজতে শুরু করল সবাই।

'আমরা পাচ্ছি না,' রবিন বলল, 'তারমানে ওই লোকটাও আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। এটা একটা বিরাট সুবিধা আমাদের জন্যে।'

কিশোরের মনে হলো বেশি দক্ষিণে সরে চলে এসেছে। বলল, 'শৈলশিরা ধরে উত্তরে যাওয়া দরকার আরও।'

ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করল ওরা। পাইন গাছ অনেকেই আছে, কিন্তু সেই

বিশেষ পাইনটা আর চোখে পড়ে না।

বেশ খানিকটা দূরে চলে গিয়েছে টম। ওখান থেকে পাগলের মত হাত নাড়তে শুরু করল। ঠোঁটে আঙুল রেখে শব্দ না করতে ইশারা করছে।

দ্রুত তার কাছে এগিয়ে গেল সবাই। অনেক উঁচু একটা পাইনের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। গাছের ছালে একটা অদ্ভুত কাটা চিহ্ন দেখাল টম। ওর মাথার সামান্য ওপরে।

'আরি!' বলে উঠল রবিন, 'এ তো সেই পেঁচানো অক্ষর!'

কিশোরও দেখল। সেই চিহ্নটা। প্রথম মেসেজটাতে সই করা অক্ষরটার মত।

'এটাই আমাদের গাছ। গাছটাকে যাতে সহজে চিনতে পারে নিজেরা, সে-জন্যে চিহ্ন দিয়ে রেখেছে,' ফিসফিস করে বলল সে। ঘুরে কাণ্ডের অন্যপাশে চলে এল। 'দেখে যাও, কি পেয়েছি!'

একটা বিশেষ দূরত্ব পর পর গাছের গায়ে বড় বড় গজাল মারা। ওতে পা রেখে গাছ বেয়ে ওঠা সহজ হবে। গাছের ওপরটা ঘন ডালপাতায় ছাওয়া।

আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছে টমের। 'গাছে আটকা পড়েছে বন বেড়াল। উঠে গিয়ে চলো ধরি।'

'অত সহজ হবে বলে মনে হয় না,' বিড বলল। 'গাছের ডালে ধস্তাধস্তি করতে গেলে ঝুঁকিটা আমাদের জন্যেও কম হবে না।'

রবিন আর কিশোরও একমত হলো তার সঙ্গে। ওরা উঠতে গেলে দেখে ফেলবে লোকটা। ওপরে থাকাতে সুবিধেটা সে বেশি পাবে। নিচের লোককে পা দিয়ে ঠেলে ফেলাটা তার জন্যে সহজ। তা ছাড়া আরও একটা কাজ করতে পারে—আলোর ঝিলিকের সাহায্যে মেসেজ পাঠিয়ে সতর্ক করে দিতে পারে দলের লোককে।

'এক লোক চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিতে পারবে না,' কিশোর বলল। 'কখনও না কখনও প্রহরী বদল করতেই হবে। ওকে ধরার একমাত্র উপায় এখন আমাদের অপেক্ষা করা।'

গাছটার পাঁচ গজের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে একেকজন একেক জায়গায় লুকিয়ে পড়ল ওরা। অপেক্ষা করতে লাগল। বেশ কয়েকবার পাখির মিষ্টি কিচির-মিচির আর রোদের উষ্ণতার আরামে ঝিমুনি এসে যাচ্ছিল সবারই। গড়িয়ে গড়িয়ে চলল সময়।

চোখ ডলে ডলে ঘুমটা দূরে রাখল কিশোর। পাইনের ছোট্ট এক টুকরো বাকল পড়তে দেখে ওপরে তাকাল সে। অনেক ওপরে ডাল নড়তে দেখল। নিচে নামছে লোকটা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। ইঙ্গিত করল সঙ্গীদের। সবাই দৌড়ে এসে কতগুলো চারাগাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। এক জোড়া পা নেমে এল চোখের সামনে। গজালে ভর করে নামছে। কয়েক ফুট ওপর থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামল লম্বা একটা ছেলে। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে চারদিক থেকে ছেলেটাকে চেপে ধরল ওরা।

'নরম্যান হেগ!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

আতঙ্ক দেখা দিল ছেলেটার চোখে। মোড়ামুড়ি করে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। পারল না।

'ওখানে কি করছিলে তুমি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'লং নিটের কাজ দেয়া হয়েছিল ওকে,' রবিন বলল, 'মনে নেই তোমার?'

'তোমরা···তোমরা জানো!' ভয়ে গলা কেঁপে উঠল হেগের।

'জানি,' জবাব দিল কিশোর। 'হেলিক্স কি, তা-ও জানি। আরও অনেক কিছু জানি।'

অনুনয় করে বলল হেগ, 'দেখো, অনেক কিছু জেনে ফেলেছ তোমরা। এখান থেকে পালাও। চলে যাও। কোনদিন আর এসো না।'

'আমরা এখানেই থাকব,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'এর শেষ দেখে তবে যাব।'

'প্লীজ! দোহাই তোমাদের! না গেলে···তোমাদের পরিণতিও সেই ভদ্রলোকের মত হবে। রাশেদ পাশা।'

রাশেদ পাশা! বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন ওদের শরীরে।

'তুমি আমার চাচার কথা কি জানো?' রুক্ষ হয়ে উঠল কিশোরের কণ্ঠ।

'ওর এই অবস্থার জন্যে তুমিও দায়ী নাকি?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল হেগ। তবে রাশেদ পাশার সম্পর্কে আর কিছু বলল না।

টম আর বিডের ইচ্ছে, ধরে নিয়ে গিয়ে ওয়াইল্ড টাউন পুলিশের হাতে হেগকে তুলে দেয়। কিন্তু অনুনয় করতে থাকল হেগ, যাতে ওরা তা না করে।

'বস্ যদি জানতে পারে আমাকে ধরে নিয়ে গেছ তোমরা,' হেগ বলল, 'আমার বাবার ওপর অত্যাচার করবে।'

'কে তোমাদের বস্?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ব্যারন?'

ছাই হয়ে গেল হেগের মুখ। 'সে-কথা তোমাদের বলতে পারব না আমি।'

'কি মনে করেছ তুমি?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'এত সহজে তোমাকে ছেড়ে দেব?'

'না, তা ভাবছি না, বিশ্বাস করো!' মরিয়া হয়ে বলল হেগ। 'ওই শয়তানগুলোর জন্যে কাজ করার কোন ইচ্ছেই নেই আমার। কিন্তু ওদের সম্পর্কে কোন কথা যদি বলি, আর ওরা জানতে পারে, সোজা খুন করবে আমাকে।'

বার বার কসম খেয়ে বলতে থাকল সে, কিশোর আর তার বন্ধুদের এখানে আসার খবর কাউকে জানাবে না সে। দুদিক থেকে ওর দুই হাত পেঁচিয়ে ধরে আটকে রাখল টম আর বিড। রবিনকে খানিক দূরে ডেকে নিয়ে গেল কিশোর আলোচনা করার জন্যে।

ফিরে এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। কিশোর বলল, 'হেগ, আমরা তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের যে এখানে দেখেছ, এ কথা কাউকে বলতে পারবে না।'

রবিন একটা প্রশ্ন করল, 'রসির ব্যাপারটা কি বলো তো?'

আবার আতঙ্ক দেখা দিল হেগের চোখে। চুপ করে রইল সে। বোঝা গেল, এ সম্পর্কে কোন কথা বলারই সাহস হচ্ছে না তার। আর চাপাচাপি না করে রাস্তার কথা জেনে নিল কিশোর। জানতে পারল পাহাড়ের উল্টো দিক থেকে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে ওয়াইল্ড টাউনের দিকে।

'দেখো, আবারও অনুরোধ করছি তোমাদের,' হেগ বলল, 'ভাল চাও তো আর এদিকে এসো না। সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যাবে।'

ঝোপের মধ্যে একটা শব্দ হলো। চট করে গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল চারজনে। শব্দ লক্ষ্য করে দ্বিধাহীন ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল হেগ। ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রব ব্রোকার। পরস্পরের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল। তারপর দ্রুত পায়েচলা পথ ধরে নেমে গেল হেগ। রব এসে গজালে ভর করে গাছে চড়তে শুরু করল।

'এ ব্যাটাকে কি করা যায়?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল টম।

'এখনও কিছু করা যাবে না,' কিশোর বলল। 'ব্যারন সতর্ক হয়ে যাবে তাহলে।'

'হেগের কথা বিশ্বাস করেছ?' রবিন বলল, 'আমি কিন্তু করেছি। সত্যিই সে শয়তান লোকগুলোর খপ্পরে পড়েছে।'

রবের ওপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা। তারপর পা বাড়াল আবার রসির সন্ধানে। পাহাড়ের উল্টো পাশের ঢালে এসে আগে আগে ছুটে চলল টম। তার ঠিক পেছনে রইল রবিন।

আচমকা চিৎকার করে উঠে রবিনের চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল টম।

আঠারো

ব্রেক কষে নিজেকে দাঁড় করিয়ে ফেলল রবিন। গভীর একটা গর্তে পড়া থেকে বেঁচে গেল। গর্তের নিচে পড়ে গোঙাতে লাগল টম।

রবিনকে সাহায্য করতে ছুটে গেল কিশোর আর বিড। তিনজনে মিলে টেনে তুলল টমকে।

'আউ! আমার গোড়ালিটা গেছেরে বাবা! ভেঙে তিন টুকরো!'

আহত জায়গাটা টিপেটুপে দেখল কিশোর। 'না ভাঙেনি। তবে মচকেছে ভালমত। দাঁড়াতে পারো নাকি দেখো তো।'

দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে নাকমুখ কুঁচকে ফেলল টম। পড়েই যাচ্ছিল উপুড় হয়ে।

'শয়তানি বুদ্ধি করে রেখেছে কেউ!' রবিন বলল।

গর্তটা নতুন খোঁড়া হয়েছে। লতা, পাতা আর ডাল দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, যাতে কিছু বোঝা না যায়।

কিশোর অনুমান করল, রসির খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। অনাহূত কাউকে বিপদে ফেলে অনাগ্রহী করার জন্যেই এই ফাঁদের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।

আলোচনায় বসল ওরা। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টমকে রকি বীচে ফেরত পাঠাতে হবে।

'ওয়াইল্ড টাউন এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে তুলে দেব তোমাকে,' রবিন বলল। 'রিচি যাবে তোমার সঙ্গে। এসো তো এখন, ওঠো, আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াও।'

দুদিক থেকে ধরে ধরে টমকে নিয়ে চলল ওরা। কখনও কিশোর আর রবিন, কখনও কিশোর ও বিড, আবার কখনও বা রবিন ও বিড–এ ভাবে পালা করে কাঁধ পেতে দিয়ে ওকে নিয়ে চলল। বহু কষ্টে নিয়ে আসা হলো ওকে ওয়াইল্ড টাউনে যাওয়ার রাস্তার ওপর। বেশি চওড়া না রাস্তাটা। কোনমতে দুটো গাড়ি পাশ কাটাতে পারে।

'গাড়িঘোড়া তো কিছুই দেখছি না,' হতাশ কণ্ঠে বিড বলল। 'লিফট পেতে সারাটা দিনই না লেগে যায়।'

আরেকবার টমের পা'টা পরীক্ষা করল কিশোর। সাংঘাতিক ফোলা ফুলেছে। পায়ের ভারী বুটটা খুলে দিল। চাকার শব্দ শোনা গেল এ সময়। মুখ তুলে তাকাল কিশোর। সিকি মাইল দূরের একটা ফার্ম হাউস থেকে ঢাল বেয়ে নেমে আসতে দেখল একটা ঘোড়ায় টানা গাড়িকে। মালবাহী গাড়ি। শুয়োর বয়ে আনছে অনেকগুলো।

কৃষক শ্রেণীর লোক মনে হলো গাড়ি চালাচ্ছে যে লোকটা তাকে। ছেলেদের ডাকাডাকিতে গাড়ি থামাল। লম্বা, ছিপছিপে, পাতলা মুখ। চওড়া কানাওয়ালা হ্যাটের নিচে আংশিক চোখে পড়ছে চেহারাটা।

'ওয়াইল্ড টাউন যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

'আমাদেরকে একটা লিফট দেবেন? ওর নাম টম। পা মচকে ফেলেছে।'

'গাড়িতে জায়গা নেই।'

'প্লীজ, মিস্টার…'

'হেগ।' এক আঙুল দিয়ে হ্যাটের কানা ঠেলে সামান্য উঁচু করল লোকটা।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। স্থির দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ছুঁড়ে দিল প্রশ্নটা, 'আপনি নরম্যান হেগের বাবা না তো?'

প্রশ্নটা অবাক করল মিস্টার হেগকে। 'তুমি তাকে চেনো?'

'চিনি।' নরম্যানের বাবার সঙ্গে এ ভাবে রাস্তায় দেখা হয়ে যাবে কল্পনাও করেনি কিশোর। তবে কাকতালীয় ঘটনা ঘটে পৃথিবীতে। 'ব্যারনের হয়ে কাজ করছে ও।'

'তোমরাও ওদের দলের নাকি!' ভীত মনে হলো মিস্টার হেগকে। ঘোড়ার পিঠে বাড়ি মারার জন্যে চাবুক তুলল।

তাড়াতাড়ি বাধা দিল কিশোর, 'এক মিনিট, মিস্টার হেগ। আমরা ব্যারনের দলের লোক নই। আপনি জানেন কে সে? কোথায় লুকিয়ে আছে?'

অস্থির হয়ে উঠল মিস্টার হেগ। 'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, ব্যারন একটা অতি খারাপ লোক।…ঠিক আছে, তোমরা তিনজন গিয়ে পেছনে ওঠো।' টমকে দেখিয়ে বলল, 'এই ছেলেটাকে আমার পাশে তুলে দাও।'

ঠেলেঠুলে মিস্টার হেগের পাশে টমকে তুলে দিল ওরা। নিজেরা গিয়ে উঠল পেছনে শুয়োরের সঙ্গে। তবু ভাল যে চাকাওয়ালা একটা যান পাওয়া গেছে। কোনমতে ওয়াইল্ড টাউনে পৌঁছা নিয়ে হলো কথা। চলতে শুরু করল গাড়ি।

'এ এলাকায় কি করতে এসেছ তোমরা?' মিস্টার হেগ জিজ্ঞেস করল। 'জায়গাটা তো ভাল না।'

'আপনার ছেলে আমাদের বলেছে সে-কথা,' জবাব দিল কিশোর। 'রসিকে খুঁজছি আমরা।'

'শয়তান নিজে নরক থেকে বেরিয়ে এসে ওই আগুন জ্বালে!' ভীত স্বরে বলল মিস্টার হেগ।

প্রশ্ন করে করে জানা গেল ওই 'আগুনের' কাছে গিয়ে বেশ কয়েকজন লোক আর ফিরে আসেনি। 'একজন বিদেশী সহ!' যোগ করল মিস্টার হেগ। 'শুনলাম, লোকটা নাকি গোয়েন্দা, তদন্ত করতে এসেছিল।'

কান খাড়া হয়ে গেছে কিশোরের। কিন্তু আবার প্রশ্ন করতে গিয়েও থেমে গেল। একটা জীপ চোখে পড়ল। উল্টোদিকে মাইলখানেক দূরে পাহাড়ের কোল থেকে নেমে আসছে। দূরবীন চোখে লাগিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল রবিন।

'আসছে, বিপদ,' ঘোষণা করল সে। 'চারজন গুণ্ডা চেহারার লোক। শিওর, ওরা ব্যারনের লোক।'

একটা মুহূর্ত দেরি করল না কিশোর, টমের কাঁধ চেপে ধরল। অন্য দুজনকে বলল তাকে সাহায্য করতে। তিনজনে মিলে টমকে নিয়ে এল পেছনে। সব ক'জন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল শুয়োরগুলোর মাঝে, ওয়াগনের মেঝেতে। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে লাগল শুয়োরগুলো। নির্দ্বিধায় চোখা খুর দিয়ে মাড়ানো শুরু করে দিল ওদের।

'বাপরে বাপ, কি দুর্গন্ধ!' বমি ঠেলে আসতে লাগল রবিনের।

'চুপ!' কথা বলতে নিষেধ করল কিশোর। 'গাড়িটা এসে গেছে!'

ব্রেক কষে টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে থেমে গেল জীপ। মিস্টার হেগও গাড়ি থামাল।

'হেই বুড়ো,' কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ, 'কয়েকটা ছেলেকে যেতে দেখেছ? চারজন।'

'চারটে শুয়োর হবে কেন! ন'টা। গুনতেও পারো না।'

'শুয়োর না শুয়োর না, চারটে ছেলেকে খুঁজছি আমরা। আমাদেরই শ্রমিক ছিল। বেতনের টাকা সব চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।'

'পালাতে যাব কেন? আমি কি চোর? শুয়োর নিয়ে বাজারে যাচ্ছি বেচতে।'

'আরে, এই বুড়ো শুয়োরটা তো একেবারেই কানে শোনে না!' গজগজ করতে লাগল লোকটা। 'এই চালাও, চালাও, নেই এ গাড়িতে।'

চলে গেল জীপ। তারও অনেকক্ষণ পর মাথা তুলল ছেলেরা। শুয়োরের পায়ের তলা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

'থ্যাংকস, মিস্টার হেগ,' কিশোর বলল। 'বাঁচিয়ে দিলেন আমাদের। একটা কথা বিশ্বাস করুন, ওরা মিথ্যে কথা বলে গেছে, আমরা চোর নই।'

'জানি।'

একটা সরু নদীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মিস্টার হেগকে থামতে বলল কিশোর। নিজেরা নেমে গিয়ে হাত-মুখ থেকে শুয়োরের নোংরা ধুয়ে এল। পানি

এনে ভিজিয়ে দিল টমের ফুলে ওঠা পা।

অবশেষে এয়ারপোর্টে পৌঁছল গাড়ি। মিস্টার হেগকে 'অসংখ্য ধন্যবাদ' জানাল ওরা।

'চিন্তা করবেন না, মিস্টার হেগ,' কিশোর বলল। 'আপনার ছেলে ঠিকই থাকবে। ফিরে গিয়ে ওকে সাহায্য করব আমরা। তবে আমাদের ব্যাপারে কারও কাছে এখন টুঁ শব্দটি করবেন না।'

কাউকে কিছু বলবে না, কথা দিল হেগ। গাড়ি থেকে নেমে এল গোয়েন্দারা। টমকে ধরে ধরে নিয়ে রওনা হলো টার্মিনাল বিল্ডিঙের দিকে। রিচিকে ফোন করল রবিন। হোটেলের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্টে চলে আসতে বলল।

খিদে পেয়েছে সবারই। বহুক্ষণ পেটে কিছু পড়েনি। লাঞ্চ কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

একেকজনে তিনটে করে বার্গার খেয়ে যখন শেষ করেছে, সে-সময় ট্যাক্সি থেকে নেমে ওদের দিকে দৌড়ে এল রিচি। ওদের কাহিনী শোনার পর বলল, 'আমার কাছেও খবর আছে।'

হোটেলে চারজন সন্দেহজনক লোকের ওপর নজর রেখেছিল সে। 'হোটেলের বেলম্যানের কাছে "হেলিক্স" বলে পাসওয়ার্ড দিতে শুনেছি ওদের।'

পকেট থেকে একটা কাগজ টেনে বের করল। পেন্সিল দিয়ে চারজনের চেহারার ছবি এঁকে রেখেছে।

দেখেটেখে রবিন তাকাল কিশোরের দিকে, 'ওই চারজনই হবে, বুঝলে। পথে জীপে করে এসে যারা আমাদের খোঁজ করেছিল।'

'রেখে দাও,' কিশোর বলল। 'কাজে লাগবে।'

পকেটে রেখে দিল রবিন।

রিচিকে জানানো হলো টমের সঙ্গে তাকে রকি বীচে ফিরে যেতে হবে। রিচি জিজ্ঞেস করল, 'প্লেন ভাড়ার টাকা পাব কোথায়? পকেটে যা আছে, তাতে কিছুই হবে না।'

'আগে যাও, পরে ভাড়া দিও,' কিশোর বলল। 'পাইলটকে আমি বলে দিচ্ছি কোনখান থেকে টাকা নিতে হবে।'

বাকিতে নিয়ে যাওয়ার মত একজন পাইলট জোগাড় করতে অসুবিধে হলো না। তাকে বলে দিল কিশোর, বোরিসের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে নিতে। পাইলট রোভারের ভাই বোরিসকে চেনে পাইলট। রাজি হলো।

টম আর রিচিকে রওনা করিয়ে দিয়ে সোজা ওয়াইল্ড টাউন থানায় চলে এল দুই গোয়েন্দা আর বিড। সেখানে খোঁজ নিল, নেমরের সঙ্গে হাসপাতালে কেউ দেখা করতে এসেছিল কিনা। লেফটেন্যান্ট ডারবি নামে একজন ডিউটি অফিসার জানাল, একটা মাত্র লোক নাকি দেখা করতে এসেছিল, একেবারেই নিরীহ চেহারার। 'বলল, নেমর তার দূর সম্পর্কের ভাই।'

'ওর পেছনে লোক লাগিয়েছিলেন?' বিড জানতে চাইল।

লাগানো হয়েছে, জানাল অফিসার। একজন পেট্রলম্যান ছায়ার মত লেগে ছিল

লোকটার পেছনে। ওয়াইল্ড টাউন শহরের শেষ প্রান্তে একটা ছাউনিতে ঢুকতে দেখেছে লোকটাকে।

'তাতে আমাদের মনে হয়েছে, ও সাধারণ একটা ভবঘুরে,' ডারবি বলল। 'আর বিশেষ মাথা ঘামাইনি ওকে নিয়ে।'

ছাউনিটা কোনখানে জেনে নিয়ে, অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ছাউনিটা দেখতে চলল। আশেপাশে আবর্জনার স্তূপ। শহরের সমস্ত ময়লা এনে ফেলা হয় এখানে। ছাউনিটা তৈরি করা হয়েছে প্যাকিং বাক্স আর ফেলে দেয়া পুরানো বেড়ার কাঠ দিয়ে। টিনের চালা। তবে এত বেশি পুরানো আর ফুটোফাটা, বৃষ্টির সময় ঘরে-বাইরে সমানেই পানি পড়ে বোধহয়।

কোন জানালা নেই। একটামাত্র নড়বড়ে দরজা। সেটার কাছে এসে কান পাতল কিশোর। কোন শব্দ শোনা গেল না। আস্তে করে দরজাটা খুলল সে। ভেতরে পা রাখল তিনজনে।

'উহ্, জঘন্য!' নাক কুঁচকাল বিড। 'এরমধ্যে মানুষ থাকতে পারে নাকি!'

ঘরের মেঝেতে অসংখ্য খালি বোতল, টিনের ক্যান গড়াগড়ি খাচ্ছে। একধারে স্তূপ হয়ে আছে পুরানো খবরের কাগজ।

দেরি না করে কাজে লেগে গেল কিশোর আর রবিন। রহস্যময় লোকটার সত্যিকারের পরিচয় জানার জন্যে জঞ্জালের মধ্যে সূত্র খুঁজতে শুরু করল। ছেঁড়া, বিবর্ণ একটা ম্যাট্রেস পড়ে আছে মেঝেতে। একটা ধার উঁচু হয়ে আছে। তলায় কিছু একটা আছে। হাত ঢোকাতে রবিনের হাতে ঠেকল একটা ব্রীফকেসের হ্যান্ডেল। টেনে বের করতে যাবে, পায়ের শব্দ হলো বাইরে।

'লোকটাই বোধহয়,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'লুকিয়ে পড়ো।'

কতগুলো বাতিল বাক্সের আড়ালে বসে পড়ল ওরা। এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ। ছাউনির চারপাশে চক্কর দিল। ধীরে ধীরে খুলে যেতে শুরু করল বন্ধ দরজাটা।

'এই, নেই রে!' রিনরিন করে উঠল একটা উল্লসিত বালক-কণ্ঠ, 'আজও আসেনি লোকটা।'

'খুব ভাল হয়েছে,' বলল আরেকটা প্রায় একই রকম কণ্ঠ, 'আজ আমরা গোয়েন্দা-গোয়েন্দা খেলতে পারব।'

বাক্সের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কিশোররা। দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছিল অল্পবয়েসী দুটো ছেলে। ওদের দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠে দৌড় মারল।

'আই, শোনো শোনো,' পেছন থেকে ডাক দিল রবিন, 'আমরা তোমাদের কিছু করব না।'

দাঁড়িয়ে গেল ছেলে দুটো। আশঙ্কা যাচ্ছে না। সাবধানে ঘুরে তাকাল। দুটোর মধ্যে বড়টা–বয়েস দশ বছর হবে–ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা ডাকাত-টাকাত নও তো?'

'না না, ডাকাত হব কেন। তোমার নাম কি?'

'পল বারম্যান।' জানা গেল সঙ্গের ছেলেটা তার ভাই। তিন বছরের ছোট। ওর

নাম জুল। 'সেভেনথ স্ট্রীটে থাকি আমরা।'

এখানে কেন এসেছে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, খেলার জায়গা হিসেবে ছাউনিটা ওদের খুব পছন্দ। তবে নিশ্চিন্তে খেলতে পারে না। মাঝে মাঝে বিশ্রী চেহারার একটা লোক এসে ঢুকে বসে থাকে। দেখলেই তাড়া করে।

'ও একটা পাগল!' জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে জুল বলল। 'কোনদিন শেভ করতে দেখি না।'

'ঠিক আছে, খেলো তোমরা,' কিশোর বলল। 'কেউ বাধা দিতে আসবে না।'

ম্যাট্রেসের নিচ থেকে গিয়ে ব্রীফকেসটা টেনে বের করে নিয়ে এল রবিন। সাহস পেয়ে পল আর জুল গিয়ে ঘরে ঢুকল।

কতগুলো গাছের নিচে ছায়ার মধ্যে এসে থামল ওরা।

'দেখি,' হাত বাড়াল কিশোর, 'কি আছে ভেতরে।'

ব্রীফকেসটা তার হাতে তুলে দিল রবিন।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভালমত দেখতে লাগল কিশোর। দুই কিনার পুড়ে গেছে ব্রীফকেসটার। আর যেখানটায় সাধারণত নামের আদ্যক্ষর লিখে রাখে লোকে, সেখানে লেগে আছে শুকনো কাদা।

পকেট থেকে ছুরি বের করে কাদা চেঁছে ফেলে দিল কিশোর। স্পষ্ট হয়ে উঠল দুটো অক্ষর : আর· পি·!

উনিশ

'চাচার ব্রীফকেস!' প্রায় চিৎকার করে উঠল কিশোর। তাড়াতাড়ি ডালা তুলে ভেতরে তাকাল। খালি কেস, শুধু তলার দিকে এক জায়গায় সাদা সাদা জিনিস লেগে আছে। 'লাইমস্টোন!'

ছাউনিটার দিকে দৌড় দিল সে। আবার ঢুকল ভেতরে। ছেলে দুটো খেলা করছে। 'পাগল'টা সম্পর্কে ওদের প্রশ্ন করল। চেহারা কেমন জানতে চাইল। কিন্তু ভাল করে বলতে পারল না ছেলে দুটো। চেহারার বর্ণনা অস্পষ্ট।

'আমাদের দেখলেই "ভাগ" বলে চেঁচিয়ে ওঠে,' পল বলল। 'জুল আর আমি দিই দৌড়।'

'দেখলেই ভয় লাগে ওকে আমার,' জুল বলল। 'পেছন ফিরে তাকাই না আর।'

পকেট থেকে রিচির দেয়া কাগজটা বের করল রবিন। ছবিগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এদের কারও মত?'

দেখল জুল আর পল। মাথা নাড়ল।

'ঠিক আছে,' কিশোর বলল, 'আবার যদি আসে লোকটা, তোমাদের তাড়া করে, আমাদের খবর দেবে। প্রিন্স হোটেলে থাকি আমরা। পারবে তো? ফোন করে

জিজ্ঞেস করবে কিশোর, রবিন বা বিড আছে কিনা।'

'তোমরা কি গোয়েন্দা নাকি?' ফস করে জিজ্ঞেস করল পল।

'কেন, সে-রকম লাগে?' হাসল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল পল।

'হ্যাঁ, আমরা গোয়েন্দাই,' রবিন বলল।

'বা-বা, কি মজা!' হাততালি দিয়ে উঠল পল। 'আসল গোয়েন্দা দেখার বড় ইচ্ছে আমার। কি করে কাজ করে ওরা, জানতে ইচ্ছে করে।'

জুল জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের দেখাবে?'

'দেখাব,' রবিন বলল, 'যদি সুযোগ পাই।'

ছেলেগুলোকে ওখানে রেখে, শহরে ফিরে চলল কিশোররা। আবার ঢুকল থানায়। ছাউনিতে কি পেয়েছে জানানোর জন্যে। লেফটেন্যান্ট ডারবি তখনও ডিউটিতে আছে। তাকে সব কথা জানিয়ে, ব্রীফকেসটা তার কাছে রাখার অনুরোধ জানাল কিশোর।

ওদের তদন্তের রিপোর্ট লিখে নিয়ে ডারবি বলল, ভবঘুরেটাকে ধরার জন্যে লোক লাগাবে এখনই। 'আমার ধারণা তোমার চাচার ব্রীফকেসটা কোনখানে কুড়িয়ে পেয়েছে আধপাগলটা। চুরি করেনি।'

একমত হতে পারল না কিশোর। কোনভাবে লোকটার ওপর থেকে সন্দেহ গেল না তার। তবে তর্ক করল না।

'আকাশে যে রাতের বেলা আলো দেখা যায়, রসি, এ ব্যাপারে কিছু জানেন নাকি আপনি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'শুনেছি আমিও,' বিশেষ গুরুত্ব দিল না অফিসার। 'নিজে দেখিনি কখনও। গুজবের কি বিশ্বাস আছে?' হাসল সে। 'এখানকার পাহাড়ীরা বড় বেশি কুসংস্কারে বিশ্বাসী। কি দেখে আর কি বলে ওরাই জানে।'

প্রিন্স হোটেলে উঠেছে ওরা, অফিসারকে জানাল কিশোর। 'নতুন কোন খবর যদি জানতে পারেন, দয়া করে জানাবেন।'

থানা থেকে বেরিয়ে সোজা হোটেলে ফিরে এল ওরা। থানা থেকে দুই ব্লক দূরে হোটেলটা। পুরানো কাঠের বাড়ি। ছোট্ট লবি। ছদ্মনামে রেজিস্টারে নাম সই করল তিনজনে। একরাত থাকার রুমভাড়া আগাম মিটিয়ে দিল।

'ব্যাগট্যাগ নেই?' ক্লার্ক জিজ্ঞেস করল।

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে না আমাদের।'

বেলম্যানকে ডাকল ক্লার্ক। ঝুলে পড়া কাঁধ, চঞ্চল দৃষ্টি, একটা লোক এসে দাঁড়াল। ছেলেদের নিয়ে চলল রুম দেখিয়ে দিতে। ঘরটা দোতলায়। একটা ডবল খাট আছে, আর একটা বাংক। তিনজন থাকতে পারবে। বাথরুমটা খুলে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল লোকটা।

ধপাস করে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল তিনজনে। কিন্তু পরক্ষণে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল কিশোর। 'ওহহো, ডারবিকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।'

টেলিফোনের কাছে উঠে গেল সে। ফোন করল থানায়। ডারবিকে জিজ্ঞেস করল এ এলাকায় কোনখানে চুনাপাথরের খনিটনি আছে কিনা। ডারবি জানাল, বনের গভীরে একটা তরাই অঞ্চলে প্রাকৃতিক ব্রিজ আছে। কিছু কিছু গুহা আছে। নিঃসন্দেহে সেগুলো চুনাপাথরের আকর।

'কিন্তু কেউ ওখানে যেতে চায় না,' ডারবি বলল।

'কেন?'

'বিপজ্জনক জায়গা।'

আবার প্রশ্ন করতে যাবে কিশোর, খুট করে একটা শব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে দিল।

'লাইনে আড়ি পেতে ছিল কেউ!'

'ওই বেলম্যান বেটাই,' চিৎকার করে উঠল বিড। 'রিচি আমাদের সাবধান করে দিয়েছে ওর সম্পর্কে, মনে নেই?'

দরজার ছিটকানি লাগিয়ে দিয়ে এল রবিন। ঘরে আলমারির ওপর রাখা একটা আদিম রেডিওর সুইচ অন করে দিল কিশোর। তীক্ষ্ণ বাজনার শব্দে ভরে গেল ঘর।

'নাও, এবার নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে, শুনতে পাবে না,' বিড বলল। 'এখান থেকে কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'রসিকে খুঁজতে,' কিশোর বলল। 'রসিকে পেলে, আমার বিশ্বাস, ব্যারনকেও পেয়ে যাব। সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে ওই লোক।'

'তবে সবার আগে, গোসল দরকার,' কাপড় খুলতে শুরু করে দিল রবিন। 'শুয়োরের পাল নরক দেখিয়ে এনেছে আমাকে।'

বেশি দেরি করল না সে। তাড়াতাড়িই বেরোল বাথরুম থেকে। তারপর ঢুকল বিড। সবার শেষে গেল কিশোর। তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে দেখে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেছে রবিন আর বিড। তোয়ালেটা রেখে দিয়ে সে-ও উঠে পড়ল বিছানায়। বিকেলের রোদ জানালা দিয়ে ঘরে এসে পড়ছে। ভীষণ গরম। কিন্তু বালিশে মাথা ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও হারিয়ে গেল ঘুমের জগতে।

ঘুম যখন ভাঙল, বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘড়ি দেখল বিড। 'সাড়ে ন'টা। আহ্, ঘুমটা যা আরামের হয়েছে না!'

'এখন আমার খাবার দরকার,' রবিন বলল।

কাপড় পরে বেরোনোর জন্যে তৈরি হলো তিনজনে।

কিশোর বলল, 'দাঁড়াও। রেডিও, দূরবীন আর দড়ির বান্ডিলটা নিয়ে নিই। কে আবার কোনদিক দিয়ে ঢুকে নিয়ে চলে যায়।'

লবি পেরোনোর সময় দেখল টুলে বসে ঢুলছে বেলম্যান। ওরা পার হওয়ার সময় নড়লও না।

হোটেল থেকে কয়েকটা বাড়ি পার হয়ে একটা রেস্টুরেন্ট পাওয়া গেল। পেট ভরে খেয়ে নিল দামী খাবার।

বিল দিল কিশোর।

'পানির মত টাকা খরচ হচ্ছে,' রবিন বলল।

'ডাকাতদের আবার টাকার ভাবনা,' হেসে বলল কিশোর। 'শ্রমিকদের বেতনের টাকা সব মেরে দিয়েছি, মনে নেই?'

হাসতে লাগল বিড আর রবিন।

'বোরিসকে ফোন করা দরকার,' কিশোর বলল।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে একটা পাবলিক টেলিফোন বুদ খুঁজে বের করল ওরা। স্লটে কয়েন ফেলে দিয়ে বোরিসের নম্বরে ফোন করল কিশোর। বাড়িতে নেই সে। ওর স্ত্রী ইলা ধরল। বলল, রিচি আর টমকে আনতে এয়ারপোর্টে গেছে তার স্বামী।

রাশেদ পাশার খবর জানাল, শরীরের আরও উন্নতি হয়েছে, তবে ডাক্তার বলছেন স্মৃতিশক্তি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে।

'তোমার চাচী ভাল আছেন।' ইলা জিজ্ঞেস করল, 'তাঁকে কিছু বলতে হবে?'

'বলবেন, আমরা ভাল আছি।'

ইলাকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিল কিশোর।

বিশ

হোটেলে ঢুকে চুপচাপ ঘরে ফিরে এল ওরা। চাবি দিয়ে তালা খুলে, দরজা ঠেলে, ঘরে পা রাখল কিশোর। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। চোখে পড়ল, পাশের ঘরে যাওয়ার দরজার নিচ দিয়ে সাদামত কি যেন একটা ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

রবিনেরও চোখে পড়েছে। প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে এল। ভাঁজ করা কাগজ। খুলে দেখে বলল, 'আরেকটা মেসেজ!' জোরে জোরে পড়তে লাগল সে, 'চলে যাও! এটা তোমাদের শেষ ওয়ার্নিং!' নিচে সেই পেঁচানো অক্ষরে সই করা। সইটা এখন খুব পরিচিত হয়ে গেছে ওদের।

কিশোর বা রবিন বাধা দেবার আগেই দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল বিড। তিন লাফে চলে এল পাশের ঘরে ঢোকার দরজার কাছে, বাইরে থেকে যেটা দিয়ে ঢুকতে হয়। তালা নেই। ছিটকানিও লাগানো নেই ভেতর থেকে। ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। হলওয়ের আলো রয়েছে বেশ কিছুটা দূরে, ঘরে পৌঁছতে পারছে না। ভেতরে ঢুকে লাইটের সুইচের জন্যে হাতড়াতে শুরু করল সে। আচমকা ধ্রাম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। প্রচণ্ড ঘুসি এসে লাগল মাথার একপাশে। লোকটার আঙুলে তামার আঙটা বা ওই জাতীয় কিছু পরা ছিল বোধহয়, সাংঘাতিক ব্যথা পেল বিড। ছোট্ট একটা গোঙানি বেরোল কেবল মুখ থেকে। তারপরই দলামোচড়া হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

দরজার কাছে চলে এসেছে ততক্ষণে কিশোর আর রবিন। ধাক্কা দিতে লাগল।

'ভারী কিছু ঠেস দিয়ে রেখেছে ওপাশে,' রবিন বলল।

দুজনে কাঁধ লাগিয়ে ঠেলা দিতে লাগল পাল্লায়। ঢুকতে পারার মত ফাঁক হতেই ঢুকে পড়ল কিশোর। সুইচ হাতড়ে বের করে আলো জ্বেলে দিল। পাল্লা ঘেঁষে

মেঝেতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে বিড। তার অচেতন দেহটা দিয়েই ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছিল পাল্লায়।

খোলা জানালাটার কাছে দৌড়ে গেল কিশোর। গলা বাড়িয়ে দেখল, একপাশে ফায়ার এস্কেপ। কাউকে দেখা গেল না তাতে। যে দরজার নিচ দিয়ে মেসেজটা ঠেলে দেয়া হয়েছিল, সেটা খোলার চেষ্টা করল। তালা দেয়া। অনুমান করতে কষ্ট হলো না, যে লোক মেসেজটা দিয়ে গেছে, সে-ই পিটিয়ে অজ্ঞান করেছে বিডকে। পালিয়ে গেছে নিরাপদে।

বিডকে ধরাধরি করে নিজেদের ঘরে নিয়ে এল কিশোর আর রবিন। ঠাণ্ডা পানি মুখে ছিটিয়ে ওর হুঁশ ফেরানো হলো। উঠে দাঁড়াল সে। থরথর করে কাঁপছে। ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। 'বাপরে! মাথার মধ্যে চক্কর মারছে!'

শঙ্কিত হলো রবিন। 'মাথায় লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না করালে খারাপ হতে পারে। ডাক্তার দেখানো দরকার।'

হোটেলের বাইরে ফোন করতে গেল কিশোর। প্রথমে করল ডাক্তারকে। তারপর থানায়। পুলিশকে জানিয়ে রাখল ঘটনাটা। ঘরে ফিরে জানাল, ডাক্তার আসছেন।

পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, মগজে চোট লাগেনি। তবে বেশ ক'দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হতে পারে বিডকে। বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তার চলে গেলে আলোচনায় বসল দুই গোয়েন্দা। কি করা যায়? কোথায় রাখা যায় তাকে?

'রাখতে হলে ব্যারনের অপরিচিত কোন জায়গায় রাখতে হবে,' কিশোর বলল। 'হোটেল-ফোটেলে রাখা যাবে না। সব ব্যাটা ঘুষ খায়।'

'একের পর এক জখম করে করে আমাদের বেকায়দায় ফেলে দিচ্ছে ব্যারনের বাচ্চা,' তিক্তকণ্ঠে বলল রবিন। 'টমকে তো কোনমতে পার করলাম। এখন বিডকে করি কি করে!'

'এক কাজ করা যায়,' হঠাৎ তুড়ি বাজাল কিশোর, 'পল আর জুল!'

'না না!' গুঙিয়ে উঠল বিড। 'ওই ডাস্টবিনে গিয়ে থাকতে পারব না আমি! তারচেয়ে এখানেই…'

'আরে না, ছাউনিতে থাকতে বলা হচ্ছে না তোমাকে। সব শুনলে পল আর জুলের আম্মা আমাদের সাহায্য করতে রাজিও হতে পারেন। তোমাকে ওদের বাড়িতে রাখতে পারলে, নিশ্চিন্তে আমি আর রবিন রসির খোঁজে যেতে পারব।'

দেরি না করে হোটেল ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

'আর বেশিক্ষণ থাকলে,' রবিন বলল, 'আমাদের দুজনকেও অচল করে দেয়া হতে পারে।'

সামান্য যা জিনিসপত্র সঙ্গে আছে সেগুলো, আর বিডকে ধরে ধরে নিয়ে নিচে নেমে এল দুই গোয়েন্দা। কাউকে চোখে পড়ল না। এমনকি ডেস্ক ক্লার্কও নেই ডেস্কে।

ভাড়ার টাকা দেয়াই আছে। কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করল না

কিশোর। বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সি ডাকল। সেভেনথ স্ট্রীট তো চেনেই, বারম্যানদের বাড়িও চেনে সে। কাজেই পৌঁছে দিতে কোন অসুবিধে হলো না।

সুন্দর একটা বাড়ির সামনে বিডকে নিয়ে নামল দুজনে।

দরজার বেল বাজাল কিশোর।

হালকা-পাতলা লম্বা একজন লোক দরজা খুলে দিলেন।

পরিচয় জানার পর কিশোর বলল, 'মিস্টার বারম্যান, এত রাতে আপনাদের বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু হয়েছেটা কি? কি করতে পারি তোমাদের জন্যে?'

বিডের কি হয়েছে, সংক্ষেপে জানাল কিশোর। তারপর বলল, 'আপনার ছেলেদের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের। ওরা গোয়েন্দা হতে চায়। গোয়েন্দারা কিভাবে কাজ করে দেখতে চায়। বিডকে পেলে ওরা খুশিই হবে, আমার বিশ্বাস। কয়েক ঘণ্টার জন্যে কি তাকে আপনাদের বাড়িতে থাকতে দিতে পারবেন। অবশ্য খরচাপাতি যা লাগে...'

বাধা দিয়ে বারম্যান বললেন, 'খরচাপাতির কথা ভেবো না। জখমী মানুষকে সাহায্য করতে হবে, তার জন্যে আবার এত কথা কিসের। এসো, ভেতরে এসো। পলের মা খুশি হয়েই তোমাদের বন্ধুর সেবা করবে।'

মিসেস বারম্যানও খুব ভাল। হাসিখুশি, আন্তরিক। বিডকে বললেন, 'বাড়তি ঘর আছে আমাদের। কাজেই অস্বস্তি বোধ করার কোন কারণ নেই তোমার।'

'কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব,' বলতে গেল কিশোর। পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। লিভিং-রুমে এসে ঢুকল শোবার পোশাক পরা পল আর জুল।

গোয়েন্দাদের দেখে বড় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল ছোটটা, 'কি বলেছিলাম না, ওরা আসবেই! ওরা কথা দিয়েছে, আমাদের গোয়েন্দাগিরি শেখাবে।'

যখন শুনল, বিড কয়েক দিন থাকবে ওদের বাড়িতে, লাফানো আর দেখে কে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কিশোর। বারম্যানদের বলল, 'একটা কথা, বিড যে এখানে আছে বাইরের কেউ যেন না জানে।'

কিশোর গোয়েন্দাদের গোয়েন্দাগিরিতে সাহায্য করতে রাজি হলেন মিস্টার বারম্যান। নিজের দুই ছেলেকে নিষেধ করে দিলেন বাইরে গিয়ে না বলতে। ভাল লোকের হাতেই পড়েছে বিড। নিশ্চিন্ত হয়ে রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর।

শহরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করতে করতে সেই রাস্তাটা পেয়ে গেল, মিস্টার হেগের গাড়িতে করে যেটা দিয়ে ঢুকেছিল শহরে। এখন বেরোনোর পালা। হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে এল শহর থেকে। ফিরে যাবে আবার বুনো অঞ্চলে। শান্ত রাত। গা জুড়ানো ঠাণ্ডা বাতাস। চাঁদের আলো যেন ধুয়ে দিচ্ছে মাঠ-ঘাট, প্রকৃতি।

শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে চলে এসেছে। এতক্ষণে একটা গাড়ি আসতে দেখল। ছোট একটা ট্রাক। হাত তুলতে থামল ড্রাইভার। এক তরুণ। লিফট দিতে রাজি হলো। যে জায়গা থেকে মিস্টার হেগের গাড়িতে উঠেছিল ওরা, সেখানে এনে নামিয়ে দিল।

টর্চের আলোয় পাহাড়ে যাওয়ার পথটা খুঁজে পেল ওরা। এগিয়ে চলল ঘন বনের ভেতর দিয়ে। নজর রেখেছে গোলাপী আলো দেখার জন্যে, কিন্তু আকাশ আজ অন্ধকারই রয়ে গেল।

'রসি বোধহয় ছুটি নিয়েছে আজকে,' রবিন বলল।

টম কোন্ জায়গায় পা মচকেছিল, মনে আছে। গর্তটাও দেখতে পেল। ফাঁদটা আর নতুন করে পাতা হয়নি।

'কেন পাতল না, বলো তো, কিশোর?'

'ওদের ধারণা আমরা এ এলাকা ছেড়ে চলে গেছি।'

'কিন্তু অন্য কেউ যদি আসে?'

'ওরা নিশ্চিত, আর কেউ আসবে না। সবাইকে ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কেবল আমাদেরকে পারেনি।'

এগিয়ে চলল ওরা। ট্রেলারগুলোর কাছাকাছি চলে এল। থামল বিশ্রাম নিতে।

'মুসার সঙ্গে কথা বলা দরকার,' কিশোর বলল। 'নতুন কিছু জেনে থাকলে শুনতে হবে।'

পাখির কিচির-মিচিরে ঘুম ভেঙে গেল ওদের। উজ্জ্বল সকাল। বেশ গরম। কাছেই একটা উঁচু গাছ দেখে তাতে চড়ল দুজনে। ওঅর্ক ক্যাম্পটা ভালমত দেখা যায় এখান থেকে। কাজ শুরু হয়ে গেছে। ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসছে। শ্রমিকেরা ব্যস্ত।

দূরবীন চোখে লাগাল রবিন। 'মুসাকে দেখতে পাচ্ছি। দেখো।'

রাস্তার পাশে মাটি ফেলছে মুসা। ব্রিজ থেকে বেশি দূরে না।

গাছ থেকে নেমে পড়ল দুই গোয়েন্দা। তারপর কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও হেঁটে এগিয়ে চলল কাছে থেকে দেখার জন্যে। কিছুদূর গিয়ে আবার চোখে দূরবীন লাগাল কিশোর। লাফ দিয়ে সামনে চলে এল মুসার মুখটা। কি জানি কেন বার বার ব্রিজের দিকে তাকাচ্ছে সে। ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল ব্রিজের একটা স্তম্ভের দিকে।

ঝটকা দিয়ে রবিনের দিকে ঘুরে গেল কিশোর। 'রবিন! কোন ব্যাপার আছে!'

একুশ

মুসার কাণ্ড দেখছে দুজনে।

নদীর পাড় বেয়ে নেমে গেল মুসা। ব্রিজের নিচে চলে এল। পড়ে থাকা কালো একটা জিনিস তার অস্বস্তির কারণ।

প্রথমে ভাবল কেরোসিন ফ্লেয়ার, কনস্ট্রাকশনের কাজ করার সময় 'বিপজ্জনক এলাকা' বোঝানোর জন্যে শ্রমিকরা যে জিনিস ব্যবহার করে। কিন্তু এটা জ্বলছে না। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে ওর–ব্রিজে কাজ করে যে শ্রমিকরা ওরা

আসছে না। তারমানে ওদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, ব্রিজে যাওয়া এখন বিপজ্জনক।

ঘড়ি দেখল মুসা। সাতটা পনেরো। কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় কাজ শুরু না হলে ভীষণ রেগে যায় বোম্যান। আজ কোথায় গেল সে?

শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকাল মুসা। নদীর পার বেয়ে বোম্যানকে নেমে আসতে দেখল। ওর দিকেই আসছে।

হয়তো জিনিসটার কথা জানে ফোরম্যান–ভাবল মুসা। জিনিসটা তুলে আনতে এগোল। কাছে এসে নিচু হয়ে তুলে নিল।

টিক! টিক! টিক! টিক!

বিদ্যুৎ চমকের মত মুসার মগজে খেলা করে গেল আসল সত্যটা। ফ্লেয়ার নয় ওটা। বোমা! টাইম বম্ব!

আতঙ্কে হাত-পা অবশ হয়ে আসতে লাগল তার। এখন আর ফেলতেও পারছে না, ফেটে যাওয়ার ভয়ে। হাতে রাখারও সাহস নেই। হতবুদ্ধি। দৌড়ে চলে এল ফোরম্যানের কাছে।

'মিস্টার বোম্যান! মিস্টার বোম্যান!'

'তোমার হাতে ওটা কি?'

'বো-বো-ব্বোমা!'

পাথরের মূর্তির মত জমে গেল বোম্যান। 'বোমা! ফেলছ না কেন?'

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। পাথর ছোঁড়ার কায়দায় তুলল বোমাটা। কানের কাছে আসায় টিক-টিক টিক-টিক শব্দটা আরও জোরাল হলো। যা থাকে কপালে ভেবে দিল ছুঁড়ে, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে। ব্রিজের ওপর দিয়ে উড়ে গেল বোমাটা। পড়ল গিয়ে পঞ্চাশ ফুট দূরে নদীর মধ্যে। ফাটল না। তীব্র স্রোত আরও বিশ ফুট ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তারপর ফাটল। ভয়াবহ ভারী বিস্ফোরণের শব্দ বাতাসকে যেন টুকরো টুকরো করে দিল। পাথর আর মাটি ছিটকে উঠল আকাশে। ঝুরঝুর করে ঝরে পড়তে লাগল পানিতে।

ব্রিজটা বেঁচে গেছে।

ফোরম্যানের দিকে ফিরে তাকাল বিমূঢ় মুসা।

গর্জে উঠল ফোরম্যান, 'কোথায় পেয়েছিলে ওটা?'

'আ-আ-আমি···ব্রিজের নিচে!'

'মিথ্যুক কোথাকার! রিবানের মত আরেক মিথ্যুক!' মুসার কলার চেপে ধরতে গেল বোম্যান।

ঝট করে সরে গেল মুসা।

বুঝল, বোম্যানকে বিশ্বাস করাতে পারবে না। এখানে আর অপেক্ষা করলে বিপদে পড়তে হবে। কাজেই একমাত্র যে কাজটা করার কথা মাথায় এল তার, সেটাই করল–ঘুরে দৌড় মারল নদীর ধার ধরে বনের দিকে।

'এই থামো! থামো!' পেছনে চিৎকার করছে বোম্যান। 'না থামলে পুলিশে খবর দেব কিন্তু!'

কেয়ারই করল না মুসা। যে ঘন ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে রয়েছে কিশোর

আর রবিন, সেটার পাশ দিয়ে চলে গেল। বোম্যানও থেমে নেই। বকাবকি করতে করতে পিছু নিয়েছে মুসার। কিন্তু পৌঁছতে পারল না মুসার কাছে। ঝোপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পা সই করে ঝাঁপ দিল রবিন। ধুড়ুস করে উড়ে গিয়ে পড়ল লোকটা। নাকমুখ ঠুকে গেল কঠিন মাটিতে। ওঠার চেষ্টা করার আগেই তার পিঠে গিয়ে চেপে বসল কিশোর।

শব্দ শুনে কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল মুসা। বোম্যানের দুরবস্থা দেখে দাঁড়িয়ে গেল। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল একটা মুহূর্ত। তারপর ফিরে এসে দাঁড়াল ওদের কাছে।

'তোমরা উদয় হলে কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'পরে বলব,' জবাব দিল কিশোর। 'মুসা, ব্রিজটা বাঁচিয়ে দিয়েছ তুমি।'

'সেই সাথে মিস্টার ওয়াকারের বেশ কয়েক হাজার ডলার,' রবিন বলল।

'এই ছাড়ো আমাকে!' চেঁচামেচি শুরু করল বোম্যান। 'তোমাদের সব ক'জনকে ধরে পুলিশে দেব আমি!' ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট শুরু করল সে। লাথি ছুঁড়তে লাগল এলোপাতাড়ি।

'মুসা, শক্ত দেখে লতা কেটে নিয়ে এসো তো,' কিশোর বলল।

নিয়ে এল মুসা। সেগুলো দিয়ে কষে বাঁধা হলো লোকটার হাত-পা।

হুমকির পর হুমকি দিয়ে যেতে থাকল বোম্যান। 'এর জন্যে পস্তাতে হবে তোমাদের! আমি তোমাদের দেখে নেব!'

'সে-চেষ্টা বহুবার করা হয়েছে,' রবিন বলল। 'আপনিও কি ওদের দলে নাকি?'

জবাবের জন্যে অপেক্ষা করল না তিন গোয়েন্দা। বোম্যানকে ফেলে রেখে বনে ঢুকে পড়ল। পায়েচলা পথটা ধরে এগিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে। ক্যাম্প থেকে ওরা যাওয়ার পর যা যা ঘটেছে সব মুসাকে খুলে বলল কিশোর আর রবিন। মুসা জানাল ক্যাম্পের খবর।

'সারা ক্যাম্পে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে,' মুসা বলল, 'যে-ই বাড়াবাড়ি করবে, তোমাদের অবস্থা হবে তার। বিডকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে বোম খেপা খেপে গেছে ওরা।'

'সবগুলো শ্রমিকই এখানে দাগী আসামী নাকি?' জানতে চাইল কিশোর।

'না, বেশির ভাগই ভাল। খারাপের সংখ্যা কম। তবে ওরাই জ্বালিয়ে মারছে। আতঙ্ক সৃষ্টি করছে ভাল শ্রমিকদের মনে। কাজ করতে দিচ্ছে না ঠিকমত। কাজের ক্ষতি হচ্ছে।'

'কারা কারা স্যাবটাজ করছে, জানতে পারলে হত!'

'বোম্যানকে ষড়যন্ত্রকারীদের দলের মনে হয় না আমার। কিন্তু হ্যারিস বড় পাণ্ডাদের একজন। ভালুকটাকে দিয়ে তোমরা মধুর চাক খাইয়ে দেয়াতে ও যে কি খেপা খেপেছে।'

'আমরা করেছি তাহলে জানে সে,' রবিন বলল। 'ফাঁদ পাতার বুদ্ধিটাও তারই নাকি?'

'হতে পারে,' কিশোর বলল। মুসার দিকে তাকাল, 'হ্যারিস জানে আমাদের

ডুবিয়ে মারার পরিকল্পনাটা তার সফল হয়নি?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'বনের মধ্যে তোমাদের যাওয়ার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে ওরা কাল রাতে শুনলাম, বলাবলি করছে, তোমরা ওয়াইল্ড টাউনে চলে গেছ।'

'তারমানে সব জায়গাতেই চর রেখে দিয়েছে ব্যারন,' মন্তব্য করল কিশোর। মুসার কাছে সব শোনার পর সে এখন নিশ্চিত, হোটেলের বেলম্যানটাই সমস্ত খবর পাচার করেছে। 'এই ব্যারন লোকটা কে, শুনেছ কিছু? আর রসিটা কি জিনিস?'

'না,' মাথা নাড়ল মুসা। 'এ সব ব্যাপারে একটা কথা উচ্চারণ করে না ওরা।'

'হুঁ।'

'কিন্তু লাঞ্চের সময় যে পেরিয়ে যাচ্ছে,' রবিন বলল। 'মুসা, তোমার খিদে লাগে না?'

'লাগলেই বা কি,' কিশোর বলল। 'খাবার পাওয়া যাবে না এই বনের মধ্যে।'

'যাবে,' মুসা বলল। ফুলে থাকা প্যান্টের পকেট দেখাল সে। দুই পকেট থেকে টেনে বের করল তিনটে স্যান্ডউইচ। 'কফি ব্রেকে খাব বলে রেখে দিয়েছিলাম। কফি বাদ রেখেই কফি ব্রেক সারতে হবে।'

সেই যে গতরাতে খেয়েছে, তারপর পেটে কিছু পড়েনি কিশোর আর রবিনের। খাবার দেখে ক্ষুধা আরও বেড়ে গেল ওদের। ঝর্ণার পাড়ে গাছের ছায়ায় বসে ওই স্যান্ডউইচ খেল। পেট পুরে পানি খেল। খানিক জিরিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল আবার। চলল রসির খোঁজে।

ভালুকের গুহাটা দেখা গেল। ভালুকটা আছে কি নেই জানারও প্রয়োজন বোধ করল না। ক্ষুধার্ত ভালুক কি জিনিস অজানা নয় ওদের। তা ছাড়া কোন্ চালাকি করে রেখেছে আবার হ্যারিস কে জানে। গুহার অনেক দূর দিয়ে ঘুরে পার হয়ে এল ওরা। এবার আর চূড়া পার হয়ে পাহাড়ের অন্যপাশে গেল না। ওদিকটা দেখা হয়ে গেছে। তারচেয়ে দক্ষিণের তরাই অঞ্চলটা খুঁজে দেখবে ঠিক করল।

সন্ধ্যাবেলা কতগুলো বুনো কালোজামের গাছ দেখে থামল ওরা। আর কিছু না পেয়ে ওগুলোই গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল।

'রাত কাটানোর জন্যে একটা ভাল জায়গা খুঁজে বের করা দরকার,' কিশোর বলল।

ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করল ওরা। গাছপালায় ছাওয়া একটা উপত্যকা দেখতে পেল মুসা। ঝর্ণাও আছে তাতে। ঝর্ণা না বলে ওটাকে ছোটখাট জলপ্রপাত বলাই ভাল। দশ ফুট ওপর থেকে পানি ঝরে পড়ছে একটা প্রাকৃতিক পুকুরের মধ্যে।

গাছের ডাল কেটে নিয়ে একটা ঝুপড়ি মত বানাল ওরা, রাত কাটানোর জন্যে। আরও কিছু কালোজাম দিয়ে রাতের খাওয়া সারল। তারপর তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে রসিকে দেখার আশায়। সারাটা দিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে। না ঘুমিয়ে থাকতে পারবে না। পালা করে পাহারা দিতে লাগল। রবিনের পালা দশটা থেকে বারোটা। গাছের গায়ে পিঠ দিয়ে বসল সে। চোখ টেনে খুলে রাখতে পারছে না। বারোটা পর্যন্ত থাকবে কি করে ভাবছে। ঢুলতে শুরু করল। বুকের ওপর ঝুলে পড়ল মাথা।

হঠাৎ চমকে মাথা সোজা করল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে উজ্জ্বল লাগছে আকাশটা।

'কিশোর! মুসা!' চিৎকার শুরু করে দিল সে। 'রসি! রসি!'

লাফ দিয়ে উঠে বসল অন্য দুজন। গোলাপী রঙের আলো আকাশে উঠে ব্যাঙের ছাতার মত ছড়িয়ে পড়েছে।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'এ তো কাছেই কোথাও মনে হচ্ছে!'

লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল ওরা। ঝর্ণা পেরিয়ে এসে উঠল একটা ছোট পাহাড়ের মাথায়। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল নিচের দিকে।

একটা নিচু জায়গা থেকে ক্রমাগত আগুন বেরোচ্ছে। চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন মানুষ। আগুনের আভায় ওদের আকৃতিগুলো চোখে পড়ছে।

'কি করব?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'সরে যেতে হবে,' জবাব দিল কিশোর। 'আগুনের আলোয় নিশ্চয় দেখা যাচ্ছে আমাদেরও। ওপর দিকে তাকালেই দেখে ফেলবে।'

কিছুটা সরে গিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। মাথাটা শুধু উঁচু করে দেখতে লাগল নিচের বিচিত্র দৃশ্য।

কমতে কমতে দপ করে নিভে গেল আগুন।

'চলো, কেটে পড়ি,' কিশোর বলল। 'ধরা পড়লে আস্ত রাখবে না!'

বাকি রাতটা আর ভাল ঘুম হলো না কারোরই। সবার মনেই এক ভাবনা—এই আগুনের সঙ্গে ওদের কেসের কি সম্পর্ক? আগুন রহস্যের সমাধান করতে পারলে রহস্যটার সমাধান হবে তো?

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে উঠে আবার রওনা হলো ওরা। ছোট পাহাড়টার চূড়ায় উঠে নিচে তাকাল যেখানে আগুন দেখা গিয়েছিল। তিরিশ ফুট জায়গা ঘিরে পুড়ে কালো হয়ে আছে। মাঝখানে মাটিতে একটা কালো পাইপ বসানো।

নাক টানতে লাগল মুসা। 'গ্যাসের গন্ধ পাচ্ছি।'

'আমিও,' রবিন বলল।

'গ্যাসের কুয়া!' কিশোর বলল।

'দেখো কাণ্ড! কি সহজ ব্যাপার, অথচ একটিবারের জন্যে ভাবিনি আগে,' রবিন বলল।

তার কথা শেষ হতে না হতেই শোনা গেল রাইফেলের গুলির শব্দ। কাছেই একটা গাছের গায়ে বিঁধল গুলি।

'পালাও! জলদি!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

মুসা আর রবিনের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল সে। রব ব্রোকার আর আরেকটা লোক উঠে আসছে উপত্যকা থেকে।

'থামো!' চিৎকার করে বলল রব, 'নইলে গুলি করব!'

কিন্তু থামল না তিন গোয়েন্দা।

আচমকা ডানে ঘুরে ঢুকে পড়ল ঝোপঝাড়ের মধ্যে। কাঁটা ডালে লেগে চামড়া

ছড়ে গেল. কাপড় ছিঁড়ল, কিন্তু কোন বাধাই ঠেকাতে পারল না ওদের। মাথার ওপর দিয়ে ডালপালা আর পাতা কেটে চলে যাচ্ছে বুলেট। অল্পের জন্যে মিস হচ্ছে।

'এ ভাবে দৌড়ে পারব না,' রবিন বলল। 'হয় গুলি খাব, নয়তো ধরে ফেলবে। কোথাও লুকিয়ে পড়া দরকার।'

'জলপ্রপাত!' কিশোর বলল। 'লুকানোর একমাত্র জায়গা।'

পুকুরের পানিতে নেমে পড়ল ওরা। এগিয়ে চলল প্রপাতটার দিকে। ঝরে পড়া পানির চাদরের পেছনে ঢুকে পড়ল। আশা করছে পানি ওদের আড়াল করে রাখবে।

'যদি এখানেও দেখে ফেলে?' মুসার প্রশ্ন।

'ডুব দেয়া ছাড়া গতি নেই,' রবিন বলল। 'দম আটকানোর প্রতিযোগিতা শুরু হবে।'

দুটো কালো মূর্তিকে দেখা গেল এ সময়। ডোবার অন্য প্রান্তে উঁচু পাড়ের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। পানির চাদরের ভেতর দিয়ে অদ্ভুত লাগছে মানুষ দুটোকে।

'ডুব দিয়ে নাকটা শুধু ভাসিয়ে রাখো!' কিশোর বলল।

বাইশ

বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে পানির নিচে মাথা নামিয়ে ফেলল ওরা। কতক্ষণ আটকে রাখতে পারবে?

তিরিশ সেকেন্ড…পঁয়তাল্লিশ…এক মিনিট!

অক্সিজেনের জন্যে আকুলি-বিকুলি শুরু করে দিল ফুসফুস। আর পারছে না কিশোর। ডুব সাঁতার দিয়ে চলে গেল পানির চাদরের পেছনে পাথুরে দেয়ালের কাছে। ধীরে ধীরে মাথা তুলল। মুসা আর রবিনও চলে এসেছে।

'দিলাম বোকা বানিয়ে!' ফুস্ করে মুখ দিয়ে গালের পানি ছুঁড়ে ফেলল রবিন।

মুসা অত শিওর হতে পারল না 'এখানেও যদি দেখতে চলে আসে?'

নিশ্চিত হয়ে বলার উপায় নেই। তবে ডোবার অন্য পাড়ে এখন দেখা যাচ্ছে না লোকগুলোকে।

'এখানেই থাকি কিছুক্ষণ,' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'নাকি?' পানিতে থাকতে ভাল লাগছে তার।

'বেশিক্ষণ থাকা যাবে না,' জবাব দিল কিশোর। 'রব আর তার দোস্ত যদি মনে করে থাকে আমরা পালিয়েছি, তাহলে সুযোগটা কাজে লাগানো দরকার আমাদের। ওদের পিছু নিতে হবে।'

'ঠিক,' কিশোরের সঙ্গে রবিনও একমত। 'ব্যারনের আড্ডায় নিয়ে যাবে ওরা আমাদের।'

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল ওরা। তারপর রওনা হলো। সবার আগে

চাদরের এ পাশে বেরিয়ে এল মুসা। পানির নিচে ডুব দিয়ে এসে মাথা তুলল ডোবার মাঝখানে। চারপাশে তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না। হাত নেড়ে অন্য দুজনকে আসতে ইশারা করল।

সাবধানে সাঁতার কেটে এসে তীরে পৌঁছল তিনজনে। ওপরে উঠে কাপড় খুলে মুচড়ে মুচড়ে পানি নিঙড়ে নিয়ে আবার পরল।

'ভাগ্যিস দিনটা গরম,' রবিন বলল। 'ঠাণ্ডা হলে মারা পড়তাম।'

দূরবীনের কাঁচে বাষ্প জমেছে। রেডিওটা রয়েছে ওয়াটার-প্রুফ খাপের মধ্যে, তাই নষ্ট হয়নি।

একসঙ্গে না থেকে বেশ খানিকটা ছড়িয়ে গিয়ে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল ওরা। কোন কিছু দেখলে পাখির ডাক নকল করে শিস দেবে।

কিশোরকে মাঝখানে রেখে দুদিকে বেশ কিছুটা সরে গেল মুসা আর রবিন। দক্ষিণে রওনা হলো। লোকগুলোর চলার চিহ্ন কিশোরের চোখে পড়ল প্রথম। মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো ভাঙা ডাল আর মাড়িয়ে যাওয়া ঝোপ দেখে বোঝা যায় চিহ্ন লুকানোর কোন চেষ্টাই করেনি ওরা।

শিস দিল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এল মুসা আর রবিন।

সাবধান করে দিল কিশোর, 'কোন কারণেই তাড়াহুড়া করবে না। আবার যদি দেখে ফেলে, কপালে দুঃখ আছে। চলো, এগোনো যাক।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল লোকগুলোকে। সামনে অসমান, রুক্ষ উপত্যকা। তার ওপাশে রব আর সঙ্গী লোকটা খাড়া পাহাড়ের পাথুরে ঢালে ঝুঁটির মত বেরিয়ে থাকা একটা টিলায় চড়ছে। লেফটেন্যান্ট ডারবির সতর্ক-বাণী মনে পড়ল কিশোরের: বিপজ্জনক জায়গা।

ঝুঁটির ওপাশে লোকগুলো অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কিশোর। তারপর বলল, 'এসো, আমরাও যাই।'

ঢাল বেয়ে ওঠা বড় কঠিন এখানে। আলগা পাথরের ছড়াছড়ি, পা পড়লে হড়কে যায়। একটা ভুল পদক্ষেপ মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। ধস নামতে পারে পাহাড়ে। কিংবা নিজেই পিছলে পড়ে পা ভাঙতে পারে।

অবশেষে নিরাপদেই চূড়ায় পৌঁছল তিন গোয়েন্দা। নিচে ছড়ানো উপত্যকা। নদী বয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক একটা পাথরের ব্রিজ তৈরি হয়ে আছে নদীর ওপরে। ব্রিজটা দেখতে সুন্দর একটা খিলানের মত।

ব্রিজের স্তম্ভের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে লোকগুলো। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

'খাইছে!' অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মুসা। 'ঘটনাটা কি ঘটল? গেল কোথায়? ঘুরেও যেতে দেখলাম না, ব্রিজের নিচ দিয়েও গেল না!'

দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। ব্রিজটা চুনাপাথরে তৈরি। পনেরো ফুট পুরু। বাঁ দিকটা বেশি উঁচু। ওদিক থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে ধনুকের মত ডানে বেঁকে ঢুকে গেছে কতগুলো বড় বড় পাথরের চাঙড়ের মধ্যে, নদী-তীর থেকে সাত গজ দূরে।

ঝোপের আড়ালে আড়ালে ব্রিজের দিকে এগোতে শুরু করল ওরা। কিছুদূর

গিয়ে চোখে দূরবীন লাগিয়ে আবার দেখল কিশোর। খিলানের মাঝামাঝি জায়গায়, তলার দিকে একটা ম্যানহোলের মত গর্ত দেখতে পেল। ওটা থেকে পানি বেরিয়ে ঝরে পড়ে নিচের জলধারার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

'মুসা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে নজর রাখো,' কিশোর বলল। 'আমি আর রবিন গিয়ে ব্রিজটার চারপাশ ঘুরে দেখে আসি। কাছাকাছিই কোথাও ওদের আস্তানা। কাউকে বেরোতে দেখলেই শিস দেবে।'

একটা ঘন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল মুসা। রওনা হয়ে গেল অন্য দুজন। ঝোপ আর গাছপালার আড়ালে আড়ালে চলে এল ব্রিজের কাছে, নিচু দিকটায়। পাথরের চাঙড়গুলোর মধ্যে ফাঁক-ফোকর খুঁজে বেড়াল। কিন্তু ঢোকার মত কোন গুহামুখ বা ফাটল চোখে পড়ল না।

মুসার কাছ থেকে কোন সঙ্কেত আসছে না। তারমানে কেউ নেই। সাহস পেয়ে ব্রিজের একপাশ থেকে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল দুজনে। সাবধানে উঠে এল চ্যাপ্টা পিঠটাতে।

'দেখো,' হাত তুলে দেখাল রবিন। পানির সরু একটা ধারা ঢুকে যাচ্ছে পাথরের মধ্যে ছোট একটা গর্তে।

'এটাই হলো ব্যাখ্যা!'

'কিসের?'

'তলার দিকে গর্ত হওয়ার,' কিশোর বলল। 'ওপরের খুদে ঝর্ণাটা এককালে অনেক বড় ছিল। হাজার হাজার বছর ধরে ক্ষয় করে চলেছিল ব্রিজের চুনাপাথর। গর্ত করে বেরিয়ে এসেছিল তলা দিয়ে।'

তুড়ি বাজাল রবিন, 'কিশোর, এমন কি হতে পারে না, পুরো ব্রিজটাকেই ফোঁপরা করে দিয়েছে পানি? হয়তো ভেতরটা এখন পাইপের মত ফাঁপা।'

'অসম্ভব না। হতে পারে।'

মুসার কাছে ফিরে এসে তাকে জানাল ওরা কি দেখে এসেছে।

'তাই নাকি,' শুনে বলল মুসা। 'দারুণ একটা ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন হতে পারে। ভাবছি, আগেভাগেই জায়গা বুক করে রাখলে কেমন হয়? লেমোনেড আর হট-ডগ স্টল দিলে, হটকেকের মত চলবে।'

'তা চলবে,' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'মুসা, তুমি এমন সময় খাবারের কথা তুলেছ, যখন একটা বিস্কুটও নেই আমাদের কাছে।'

আর্তনাদ করে উঠল মুসা, 'তাই তো! কেন যে পেটটাকে মনে করালাম, জ্বলা শুরু হয়ে গেছে, উহ্!'

'বকবকানি থামাও, আস্তে কথা বলো,' কিশোর বলল। 'শুনে ফেলবে।...শোনো, ব্রিজটার আশেপাশের প্রতিটি ইঞ্চি মাটি খুঁজে দেখা দরকার। রব আর তার সঙ্গের লোকটা ম্যাজিকে উড়ে যায়নি।'

খুঁজতে খুঁজতে বিকেল গড়িয়ে গেল। ব্যাপারটা রবিনের চোখে পড়ল প্রথমে। একটা উইলো গাছ থেকে ডাল কেটে নেয়া হয়েছে কয়েকটা।

'ক্যামোফ্লেজের জন্যে নিয়ে যায়নি তো?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল সে।

'সে-রকমই তো মনে হচ্ছে। কোন কিছু লুকিয়েছে নিশ্চয়।'

'চলো,' উত্তেজিত স্বরে বলল রবিন, 'কি লুকিয়েছে দেখা যাক।'

গাছের মাথার ফাঁক দিয়ে চুইয়ে নামছে পড়ন্ত রোদ। অসংখ্য রশ্মি তেরছা ভাবে নেমে আসছে বনতলে। ব্রিজের বেশ কাছে, বড় একটা ঝোপের মধ্যে ঝিক করে উঠল কি যেন। সাধারণ ভাবে পুরোটাকেই আসল ঝোপ মনে হয়। কিন্তু ভালভাবে দেখলে বোঝা যায় আসল ঝোপের ওপর বেশ কিছু ডালপালাও ফেলে রাখা হয়েছে। ফাঁক-ফোকরগুলো বন্ধ করার জন্যে।

টানটান উত্তেজনা নিয়ে সেটার মধ্যে উঁকি দিল তিন গোয়েন্দা। ঝিলিক দিয়েছিল কি জিনিস দেখতে পেল। একটা জীপের স্টিয়ারিং হুইল। রোদের একটা সরু রশ্মি গিয়ে পড়েছে তাতে। সেই জীপটা, যেটা দিয়ে ওদের খুঁজতে গিয়েছিল চারজন লোক।

প্রায় একটা ঘণ্টা ঝোপের কাছে ঘাপটি মেরে বসে রইল ওরা। কেউ এল না।

অন্ধকার হতে দেরি নেই। ব্রিজের ওপর নজর রাখার জন্যে নদীর ভাটির দিকে চলে এল ওরা।

অন্ধকার হয়ে গেছে। ব্রিজের দিকে হাত তুলে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল মুসা, 'কিশোর! দেখো, দেখো! গর্তটা দিয়ে আলো আসছে।'

'ভেতরে কেউ আছে!' রবিনের দিকে ফিরল কিশোর। 'রবিন, তোমার কথাই ঠিক। ফাঁপাই ওটা। ওই ব্রিজটাই ওদের আস্তানা।'

কিন্তু ভেতরে ঢোকা যায় কি করে?

বুদ্ধি একটা বের করে ফেলল কিশোর। 'ওই চাঙড়গুলোর মধ্যেও পথ আছে, আমি এখন শিওর। মুসা, তুমি থাকো এখানে। পাহারা দাও। আমি আর রবিন গিয়ে দেখে আসি আরেকবার।'

দূরবীন, একটা টর্চ আর রেডিওটা মুসার কাছে ফেলে গেল রবিন। নাইলনের দড়ির বান্ডিল—বেল্টের সঙ্গে ঝুলিয়ে যেটা সারাক্ষণ বহন করেছে, সেটাও খুলে রেখে দিল মুসার সামনে।

চাঁদ উঠেছে। সেই আলোয় পথ দেখে নদীটা পেরিয়ে এল দুজনে। পৌঁছে গেল চাঙড়গুলোর কাছে।

এবার আর একটা চাঙড়ও দেখা বাদ দিল না। লুকানো খাঁজ বা ওধরনের কিছু রয়েছে কিনা হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। সামান্য সরে গিয়েছিল কিশোর। দৌড়ে এল।

'ওই দেখো!' বিশাল এক চাঙড়ের দিকে হাত তুলে দেখাল রবিন। 'গোড়ার দিকে। গর্তটা দেখেছ? ওর মধ্যে ঢুকে যাওয়া সম্ভব।'

গর্তের কাছে এসে কান পাতল কিশোর। ভেতর থেকে অস্পষ্টভাবে মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে।

'ঢুকবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'মুসাকে ডাকব?'

'দরকার নেই। ও থাকুক। আমরাই ঢুকি।'

সরু গর্তটা দিয়ে একটা সুড়ঙ্গে নামল ওরা। মাথা সমান উঁচু। খাড়া হয়ে হাঁটা যায়। ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল দুজনে। চোখে সয়ে এল আবছা অন্ধকার। সুড়ঙ্গ ধরে হাঁটতে গিয়ে একটা ব্যাপার বোঝা গেল, পুরো সমতল নয় ওটা, উঁচু-নিচু; আর কেমন পেঁচানো।

কিশোর বলল, 'ঘোরের মধ্যে চাচা হেলিক্স বলেছিল কেন, বোঝা যাচ্ছে। নিশ্চয় তাকে কিডন্যাপ করে এখানেই নিয়ে এসেছিল ব্যারনের লোকেরা।'

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলল রবিন। কিন্তু দেয়া আর হলো না। দুই পাশে পাথরের দেয়ালের তাক থেকে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজন লোক।

ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল দুই গোয়েন্দা। উঠে দাঁড়ানোর আগেই তাদের বুকের ওপর চেপে বসল লোক দুটো। ভারী শরীর ওদের। বেজায় শক্তি। ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করতে লাগল কিশোর আর রবিন। লাভ হলো না। হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ঘাড় ধরে ওদের টেনে তুলল লোকগুলো। পিঠে ধাক্কা মারল আগে বাড়ার জন্যে।

পেঁচানো করিডরের মত সুড়ঙ্গটা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। একটু পর পরই দেয়ালের গায়ে হ্যারিকেন ঝোলানো। সেই আলোয় লোক দুটোর চেহারা দেখতে পেল ওরা। কিন্তু চিনতে পারল না। অচেনা লোক।

'বহুত জ্বালান জ্বালিয়েছ,' গোয়েন্দাদের বলল দুজনের একজন। 'বিচ্ছুগিরি এবার খতম করব।'

'হ্যাঁ, রিড,' বলল দ্বিতীয় লোকটা। 'কোনমতেই বেরোতে দেয়া যাবে না আর।'

জবাব দিল না দুই গোয়েন্দা।

খিলানের ওপর দিকে নিয়ে আসা হয়েছে ওদের, অনুমানেই বুঝতে পারল। পাশের দেয়ালের নিরেট পাথর খুঁড়ে বানানো একটা কামরায় ঠেলে দেয়া হলো ওদের। হ্যারিকেন আর লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল, ঘরটা অস্ত্রাগার। নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র দেয়ালে ঠেস দিয়ে কিংবা মেঝেতে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। পাথর দিয়ে তৈরি করা টেবিল ঘিরে বসে আছে চারজন লোক। জীপের সেই চারজন।

শেষ মাথার দেয়ালের কাছে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা একজন লোক। মুখ দেখা যাচ্ছে না। বন্দিদের দেখে এগিয়ে এল সে। আলোয় বেরোল। তার মুখ দেখে হাঁ হয়ে গেল রবিন। বিশ্বাস করতে পারছে না।

রুয়ানডার ডিগনিটি এমপরার! লস অ্যাঞ্জেলেসের সেই ভিখিরি।

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল ডিগ। বসে পড়ল চারজনের সঙ্গে। তার দিকে এগিয়ে গেল রিড নামের লোকটা। বলল, 'বিচ্ছু দুটোকে ধরে নিয়ে এলাম, ব্যারন!'

তেইশ

চোখ মিটমিট করে দেখছে রবিন। সেই ভিখিরিটাই ব্যারন—এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

চিৎকার করে উঠল ডিগ, 'গাধা কোথাকার! দুটো কেন? আরেকটা কই? ওই নিগ্রো ছেলেটা!'

ভীত মনে হলো রিডকে। 'এই দুটোকেই তো পেলাম। জারনকে জিজ্ঞেস করুন,' তার সঙ্গী লোকটাকে দেখাল সে। 'ব্যারন, আপনি শিওর আরেকটা আছে?'

'অবশ্যই!' গর্জে উঠল ব্যারন। 'ওরা তিন গোয়েন্দা। তিন গোয়েন্দা কি দুজনকে দিয়ে হয়, রামছাগল কোথাকার! জলদি যাও, ধরে নিয়ে এসোগে। কাছাকাছিই কোথাও আছে ওটাও। বিচ্ছুরও ওস্তাদ এগুলো। একটাও যদি প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে, আমাদের হাড় কালি করে দেবে।'

তাড়াহুড়ো করে চলে গেল রিড আর জারন।

নিচু স্বরে কিশোরের সঙ্গে কথা বলতে গেল রবিন, ধমকে উঠল ব্যারন, 'চুপ! কোন কথা নয়!'

'কে আপনি?' ব্যারনের ধমকে চুপ না করে বরং ফুঁসে উঠল রবিন। 'কি চালাচ্ছেন এখানে?'

'সেটা তোমার জানার দরকার নেই।'

'আপনিই তাহলে সেই লোক,' সমান তেজে জবাব দিল কিশোর, 'আমার চাচাকে প্রায় খুন করে ফেলেছিলেন। কেন?'

নিষ্ঠুর হাসিতে চকচক করে উঠল ব্যারনের চোখ। 'ওই লোক আমার গোপন আস্তানার খোঁজ জেনে পালিয়ে যাচ্ছিল। সময়মত ধরে আনতে না পারলে এতদিন চোদ্দ শিকের আড়ালে চলে যেতে হত আমাদের। বড় বেশি নাক গলিয়ে ফেলেছিল। তোমার চাচাকে ছিনতাই না করে আর কোন উপায় ছিল না আমাদের।'

রবিন ভাবছে, ইস্, মুসা যদি কোন ভাবে পালাতে পারত! সময় নষ্ট করার জন্যে বলল, 'এই যে ভূতপূর্ব কয়েদীর দল কাজ করছে আপনার জন্যে, ব্রিজ ওড়াচ্ছে, নিশ্চয় কোন কারণ আছে এর।'

'ভূতপূর্ব কয়েদী, না! ব্যঙ্গ তো ভালই করতে শিখেছ। তবে ফাজলেমি করার শিক্ষা তোমরা পাবে। তোমাদের আগে দুনিয়া থেকে বিদায় দেব, তারপর বিদায় করব ওয়াকার কোম্পানিকে। এ এলাকা থেকে ওদের খেদানোর জন্যে যা যা করা দরকার, সব করব আমি।'

'তা আপনি পারবেন না,' কিশোর বলল। 'বলা সহজ। কিন্তু যা করতে চাইছেন সেটা এত সোজা না।'

'হাহ্-হাহ্! গাধাটার কথা শোনো! আমি নাকি পারব না। আরে বোকা, পেরে

তো প্রায় ফেলেছি। ব্রিজটা আরেকবার ওড়ালেই পালানোর পথ পাবে না ওয়াকার কোম্পানি।'

ঘরে ঢুকল রব ব্রোকার। দুই গোয়েন্দাকে দেখে এগিয়ে এল। 'অ, ধরা তাহলে পড়েছে। আরেকটা কোথায়?'

'আনতে গেছে রিড আর জারন,' ব্যারন বলল।

রবের কথায় কান দিল না রবিন। ব্যারনকে জিজ্ঞেস করল, 'ওয়াকার কোম্পানিকে খেদিয়ে লাভটা কি হবে আপনার? গ্যাসের কুয়াগুলো দখল করবেন?'

'নাহ্, বুদ্ধি আছে। সহজেই বুঝে ফেলে সব।'

ব্যারন জানাল, ওর একজন লোক কাকতালীয় ভাবে গ্যাসের সন্ধান পেয়ে যায়। গ্যাসের কথা চেপে গিয়ে কাউন্টির কাছ থেকে জায়গাটা নামমাত্র দামে কিনে নিতে চায় ব্যারন।

'এদিক দিয়ে লোক যাতায়াত করতে থাকলে গ্যাসের খবরটা বেশিদিন অজানা থাকবে না,' বলল সে। 'তাই একটা বুদ্ধি করতে হয়েছে। একটা কুয়াতে পাইপ ঢুকিয়ে ভাল্ভ্ লাগিয়ে দিয়েছি। রাতের বেলা ভাল্ভ্ খুলে দিয়ে পাইপের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। গ্যাসে ভর করে লাফ দিয়ে আকাশে চড়ে যায় আগুন। আভা ছড়িয়ে পড়ে বহুদূর পর্যন্ত। রাতের বেলা এ কিসের আলো বুঝতে পারে না এ অঞ্চলের মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। ওরা ভাবে শয়তানের আগুন। ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।'

'সেদিন আলো দেখার সময় বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছিলাম। কিসের শব্দ ওটা?' জানতে চাইল কিশোর।

'ও কিছু না,' ব্যারন বলল। 'ফল্টি ইগনিশন। আগুন ধরানোর সময় ওরকম ভুলভ্রান্তি হয় মাঝে মাঝে।'

ওয়াকার কোম্পানির কাজ ভণ্ডুল করতে চায় কেন ব্যাখ্যা করে বলল সে। রাস্তা তৈরি হলে লোক আসতে থাকবে। প্রাকৃতিক ব্রিজের মধ্যে ব্যারনের ঘাঁটি আর নিরাপদ থাকবে না তখন। গ্যাসের খবরটাও চাউর হয়ে যাবে।

নরম্যান হেগকে কিভাবে কাজ করতে বাধ্য করেছে, প্রশ্ন করে সেটাও জেনে নিল কিশোর।

'ছেলেটা কাজের,' ব্যারন জানাল। 'তবে কাজের লোক অনেকই পাওয়া যায়, সেজন্যে তাকে আটকাতাম না। ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে ও আমার ঘাঁটি আবিষ্কার করে ফেলেছিল। তাকে বললাম, বাঁচতে চায়, না মরতে। বাঁচতে চাইল। তখন বললাম, কথা যদি ফাঁস করে, সে নিজে তো মরবেই, তার বাপের অবস্থাও হবে রাশেদ পাশার মত।'

চাচাকে কি করে ধরেছিল, জানতে চাইল কিশোর।

ব্যারন জানাল, খুঁজতে খুঁজতে কুয়াগুলোর কাছে চলে এসেছিলেন রাশেদ পাশা। প্রহরীরা দেখে ফেলে। কোনমতে পালিয়ে বাঁচেন রাশেদ পাশা। হাতের ব্রীফকেসটা নিয়ে যেতে পারেননি। ওটা পড়ে যায় আগুনের মধ্যে। পোড়া অবস্থায় সেটা কুড়িয়ে পায় প্রহরী। ব্যারনের কাছে নিয়ে আসে। ওয়াইল্ড টাউন থেকে

বেরিয়ে যাওয়ার আগে রাশেদ পাশাকে ধরে আনতে লোক পাঠায় সে।

'ধরে নিয়ে এল ওরা,' ব্যারন বলল। 'তারপর আর কি। আমার স্পেশাল ডানজনে কয়েদ করে রাখলাম। বোকার মত একদিন পালাতে চেয়েছিল। সে-চেষ্টা যাতে আর না করতে পারে তার ব্যবস্থা করলাম। ঘাড়ে বাড়ি মেরে নরম করে দিলাম খানিকটা।'

'ব্যবস্থা' বলে কি বোঝাতে চেয়েছে ব্যারন, বুঝতে পারল কিশোর। রাগে মুঠো হয়ে গেল হাতের আঙুল। 'তারপরেও আটকাতে পারেননি তাকে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল কিশোর। 'ফাটক খাটা ইঁদুরের সাধ্য কি সিংহকে আটকায়!'

'সস্তা সিনেমার হিরোগুলোর মত বাগাড়ম্বর ভালই করতে পারো দেখি,' রাগ করল না ব্যারন, গা-জ্বালানো হাসি হাসল। বন্দিদের অসহায়ত্ব দেখে মজা পাচ্ছে যেন। 'নিশ্চয় হুডিনির কাছ থেকে ম্যাজিক শিখে এসেছিল তোমার চাচা। আগে জানলে ম্যাজিকটা শিখতে চাইতাম। আর কোনদিন হবে না। মগজটা বোধহয় চিরকালের জন্যেই বাতিল হয়ে গেছে। অত জোরে মারতে মানা করেছিলাম রিডকে। কিন্তু ওটা হাঁদা তো…'

'হাঁদার শিষ্য হাঁদা হবে তাতে আর অবাক হওয়ার কি আছে। আপনারই তো চামচা। বোকার স্বর্গে বাস করছেন আপনি, ব্যারন,' রাগিয়ে দিয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করানোর চেষ্টা চালাল কিশোর যাতে পালানোর সুযোগ বের করে নিতে পারে। 'আগের বার তো দু'বছর খেটে এসেছেন, এবার ঢুকলে আর বেরোনো লাগবে না। সারাজীবন ঘানি টানতে হবে।' টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'চামচারাও বাঁচতে পারবে না।'

টেবিল ঘিরে বসা চারজনেরই নজর এদিকে। কথা শুনছে। কিশোরের কথায় রেগে গিয়ে লাফিয়ে উঠল একজন। 'দিই এখনই শেষ করে!'

হাত নেড়ে তাকে বসতে ইশারা করল ব্যারন। বলল, 'বোসো, বোসো, অত তাড়া কিসের। আছেই তো হাতে।' কিশোরের দিকে ফিরে বলল, 'আমাকে সন্দেহই করবে না পুলিশ। তোমাদের হিল্লে করার পর ড্যান ক্লকাসকেও ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করব। পুলিশের কাছে কোন প্রমাণই থাকবে না কোন কিছুর।'

কিশোররা যখন ব্যারনের সঙ্গে তর্ক করছে, মুসা তখন রিড আর জারনকে প্রলুব্ধ করায় ব্যস্ত। চাঙড়ের ভেতর থেকে ওদের বেরোতে দেখেছে সে। বুঝে ফেলেছে, কিশোর আর রবিন গিয়ে শত্রুদের খপ্পরে পড়েছে। ওদের বাঁচাতে হলে দ্রুত কিছু করা দরকার।

লোক দুটো ব্রিজের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। পা টিপে টিপে জীপের কাছে চলে এল মুসা। জীপের মেঝেতে একটা টুলবক্স পড়ে থাকতে দেখল। একটা মোটা স্ক্রু-ড্রাইভার আর একটা হাতুড়ি বের করল বাক্স থেকে। জীপের হুড তুলে অন্ধকারে হাতড়াতে শুরু করল। তারগুলো খুঁজে বের করে আন্দাজেই ইগনিশন অন করে দিল। চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন।

যন্ত্রপাতিগুলো হাতে নিয়ে মরিয়া হয়ে ছুটল সে। একপাশ দিয়ে প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে উঠে পড়ল ব্রিজের ওপর। ব্রিজের তলায় যেখানে ফোকরটা আছে, তার

ঠিক ওপরে সরু একটা ফাটল খুঁজে বের করল। তারমধ্যে ঢুকিয়ে দিল স্ক্রু-ড্রাইভারের মাথা। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পুরোটা গেঁথে দিল চুনাপাথরের মধ্যে। পর্বতারোহীদের পিটনের মত একটা পিটন তৈরি করে তাতে পেঁচিয়ে বাঁধল নাইলনের দড়ির একমাথা। অন্য মাথা বাঁধল কোমরের বেল্টের সঙ্গে।

'এটাই আমার একমাত্র সুযোগ,' মনে মনে বলল সে। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে।

দড়িটা শক্ত করে চেপে ধরে ব্রিজের একপাশে ঝুলে পড়ল। ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগল ফোকরটার কাছে। চূড়ান্ত মুহূর্ত এসে গেছে। পা দিয়ে পাথরের গায়ে জোরে ঠেলা দিল, একই সঙ্গে সড়সড় করে ছেড়ে দিল প্রায় দশ ফুট দড়ি। পেন্ডুলামের মত দুলতে শুরু করল তার দেহটা।

আগে-পিছে দোল দিতে দিতে গতি বাড়াচ্ছে। লক্ষ্য, খিলানের নিচের ফোকরটা। পারবে? দুই-দুইবার ফোকরটা কয়েক ইঞ্চির জন্যে মিস করল তার পা। তৃতীয়বারের চেষ্টায় সফল হলো। শরীরটাকে বাঁকিয়ে, পা দুটো ফোকরে ঢুকিয়ে দিল। ঢুকে পড়ল ফাঁপা ব্রিজের ভেতরে।

শ্রান্ত হয়ে পাথুরে মেঝেতে এলিয়ে পড়ল সে। কয়েক সেকেন্ড পড়ে থাকল একভাবে। তারপর উঠে দাঁড়াল। বেল্ট থেকে খুলে দিল দড়ি। ভারী একটা পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে রাখল প্রান্তটা, যাতে ফোকর গলে পড়ে যেতে না পারে।

হ্যারিকেনের আলোয় পথ দেখে প্যাসেজওয়ে ধরে এগিয়ে চলল সে। ভাবছে, জীপের ইঞ্জিন চালু করে রেখে আসার চালাকিটা কাজে দেবে তো? দিক বা না দিক, এখন আর কিছু করার নেই। যা ঘটার ঘটবে।

ভাবনাটা ওর মাথা থেকে দূর করে দেবার আগেই চিৎকার শোনা গেল সুড়ঙ্গের কোনখান থেকে, 'অ্যাই, জীপ চালু করল কে?'

পাথুরে দেয়ালের একটা গভীর খাঁজে মিশে দাঁড়াল সে। কানে আসছে ভারী বুটের শব্দ। বদ্ধ জায়গায় পাথুরে মেঝেতে অতিরিক্ত জোরে শব্দ হচ্ছে। লোকগুলো বাইরে বেরিয়ে গেল কিনা নিশ্চিত হয়ে নিয়ে আবার পা বাড়াল। খুঁজতে খুঁজতে একটা ঘরের কাছে চলে এল। পাথর খুঁড়ে তৈরি করা। তার ভেতরে দেখতে পেল কিশোর আর রবিনকে।

'মুসা!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'তুমি ঢুকলে কি করে...'

'পরে শুনো। জলদি এসো এখন!'

হাত বাঁধা অবস্থায়ই মুসার পেছন পেছন দৌড়াতে শুরু করল দুজনে। ফোকরটার কাছে চলে এল, যেটা দিয়ে ঢুকেছে মুসা। ছুরি বের করে দুজনের বাঁধন কেটে দিল সে। দড়ির প্রান্তটা পাথর থেকে খুলে নিতে নিতে বলল, 'আমাদের দেখলেই গোলাগুলি শুরু হয়ে যেতে পারে। একটা মুহূর্তও আর দেরি করবে না তাহলে। দড়ি ছেড়ে দিয়ে নিচের পানিতে ঝাঁপ দেবে।'

তার কথা শেষও হলো না, গুলির শব্দ শোনা গেল।

'জীপের দিকে গুলি চালাচ্ছে ওরা,' মুচকি হেসে মুসা বলল। 'ওরা ভেবেছে, কেউ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। এসো।'

দড়ির মাথার দিকে বেশ কিছুটা ছেড়ে দিয়ে মাঝামাঝি অংশ একটা লম্বা পাথরে বাঁধল মুসা। দড়ি ধরে ফোকরের মধ্যে ঝুলে পড়ল কিশোর। তার পেছনে গেল রবিন। সবার শেষে মুসা। হাত ছেড়ে দিয়ে টপাটপ নিচের পানিতে লাফিয়ে পড়ল ওরা। সাঁতরাতে শুরু করল। অন্য পাড়ে উঠে যাওয়ার চিন্তা।

বনের মধ্যে জোনাকির আলোর মত অসংখ্য টর্চ জ্বলতে দেখা গেল। হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে গেল গোলাগুলি।

অকস্মাৎ এত নীরবতা স্নায়ুর ওপর চাপ দিতে শুরু করল। তীরে উঠে অতি সাবধানে কৃত্রিম জোনাকিগুলোর দিকে এগিয়ে চলল তিনজনে। কারা জ্বেলেছে ওই আলো, দেখে আনন্দে নেচে উঠল প্রাণ।

পুলিশে পুলিশে ছেয়ে গেছে উপত্যকাটা। ঘিরে ফেলেছে ব্যারনের দলকে। পুলিশের সঙ্গে রয়েছে বিড, নরম্যান হেগ আর ফোরম্যান বোম্যান।

তিন গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করল বিড, 'ব্যারন কই? পালিয়েছে?'

ব্রিজটা দেখাল কিশোর, 'ওর মধ্যে।'

গর্তের মধ্যে গ্যাস বোমা ছুঁড়তে শুরু করল পুলিশ। কাঁদানে গ্যাসের জ্বলুনি সহ্য করতে না পেরে কাশতে কাশতে বেরিয়ে এল ব্যারন। আর বোমা না মারতে অনুরোধ করল। বড় বড় বোলচাল বন্ধ হয়ে গেছে।

গ্যাস ছোঁড়া বন্ধ করল পুলিশ।

পরস্পরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল গোয়েন্দারা।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'বিড, এ জায়গাটা খুঁজে পেলে কি করে?'

'তোমরা তো চলে গেলে, বিছানায় থাকতে পারছিলাম না কোনমতে,' বিড বলল। 'কেবলই মনে হচ্ছিল, বিপদে পড়বে তোমরা। একটু সুস্থ বোধ করতেই বেরিয়ে পড়লাম। কাকতালীয় ভাবে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল হেগের সঙ্গে। সে-ও তোমাদের খোঁজেই শহরে এসেছিল। ব্যারনকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করার জন্যে। তাকে নিয়ে সোজা থানায় চলে গেলাম। পুলিশকে রাজী করাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। অফিসার ডারবি অনেক সাহায্য করেছে।'

ব্যারনের দলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলল পুলিশ। রাস্তা থেকে একটা দল চলে গেল ক্যাম্প সাইটে। ওখানে গিয়ে কার্ল হ্যারিস আর তার যে দু'চারজন সাঙ্গপাঙ্গ আছে তাদেরকে ধরল।

প্রিন্স হোটেলের বেলম্যানকেও ছাড়ল না পুলিশ। চাপ দিতেই স্বীকার করল লোকটা, ব্যারনের টাকা খেয়ে অনেক অকাজ করেছে সে। মেসেজ রেখে আসতে গিয়ে বিডকে বাড়ি মেরেছে সে-ই। টেলিফোনে আড়ি পেতেছে।

তিন গোয়েন্দার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো লেফটেন্যান্ট ডারবি। ব্যারনকে দেখিয়ে বলল, 'সাংঘাতিক এক ক্রিমিন্যালকে পাকড়াও করলে তোমরা। ছদ্মবেশ নেয়ার ওস্তাদ এই লোক। ওর আসল নাম নিউট রবসন। হাসপাতালে দূর সম্পর্কের ভাই সেজে এই লোকই দেখা করতে গিয়েছিল আহত নেমরের সঙ্গে।'

মুচকি হাসল কিশোর। 'শুধু কি তাই। ডাক্তার, চোর, ভিখিরি, কত কিছুই না সেজেছে।'

তার দিকে তাকিয়ে আছে ব্যারন। আগুন জ্বলছে দু'চোখে।

আরও একজন প্রশংসা করতে লাগল গোয়েন্দাদের। ফোরম্যান বোম্যান। বলল, 'অনেক উপকার করেছ তোমরা আমাদের। কোম্পানিও বন্ধ হবে না আর, আমাদের চাকরিও যাবে না। এখান থেকে গেলে চাকরি পাব না, তা নয়, তবে এখানে কাজ করতে ভাল লাগছে আমাদের।'

হেগও একমত হলো তার সঙ্গে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

পরদিন প্লেনে করে রকি বীচে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা আর বিড।

বাড়ি ফিরে চাচাকে বাড়িতে দেখতে পেল কিশোর। আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'চাচা, তুমি ভাল হয়ে গেছ!'

রাশেদ পাশা বললেন, 'দারুণ দেখালি এবার, কিশোর! গোয়েন্দার গর্ব তোরা!'

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল কিশোর পাশার মুখ। 'থ্যাংকস। তোমার কেসটার যে সমাধান করে দিতে পারলাম, সে-জন্যে আমরাও খুব খুশি। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপারে খটকা রয়ে গেছে আমার এখনও।'

চাচার বিছানার পাশে বসে পড়ল সে।

কি ঘটেছিল, খুলে বললেন রাশেদ পাশা। জানা গেল অ্যাটাকানে রওনা দেবার আগে ফাইল থেকে দুটো কার্ড আর ডসিয়ার বের করে নিয়েছিলেন তিনি–একটা রুনাক, আরেকটা রবসনের। তদন্ত করে পাওয়া কিছু কিছু সূত্র ওদের দিকে নির্দেশ করছিল। তাঁর ব্রীফকেসটা ব্যারনের হাতে পড়ল। রেকর্ডপত্রগুলো দেখতে পেল সে। দেরি না করে রকি বীচে উড়ে এল। বোরিসের বাড়ি থেকে রুনাকের কার্ডটা চুরি করল, কারণ সে বুঝতে পেরেছিল তিন গোয়েন্দা ওর পেছনে লাগবেই।

রাশেদ পাশা বললেন, 'তোদেরকে রুনাকের কবরের সন্ধান বাতলে দেয়ার পর নিশ্চিন্ত হলো রবসন। ধরে নিল, নিরাশ হয়ে ফিরে আসবি তোরা। সূত্রও খুঁজে পাবি না আর, তার পেছনেও লাগতে পারবি না।' মুচকি হাসলেন তিনি, 'কিন্তু তিন গোয়েন্দাকে চিনতে ভুল করেছিল সে। রাশেদ পাশাকে ঠেকানো যায়, কিন্তু কিশোর-মুসা-রবিনকে যায় না, কি বলিস?'

ব্রিজের পাতালঘর থেকে চাচা কি করে পালাল, জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নিজের বিপদের পরোয়া না করে, সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল নরম্যান হেগ,' রাশেদ পাশা বললেন। 'একদিন শুধু হেগকে ব্রিজের পাহারায় রেখে চলে গেল পুরো দলটা। হাতকড়া খুলে দিয়ে আমাকে রাস্তার কাছে নিয়ে এল সে। কাছেই পাহাড়ের ওপর ওদের বাড়ি। ঘোড়ার গাড়িতে করে আমাকে ওয়াইল্ড টাউনে পৌছে দিল ওর বাবা মিস্টার হেগ। ছেলেটা আমাকে বলেছিল, ফিরে গিয়ে নিজের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে বসে থাকবে, যাতে ব্যারন তাকে সন্দেহ করতে না পারে; ভাবে, আমিই তাকে কাবু করে বেরিয়ে গেছি।'

সন্ধ্যার পর রাশেদ পাশাকে দেখতে দল বেঁধে ইয়ার্ডে এসে হাজির হলেন মিস্টার ওয়াকার, তাঁর ছেলে বিড, টম, রিচি, রবিন আর মুসা।

নানা কথার মাঝে মিস্টার ওয়াকার জানালেন, ওই প্রাকৃতিক ব্রিজটা সহ আশেপাশের সমস্ত জায়গা কাউন্টির কাছ থেকে লিজ নিয়ে নেবেন তিনি। রাস্তা তৈরি

শেষ করে একটা পার্ক বানাবেন ব্রিজটাকে ঘিরে। ব্রিজটা হবে প্রধান ট্যুরিস্ট আকর্ষণ।

সবাই হই-হুল্লোড় করতে লাগল। আনন্দে হাততালি দিতে লাগল।

হেসে মুসার দিকে তাকাল রবিন। 'তোমার লেমোনেড আর হট-ডগের দোকানের পজিশন তাহলে পাক্কা?'

'দূর, কে যায় দোকান দিতে!' মুখ বাঁকাল মুসা। 'দেখে তখন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, বলে ফেলেছিলাম। যা সুন্দর জায়গা আর আবহাওয়া, সারাক্ষণই খিদে পেতে থাকবে। শেষে দেখা গেল নিজের দোকানের মাল নিজেই খেয়ে ফতুর করে ফেললাম। ব্যস, লাল বাতি!'

তার কথা শুনে হই-হুল্লোড় বেড়ে গেল আরও।

-: শেষ :-

পিশাচকন্যা

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

'হঠাৎ করেই, প্রায় অলৌকিক ভাবে ক্ষমতাটা পেয়ে গেছি আমি,' রিটা গোল্ডবার্গ বলল। 'কিভাবে পেয়েছি, জানতে চাও?'

'চাই,' বলে মুসা আর জিনার দিকে তাকাল রবিন।

নীরবে মাথা ঝাঁকাল মুসা।

জিনা বলল, 'বলো।'

'একেবারে গোড়া থেকে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'আমরা অনেক চিন্তা-ভাবনা আলাপ-আলোচনা করে একমত হলাম, কিশোরের ব্যাপারে কেউ যদি কোন সূত্র দিতে পারে, সে তুমি। ওকে খুঁজে বের করতে হলে সব তথ্য আমাদের জানা দরকার। কিছুই মিস করা চলবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার এই ক্ষমতা পাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে কিশোরকে উদ্ধারের পথ।'

'ঠিক আছে, বসো তোমরা,' বলে লিভিং-রুম থেকে উঠে চলে গেল রিটা। ফিরে এল কয়েক মিনিটের মধ্যে। বড় একটা বাঁধানো খাতা নিয়ে এসেছে হাতে করে। রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নিয়ে যাও এটা। আমার স্পেশাল ডায়েরী। পড়লে সব জানতে পারবে। আগে পড়ে নাও, তারপর কিভাবে তোমাদের সাহায্য করা যায়, আলোচনা করব। পড়ে তাড়াতাড়ি ফেরত দিও।'

'দেব,' সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে ডায়েরীটা নিল রবিন।

'তোমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ যেন ডায়েরীটা পড়তে না পারে,' সাবধান করে দিল রিটা।

'চোখেও দেখবে না কেউ,' রবিন বলল। 'বড় খাম আছে তোমার কাছে?'

'আছে।'

রিটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুসা আর জিনাকে নিয়ে বাড়ি চলে এল রবিন। মা-বাবা বাড়ি নেই, কাজে বেরিয়েছেন। নিরাপদে ডায়েরী পড়তে কোন অসুবিধে হবে না।

লিভিং-রুমে ঢুকেই মুসা বলল, 'মেরিআন্টির একটা খবর নেয়া দরকার।'

ফোন করল সে। রাশেদ পাশা ধরলেন।

কয়েক মিনিট কথা বলে রিসিভার রেখে দিয়ে ফিরে তাকাল মুসা, 'আন্টি এখনও বিছানায়। আঙ্কেলের মনমেজাজও ভাল না। ব্যবসা, কাজে-কর্মে মন নেই।'

'থাকার কথাও নয়,' জিনা বলল। 'কিশোরের খোঁজ না পেলে কোনদিনই আর ভাল হবেন না আন্টি...'

বাধা দিয়ে রবিন বলল, 'কথা আর না বাড়িয়ে কাজে লেগে পড়া যাক। ডায়েরীতে কি আছে পড়ছি আমি। তোমরা কাছে এসে বসো।'

ডায়েরীটা খুলল রবিন। সুন্দর হাতের লেখা রিটার। গোটা গোটা অক্ষর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পড়তে কোন অসুবিধা হয় না।

জোরে জোরে পড়তে শুরু করল সে।

মহিলাটাকে স্রেফ একটা ডাইনী মনে হলো আমার। তবু সাহস করে সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকালাম। আমার চেয়ে বেশ খানিকটা লম্বা। তাতে কি?—মনকে বোঝালাম। আমার বয়েস কম। ক্ষিপ্রতা বেশি। লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি আমি।

কাবু ওকে করব আমি, তবে হাতাহাতি লড়াইয়ে নয়, কথার মারপ্যাঁচে।

এতদিন ধরে যা শিখে এসেছি, তাতে একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার, কোন কিছুতে জিততে হলে কিংবা কোন জিনিস পেতে চাইলে একাগ্রভাবে সেটা চাইতে হবে; ইচ্ছে শক্তিটাই হলো আসল।

বাজার করাটা খুব কঠিন কাজ। অন্তত আমার কাছে। রীতিমত যুদ্ধ করা মনে হয়।

চুলের গোড়ায় আঙুল চালিয়ে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করলাম। আমার সবচেয়ে সুন্দর হাসিটা তাকে উপহার দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিক্রির জন্যে? আগামী সপ্তায় থাকবে তো?'

ডাইনী মহিলাটা একজন সেলস লেডি। নাম ক্লডিয়া। বুকে ঝোলানো নেম-ট্যাগে সোনালি অক্ষরে লেখা রয়েছে নামটা।

আমার কথায় চোখের একটা পাপড়িও কাঁপাল না। বরং তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মাথাটাকে পেছনে ঝটকা দিয়ে ছোট্ট একটা হাসি দিল।

এই একটা জিনিস একেবারেই সহ্য করতে পারি না আমি, তাচ্ছিল্য করা।

'বিক্রি?' উপহাসের সুরে বলল, 'এটা সাধারণ ব্লাউজ নয়, খুকী। তুমি চিনতে ভুল করেছ। প্যারিস, লন্ডন, মিলানের সামার কালেকশনে শো করা হয়েছিল। কিনতে হলে প্রচুর টাকা লাগবে। যদি না থাকে, আলোচনা করেও লাভ নেই। কিচ্ছা এখানেই খতম।'

পিত্তি জ্বলে গেল আমার। মাঝে মাঝে ভেবে অবাক লাগে, এ ধরনের চাঁড়ালগুলোকে কোত্থেকে জোগাড় করে দোকান মালিকরা! দুনিয়ার আর কোথাও যেন জায়গা না পেয়ে খুঁজে খুঁজে রকি বীচে এসে হাজির হয় এরা। আজকে আমার জন্মদিন। আর আজই কিনা দেখা হলো এমন একটা জঘন্য চরিত্রের সঙ্গে।

অন্য কোনদিন হলে মহিলার এ কথা শোনার পর আর একটা সেকেন্ডও দাঁড়াতাম না। সোজা ঘুরে হাঁটা দিতাম। কিন্তু আজ আমি নিজের পয়সায় বাজার করতে আসিনি। তাতে সাহস বেড়ে গেছে।

টান দিয়ে পকেট থেকে বাবার আমেরিকান এক্সপ্রেস প্ল্যাটিনাম কার্ডটা বের করলাম। আমার প্রতি জন্মদিনে কেনাকাটা করতে পাঠানোর সময় হাতে তুলে দেয় এটা বাবা, যাতে ইচ্ছেমত খরচ করতে পারি। মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিনতে চাইলে নিশ্চয় পরা যাবে? গায়ে ফিট হলো কিনা বুঝব কি করে?'

আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে মাথাটা সামান্য একটু নোয়াল

মহিলা। ঝাঁকি দিতেও ইচ্ছে করছে না। যেন অতি তুচ্ছ একটা জীব আমি।

ওর সামনে থেকে সরার জন্যে বললাম, 'তাহলে চেঞ্জিং রুমটা দেখিয়ে দিন, প্লীজ।'

আমার হাতের প্লাস্টিকের কার্ডটা মনোযোগ দিয়ে দেখল ক্লডিয়া। তারপর কোন কথা না বলে ঘুরে রওনা হয়ে গেল দোকানের পেছন দিকে। কয়েক কদম গিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'এক সেকেন্ড। আসছি।'

সাধারণত এ ধরনের বড় দোকানগুলোকে আমি এড়িয়েই চলি। কিন্তু ব্লাউজটার ওপর চোখ পড়ে গেছে আমার। সেই মে মাস থেকে উইনডোতে ঝোলানো দেখে আসছি। এটা জুন। এতদিনেও ব্লাউজটা মাথা থেকে দূর করতে পারিনি আমি। কি করে পারব? আমার বয়েসী কোন মেয়েই পারবে না। এত সুন্দর জিনিস! কি তার রঙ: খাঁটি বিদ্যুৎ-নীল। হাতা কাটা। হাতে তৈরি লেস আর সিল্কের সুতোর অলঙ্করণ। একটা অদ্ভুত ব্যাপার—মনে হলো, আগে কোথাও দেখেছি ব্লাউজটা। ছোঁয়ার জন্যে, আপন করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম।

ক্লডিয়া বলে গেল 'এক সেকেন্ড', কিন্তু ফিরল পুরো পাঁচ মিনিট পর। মুখটাকে গম্ভীর করে রেখে জানাল, 'তোমার জন্যে একটা চেঞ্জিং রুম রেডি করতে দেরি হয়ে গেল। এসো।'

রেডি করেছে মানে! অবাক হলাম। আমি তো জানতাম পোশাকের দোকানে চেঞ্জিং রুম রেডিই থাকে। ও কি আমাকে চোর ভেবেছে? গোপন ক্যামেরা চালু করে রেখে এসেছে?

"থাবড়া মেরে দেয়া উচিত ছিল বদমাশ বেটিটার মুখে!" বলে উঠল মুসা। ছেদ পড়ল রবিনের পড়ায়। ডায়েরী থেকে মুখ তুলে তাকাল।

"যা-ই বলো," মাথা দুলিয়ে বলল জিনা, "রিটা লেখে কিন্তু চমৎকার। ভাষা ভাল। একেবারে ছবি দেখিয়ে দেয়। প্র্যাকটিস রাখলে বড় লেখক হতে পারবে।"

"হুঁ," মাথা ঝাঁকাল রবিন।

"পড়ো, পড়ো, এরপর কি হয়েছে শোনা যাক।"

আবার ডায়েরীর দিকে চোখ নামাল রবিন।

চেঞ্জিং রুমে ঢুকে আর একটা মুহূর্তও দেরি করলাম না। ক্যামেরার কথা মাথা থেকে উধাও করে দিয়ে পরে ফেললাম ব্লাউজটা। এমন ভাবে ফিট করল, যেন আমার জন্যেই মাপ দিয়ে বানানো হয়েছে।

আয়নার দিকে তাকালাম। সত্যি, দারুণ মানিয়েছে আমাকে। তবে দামটা অতিরিক্ত। তিনশো ডলার। একটা ব্লাউজের দাম তিনশো, কল্পনা করা যায়! বাবার পকেট থেকে এতগুলো টাকা খসাতে মায়াই লাগল আমার। কিন্তু কোনমতেই লোভ ছাড়তে পারলাম না। আয়নার দিক থেকেও চোখ সরাতে পারলাম না।

একদৃষ্টিতে প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কি যেন কি ঘটে যেতে লাগল আমার ভেতরে। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম। সাংঘাতিক ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে যেন আমার মধ্যে। ব্লাউজটা আগে কোথাও দেখেছি—বার বার মনে হচ্ছে এ

কথাটা। কোথায়? অন্য কোন দোকানে? কোন ফ্যাশন শো'তে?

উঁহু, দোকানে নয় বা কোন স্টলে নয়! ব্লাউজটা যেন আমারই ছিল, আমি নিজেই পরেছি কোন এক সময়! কিন্তু তা কি করে সম্ভব?

যতই মনে করার চেষ্টা করলাম, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল স্মৃতি। ক্যামেরায় তোলা ছবির মত ভেসে উঠল মনের পর্দায়। চোখ বুজে মনের চোখে ছবিগুলো দেখার চেষ্টা করলাম।

জোরাল একটা গুঞ্জন কানে এল। মনে হলো ছাতের কাছ থেকে আসছে। অনেক বেড়ে গেল শব্দটা। মাথার ওপর ফ্লোরেসেন্ট লাইটগুলো মিটমিট করতে করতে নিভে গেল।

অন্ধকার!

হঠাৎ থেমে গেল গুঞ্জন। আলো জ্বলে উঠল আবার।

ভয় পেয়ে গেলাম। ছুটে বেরোলাম বদ্ধ ঘরটা থেকে। ক্লডিয়া যেখানে থাকার কথা, সেখানে নেই। তার জায়গায় অন্য এক মহিলা। চুলের ছাঁট থেকে শুরু করে মেকআপ, জুতো সবই সেকেলে। অনেক পুরানো ফ্যাশন। আরও ঘাবড়ে গেলাম। মগজের গোলমাল হয়নি তো আমার!

ক্লডিয়ার চেয়ে কোন দিক দিয়েই ভাল নয় এই মহিলাটিও। নেম-ট্যাগে নাম লেখা: গ্যারেট। শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'চেঞ্জিং রুমে কি করছিলে?'

'চেঞ্জিং রুমে কি করছিলাম মানে?' আমি অবাক।

'আমি জানতে চাইছি, কি পরছিলে?'

নাহ্, দোকানটার বদনাম না করে আর পারছি না। এখানকার সব কর্মচারীই দেখা যাচ্ছে ক্লডিয়ার মত। ভাল ব্যবহার শেখেইনি। কিছুটা রুক্ষস্বরেই জবাব দিলাম, 'গায়ে যে ব্লাউজটা দেখছেন, এটাই পরছিলাম।'

চারপাশে তাকিয়ে অদ্ভুত সব পরিবর্তন লক্ষ করলাম। কোন কিছুই যেন স্বাভাবিক লাগছে না। ঘটছেটা কি এখানে! কয়েক মিনিট আগে যে ডেকোরেশন দেখে গিয়েছিলাম, সেটা বদলে গেছে। এত তাড়াতাড়ি কি করে বদলাল?

'দেখো মেয়ে,' ধমকের সুরে বলল গ্যারেট, 'আমার দোকানের মধ্যে কোন রকম গণ্ডগোল চাই না। যাও, বেরোও!'

'কিন্তু…আমি…'

'এক্ষুণি!' আরও জোরে ধমকে উঠল গ্যারেট। 'কি সব পোশাক পরেছে দেখো! বিচ্ছিরি! আমার কাস্টোমাররা তোমাকে দেখে চমকে যাচ্ছে। যাও, যাও, বেরোও!'

এতক্ষণে লক্ষ করলাম, দোকানের সব লোক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। যেন আমি একটা চিড়িয়া। হাঁ করে দেখছে।

'যাচ্ছি। তবে একটা কথা, ম্যা'ম,' বলতে ছাড়লাম না, 'ওদের চমকে যদি কেউ দিয়েই থাকে, সেটা আমি না, আপনি।'

'কি বললে?'

'ঠিকই বলেছি। পাগলের চেয়ে ডাইনীকে অনেক বেশি ভয় করে লোকে।'

জবাব আটকে যাওয়ায় মরা মাছের মত হাঁ হয়ে গেল গ্যারেটের মুখ।

প্রতিশোধ নিতে পেরে খুশিমনে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম আমি।

পথে বেরিয়ে হতবাক। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো শহরটাই কেমন পাল্টে গেছে। মানুষজন, জিনিসপত্র, সব কিছু এক লাফে যেন ফিরে গেছে তেরো বছর আগে। কি বিচ্ছিরি সব পোশাক পরেছে লোকে। প্যান্ট, জুতো! আহা, কি ছিরি! ওয়াক! বমি আসে দেখলে! আর একটা ব্যাপার, সবাই শীতের পোশাক পরেছে।

সন্দেহ হলো। একটা দোকানে ক্যালেন্ডার ঝোলানো দেখে সেদিকে এগোলাম। স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ১৯৮৭-র শীতকাল। এক লাফে এক যুগের বেশি পেছনে চলে এসেছি। অবিশ্বাস্য! এ কি করে সম্ভব!

বোকার মত তাকিয়ে রইলাম রাস্তার লোকজনের দিকে। ওরাও তাকাতে লাগল আমার দিকে। যেন আমি একটা কি!–পাগলা গারদ থেকে এইমাত্র ছাড়া পেলাম। গরমকালের পোশাক পরে আছি আমি। প্রচণ্ড উত্তেজনায় শীতও টের পাচ্ছি না।

মনে হলো, সব রহস্যের জবাব রয়েছে ওই চেঞ্জিং রুমটায়। পায়ে পায়ে আবার মলের দিকে ফিরে চললাম।

মলে ঢুকে এলিভেটরের দিকে এগোনোর সময় দেখলাম, গরম কাপড় পরে ভালুক সেজে যাওয়া একটা ছেলে দোকানের বিজ্ঞাপন করছে। হাতে একগাদা কাগজ। আমার দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিতে গিয়ে থমকে গেল। কুঁচকে গেল ভুরু। ভাবল বোধহয়, আমি তার প্রতিদ্বন্দ্বী। আজব পোশাক পরে তার জায়গা দখল করতে এসেছি।

ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করলাম না। তার হাত থেকে ছোঁ মেরে একটা কাগজ কেড়ে নিয়ে, একটা মুচকি হাসি উপহার দিয়ে সরে এলাম।

এলিভেটরে উঠলাম। আমি একা। দরজা বন্ধ হতে শুরু করল। ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, এখনও একই ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে ছেলেটা।

কাগজটার পেছনে পেন্সিলে লেখা রয়েছে কি যেন। দাগ পড়ে গেছে। উল্টে দেখলাম, একটা ফোন নম্বর। ছেলেটারই হবে হয়তো।

দরজাটা পুরো লেগে যাবার পর মাথার ওপরের গুঞ্জনটা কানে এল। আলো মিটমিট করতে লাগল এলিভেটরের। নিভে গেল।

বিদ্যুৎ চলে গেল নাকি! ঘাবড়ে গিয়ে অ্যালার্ম বেলের বোতামটা টিপতে যাব, ফিরে এল আলো। মুহূর্ত পরেই দরজা খুলে গেল। তিনতলার মেঝেতে পা রাখলাম আমি।

বেরিয়ে এসে চারপাশে তাকালাম।

আবার সেই পরিচিত দৃশ্য। আমার পরিচিত পরিবেশ।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

শিওর, আমি অতীতে চলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেছি বর্তমানে। সত্যি কি এসেছি? দোকানটাতে গেলেই বুঝতে পারব।

করিডর ধরে প্রায় দৌড়ে চললাম পোশাকের দোকানটার দিকে। ব্লাউজটা যেখানে ছিল। কিন্তু দুই কদমও এগোতে পারলাম না। সামনে এসে দাঁড়াল দুজন গার্ড।

'এই মেয়েটাই,' বলল একজন।
খপ করে আমার হাত চেপে ধরে টান দিল দ্বিতীয় গার্ড, 'এসো আমার সঙ্গে।'
'কোথায়?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।
'গেলেই টের পাবে, খুকী!'
'খুকী খুকী করছেন কেন আমাকে!' রেগে উঠলাম। 'আমার বয়েস কি খুব কম মনে হচ্ছে?'
কথার জবাব দিল না ওরা। একজন ওয়াকি-টকি বের করে কারও উদ্দেশ্যে কথা বলল, 'পেয়েছি ওকে। ধরে নিয়ে আসছি...'

রবিন এ পর্যন্ত আসতেই বাধা দিয়ে মুসা বলে উঠল, "দেখো, ভাই, আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে! গলা শুকিয়ে গেছে! কোক-টোক কিছু যদি থাকে, এনে দাও জলদি! খেলে হয়তো সহ্য করতে পারব।...বাপরে বাপ, কি কাণ্ড!"
"হ্যাঁ, অবাক হওয়ার মতই ঘটনা!" বিড়বিড় করল জিনা।
"আমি কিন্তু অবাক হচ্ছি না," ডায়েরীটা খোলা অবস্থায়ই সোফায় উপুড় করে রাখল রবিন। "সেদিন লেকের পাড়ে ইউ এফ ও'টা দেখার পর থেকে অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কোন কথাই আর অবিশ্বাস করব না। চোখের সামনেই তো তুলে নিয়ে গেল ওরা কিশোরকে।"
উঠে রান্নাঘরে চলে গেল রবিন। আভন থেকে বের করা গরম বার্গার, আর ফ্রিজ থেকে কোক নিয়ে ফিরে এল। সামনের টেবিলে রেখে মুসার দিকে তাকাল, "খাও।"
একটা বার্গার তুলে নিল জিনা। গেলাসে কোক ঢালল।
ডায়েরীতে কি লেখা আছে জানার জন্যে অস্থির হয়ে গেছে ওরা। তাড়াতাড়ি গপগপ করে গিলে নিয়ে খাওয়া শেষ করল।
ডায়েরীটা আবার তুলে নিল রবিন।
মুসার দিকে তাকাল জিনা। "পড়ার সময় আর বাধা দেবে না, বুঝলে! তাড়াতাড়ি পড়া শেষ করতে না পারলে রিটার সঙ্গে আলোচনায়ও বসা যাবে না। যত জলদি সম্ভব, খুঁজে বের করতে হবে কিশোরকে।'
"কিন্তু কোথায় আছে কিশোর?" মুসার প্রশ্ন।
"কাচু-পিকচুতে!" জানা থাকলে, জবাব দিতে পারত জিনা।

দুই

ভারী লাগামটা খচ্চরের পিঠের ওপর দিয়ে টেনে এনে শপাং করে বাড়ি মারল কিশোর।
'হাঁট, শয়তান কোথাকার!' রাগে চিৎকার করে উঠল সে। লাঙলের হাতল ধরে ঠেলা দিল জোরে। মাথা ঘুরিয়ে খচ্চরটাকে চোখে চোখে তাকাতে দেখে রাগ

আরও বেড়ে গেল।

'হাঁট! টান দে!' আরও জোরে খচ্চরের পিঠে বাড়ি মারল সে।

আস্তে এক পা বাড়াল জানোয়ারটা। তারপর আরেক পা।

পিছে পিছে হাঁটতে থাকল কিশোর। লাঙল ঠেলতে ঠেলতে ব্যথা হয়ে গেছে হাত। কাঁধ পোড়াচ্ছে চড়া রোদ। সকালটা অর্ধেক শেষ। সূর্যোদয় থেকে পরিশ্রম করে এতক্ষণে মাত্র দুটো ফালি চাষ দিতে পেরেছে।

এ ভাবে চললে খামারটা খোয়াতে হবে। ভাবনাটা শঙ্কা জাগাল মনে। এই খামারে জন্মায়নি সে। বাপ-দাদা চোদ্দ পুরুষে কখনও হালচাষ করেনি। কিন্তু তাকে করতে হচ্ছে, পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে।

পিঠ বেয়ে দরদর করে নামছে ঘাম। শার্টের হাতা দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছল। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি বা লেমোনেড পেলে খসখসে গলাটা ভেজানো যেত।

কিন্তু থামার সময় নেই। এগিয়ে যেতে হবে। খেতের শেষ প্রান্তের দিকে তাকাল। ভুলে থাকতে চাইল পানির কথা।

থেমে গেল আবার খচ্চরটা। টানতে চাইছে না আর। থুতনি বুকের কাছে নেমে এল কিশোরের। জানোয়ারটাকে সামলাতে গিয়ে পরিশ্রম যা হচ্ছে, তার চেয়ে নিজে টানলেও বোধহয় কষ্ট কম হত।

মাথার দোমড়ানো বাদামী হ্যাটটা খুলে নিয়ে রাগ করে মাটিতে আছড়ে ফেলল সে। গরম বাতাসে উড়িয়ে এনে মুখের ওপর ফেলতে লাগল বহুদিনের না কাটা লম্বা, কোঁকড়া চুলগুলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত পেছনে এনে কোমরে চাপ দিল। আগুনের মত পুড়িয়ে দিল যেন তীব্র ব্যথা। যতই দিন যাচ্ছে, পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে আরও। ফোঁস করে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, 'মিস্টার হার্ট, খচ্চরটাকে একটু হাঁটতে বলুন, প্লীজ!...আপনি বললেই ও হাঁটবে। আপনার কথা শোনে। আমাকে পাত্তাই দেয় না।'

বাড়ির দিকে তাকাল কিশোর। বিশাল ওক গাছটার নিচের কবর ফলক দুটো এখান থেকেও দেখা যায়। রোদের মধ্যেও গায়ে কাঁটা দিল তার। ইনডিয়ান দম্পতির মৃত্যুটা এখনও তার কাছে রহস্যময়।

নিজের অজান্তেই বুজে এল চোখের পাতা। সিসি আর হেনরিকে দেখতে পেল কল্পনায়। আবার চোখ মেলল। বিশাল বাড়িটাতে ওই দুটো ছেলেমেয়েকে নিয়ে একা থাকতে হয় তাকে।

কানে বাজতে লাগল লং জন হার্টের যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠ: ছেলেমেয়ে দুটোকে তুমি দেখো, কিশোর! তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম ওদের!

যে বিকেলে মারা গেছেন হার্ট আর তাঁর স্ত্রী কোরিনা, সেই বিকেলটা এখনও জ্বলজ্বলে তার স্মৃতিতে। ধূসর মেঘ জমেছিল আকাশে। ঠাণ্ডা বাতাসে ভেসে আসছিল বৃষ্টির গন্ধ। কাঠের দোতলা বাড়িটার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল সে। তাকিয়ে দেখছিল, স্ত্রীকে ওয়্যাগনে উঠতে সাহায্য করছেন হার্ট। দূরের এক আত্মীয় বাড়িতে একটা অনুষ্ঠানে যাবেন।

ওয়্যাগনে বসে মাথার টুপিটার ফিতে বেঁধেছেন কোরিনা। ফিরে তাকিয়েছেন কিশোরের দিকে, 'বাবা, ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখো। পারবে না?'

মাথা ঝাঁকিয়েছে কিশোর।

সিসি আর হেনরিকে বলেছেন কোরিনা, 'তোমাদের কিশোর ভাইয়ের কথা শুনবে তোমরা। কি, বুঝতে পেরেছ? নইলে কিন্তু আমরা ফিরে আসার পর কোন উপহার পাবে না।'

মুখ গোমড়া করে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়েছে সিসি। হেনরি কোন কথা বলেনি। ভ্রূকুটি করে আপনমনে ছেঁড়া একটা কাপড়ের তৈরি খেলনা ক্রমাগত ঘুরিয়েছে ছোট ছোট আঙুলে। গাল ফুলিয়ে আদুরে কণ্ঠে অনুরোধ করেছে, 'আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাব, কোরিআন্টি।'

'হেনরি, তোমাকে সিসি আর কিশোরের সঙ্গে এখানেই থাকতে হবে,' কঠোর হয়েছেন কোরিনা। 'লক্ষ্মী ছেলের মত থাকো। আসার সময় তোমাদের জন্যে অনেক কিছু নিয়ে আসব আমরা।'

'অনেক কিছু তো চাই না আমরা,' হিসিয়ে উঠেছে সিসি। 'আমরা তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই।'

সিসি আর হেনরির কাঁধে হাত রেখেছে কিশোর। 'থাক, যাবার দরকার নেই। নিতে যখন চাইছেন না কোরিআন্টি, নিশ্চয় কোন কারণ আছে। এখানেই থাকো তোমরা, আমার সঙ্গে। আমাকে খারাপ লাগে?'

জোরে জোরে মাথা নেড়েছে হেনরি আর সিসি।

'না না, তোমাকে খুব ভাল লাগে আমাদের, কিশোরভাই,' সিসি বলেছে। 'তোমাকে নিয়ে আমরা সবাই যদি আন্টিদের সঙ্গে যেতে পারতাম, আরও ভাল লাগত।'

সকাল থেকেই কোরিনার পিছে লেগে থেকেছে দুই ভাই-বোন। কতভাবে অনুরোধ করেছে সঙ্গে নেয়ার জন্যে। কান্নাকাটি করেছে। কিন্তু আন্টি অটল। কোনমতেই রাজি হননি। কিশোর বুঝেছে, বাধা না থাকলে সিসি আর হেনরিকে সঙ্গে না নিয়ে যেতেন না। ওদের বাবা-মা নেই। কোথায় আছে–মারা গেছেন না বেঁচে আছেন, সেটাও আরেক রহস্য। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেও কোন জবাব বের করতে পারেনি কিশোর। হার্টদের সঙ্গে সিসি বা হেনরির রক্তের সম্পর্ক নেই। কিন্তু বাবা-মায়ের অবর্তমানে বাবা-মা'র মতই স্নেহ দিয়ে দুজনকে বড় করতে চেয়েছেন ওই ইনডিয়ান দম্পতি। সুতরাং নেননি যখন, বোঝাই গেছে–সঙ্গে নেয়ার উপায় ছিল না।

সিসির বয়েস তেরো। হেনরির ছয়। কিশোরের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এমন করে গিয়ে সিঁড়িতে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিল দুজনে, মায়াই লাগছিল কিশোরের। দুজনেরই কালো চুল। দুজনেরই কান্নাভেজা সবুজ চোখের তারায় জ্বলছিল রাগের আগুন।

'নিশ্চিন্তে চলে যান আপনারা,' হেসে বলেছে কিশোর। 'সিসি আর হেনরি ঠিকমতই ঘরের কাজ করবে, সকাল সকাল ঘুমাতে যাবে…'

তার দিকে তাকিয়ে জিভ বের করে ভেঙচি কেটেছে সিসি। হেসেছে কিশোর

ঘোড়ায় টানা ওয়্যাগনে সামনের বেঞ্চসীটে উঠে বসেছিলেন হার্ট। চাকার ব্রেক ছেড়ে কিশোরের দিকে ফিরে বলেছেন, 'শনিবার নাগাদ ফিরব।'

ঘোড়া চালানোর জন্যে চাবুক মারার দরকার পড়ত না হার্টের। লাগাম তুলে সামান্য টান দিতেই কোন রকম প্রতিবাদ না করে চলতে শুরু করেছে চারটে ঘোড়া।

ওঁদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়েছে কিশোর। সিসি আর হেনরিকে নাড়তে বলেছে।

'না, নাড়ব না!' রাগ করে হাত দুটো কোলের কাছে গুটিয়ে নিয়েছে সিসি।

'নাড়ব না!' বোনের দেখাদেখি হেনরিও একই ভাবে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

'আমি ওদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম,' সিসি বলেছে, 'নিল না!' রাগ করে পা ঠুকল সিঁড়িতে।

'নিল না!' দেখাদেখি হেনরিও পা ঠুকেছে।

হঠাৎ, আকাশের বুক চিরে দিয়ে গেল বিদ্যুৎ-শিখা। শোনা গেল বজ্রের চাপা গুড়গুড় শব্দ। কিশোরের মনে হচ্ছিল পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে। তীব্র গতিতে পিঠে ঝাপটা দিচ্ছিল বরফের মত শীতল ঝোড়ো হাওয়া।

ঘোড়াগুলোর আর্তচিৎকার কানে আসতে আকাশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে কিশোর। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে চারটে ঘোড়াই। খুর দিয়ে বাতাস খামচে ধরতে চাইছিল যেন। পরক্ষণেই মাটিতে পা নামিয়ে পাগলের মত লাফ মেরেছে সামনের দিকে।

মরিয়া হয়ে লাগাম টেনে ওগুলোকে সামলানোর চেষ্টা করেছেন হার্ট। চিৎকার করে ডেকে ডেকে শান্ত করতে চেয়েছেন।

লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে ছুটে গেছে আতঙ্কিত কিশোর।

চিৎকার করে ঘোড়াগুলোকে থামতে বলেছে। কিন্তু বিফল হয়ে বাতাসে ভেসে গেছে তার ডাক। হার্টই যেখানে থামাতে পারেননি, সে থামাবে কি?

টানতে টানতে গভীর খাদের দিকে ওয়্যাগনটাকে নিয়ে গেছে ঘোড়াগুলো। পড়লে নিজেরাও যে মরবে সে-খেয়াল ছিল না। টান সামলাতে না পেরে, ঝাঁকুনি লেগে চিত হয়ে পেছনে উল্টে পড়ে গিয়েছিলেন হার্ট। ওয়্যাগনের ধার আঁকড়ে ধরেছিলেন কোরিনা। হ্যাঁচকা টানে মাথার টুপিটা উড়িয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বাতাস, ফিতে বাঁধা থাকায় পারেনি, ফাঁসের মত গলায় টান দিচ্ছিল সেই ফিতে। বাতাসে উড়ছিল লম্বা চুল।

কোনমতেই থামানো যায়নি ঘোড়াগুলোকে। সোজা ধেয়ে গিয়েছিল খাদের দিকে। ডিগবাজি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল পাড়ের ওপাশে।

অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে কিশোরকে। সাহায্য করার কোন সুযোগ ছিল না।

তিন

দুর্ঘটনাটা নিয়ে অনেক ভেবেছে কিশোর। হাজার ভেবেও কোন কূলকিনারা পায়নি। কেন এমন অদ্ভুত আচরণ করল ঘোড়াগুলো? বিদ্যুৎ চমকাতে দেখে ঘাবড়ে

গিয়েছিল? নাকি বজ্রের শব্দে ভয় পেয়েছিল?

সূত্র খুঁজে বেড়িয়েছে কিশোর ভাঙা গাড়িটায়, খাদের ওপরে, খাদের নিচে। কিছুতেই বুঝতে পারেনি, ঘোড়াগুলোর ওভাবে হঠাৎ খেপে যাওয়ার কারণ। রহস্যটা এখনও অমীমাংসিত।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপারটা হলো, কোন প্রাণীর ওপর হার্টকে এ ভাবে নিয়ন্ত্রণ হারাতে আর দেখেনি সে। বরং উল্টোটাই দেখেছে। সব জানোয়ার তাঁর কথা শুনত। গৃহপালিত তো বটেই, বনের জানোয়ারও তাঁর কথা অমান্য করত না। করত যে না, সেটা তো কিশোর নিজের চোখেই দেখেছে। জানোয়ারে কথা না শুনলে আজ সে এখানে থাকত না, কোনদিন ওদের খাবার হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেত।

মনে পড়ল রকি বীচের সেই দিনটির কথা। ভুল তারিখে তার জন্মদিন করে ফেলেছিলেন মেরিচাচী। ভুলটা যে কি করে করলেন তিনি, সেটাও এক রহস্য। আর যারই হোক, কিশোরের জন্মদিনের তারিখ নিয়ে অন্তত মেরিচাচীর ভুল হওয়ার কথা ছিল না। রহস্যটা ভেদের সুযোগই পায়নি কিশোর।

জন্মদিনে নতুন ক্যামেরা উপহার পেয়েছিল সে। সেই ক্যামেরা নিয়ে লেকের পাড়ের বনে ইউ.এফ.ও'র ছবি তুলতে গিয়েছিল। আকাশে বিচিত্র মেঘ দেখেছিল। দেখেছিল রঙিন ফানেল। তারপর অন্ধকার।*

অন্ধকার কেটে গেলে শুরু হলো দুঃস্বপ্ন···মস্ত এক কাঁচের পাইপে ভরে রাখা হয়েছে তাকে···পালাল সে ওটার ভেতর থেকে···বিশাল ল্যাবরেটরির মধ্যে দিয়ে ছুটল···বেরোতে পারল না, ধরে ফেলা হলো তাকে···আবার পালাল···আবার ধরা পড়া···আবার পালানো···আবার ধরা···শেষে নেতা গোছের লোকটা মহাখাপ্পা হয়ে তার সহকারীদের বলল–ভয়ঙ্কর ছেলে; একে এখানে রাখা যাবে না। এমন কোথাও রেখে এসো, যেখানে মুক্তও থাকবে আবার বন্দিও থাকবে, আমাদের খপ্পর থেকে কোনমতেই বেরিয়ে যেতে পারবে না···লোকটার মুখে ডাক্তারদের মাস্ক ছিল, চেহারা বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু কণ্ঠস্বরটা চেনা চেনা–কোথায় শুনেছে ওই কণ্ঠ, স্বপ্নের মধ্যে মনে করতে পারেনি কিশোর···

তারপর আর কিছু মনে নেই। হুঁশ ফিরলে দেখল, একটা বনের মধ্যে পড়ে আছে সে। অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। নানা রকম বুনো জানোয়ারের ডাক কানে আসতে লাগল। হঠাৎ দেখল, মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে লাল চোখ মেলে তাকে দেখছে একটা বিশাল নেকড়ে। হাঁ করা মুখ থেকে ঝুলছে টকটকে লাল জিভ। অসংখ্য ধারাল দাঁত যেন তাকে ছিঁড়ে খেতে প্রস্তুত।

এটাও কি আরেক দুঃস্বপ্ন? নিজের বাহুতে চিমটি কেটেছে কিশোর। ব্যথা পায়নি। না, স্বপ্ন নয়, ভয়ঙ্কর বাস্তব।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দৌড় দিতে গিয়ে লক্ষ করল, একটা নয়, একপাল নেকড়ে ঘিরে ফেলেছে তাকে। গাছে ওঠারও সময় পাবে না সে। ছুটে এসে টুকরো টুকরো করে ফেলবে নেকড়েরা।

তারমানে নিশ্চিত মৃত্যু। চোখ বুজে অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর, ধারাল

---

* একাহিনী জানতে হলে তিন গোয়েন্দা'র 'সময়-সুড়ঙ্গ' বইটি পড়তে হবে।

দাঁতগুলো কখন তার গায়ে বেঁধে!

বিঁধল না। কানে এল মানুষের ফিসফিসে চাপা কণ্ঠ। চোখ মেলে দেখল অবিশ্বাস্য দৃশ্য। একজন মানুষ। ইনডিয়ান। পরনে শুধু প্যান্ট। গায়ে কিছু নেই। লম্বা লম্বা চুল। কথা বলছেন নেকড়েগুলোর সঙ্গে। পোষা কুকুরের মত তাঁর পায়ের কাছে লুটোপুটি খেতে শুরু করেছে নেকড়েগুলো। এ যেন আরেক টারজান!

কিশোরকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে এলেন হার্ট। আরও চমক অপেক্ষা করছিল কিশোরের জন্যে। হতবাক হয়ে গেল, যখন জানতে পারল দক্ষিণ আমেরিকায় রয়েছে সে। অ্যান্ডিজের পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড় ঘেরা একটা অতি দুর্গম শহর–কাচু-পিকচুতে।

বোকা হয়ে গিয়েছিল। এখানে এল কি করে সে? ইউ এফ ও তো নিয়ে যায় ভিনগ্রহে। পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়ার কথা নয়!

তাকে পাগল ভাববে মনে করে হার্টকে সত্যি কথাটা বলল না। বলল, দুনিয়ায় তার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়েছে। বানিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার একটা শহরের নাম বলে দিল।

সেই থেকেই এ বাড়িতে আছে কিশোর। গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার গেছে সেই বনে, যেখানে নেকড়ের কবলে পড়ে মরতে বসেছিল। বহু খোঁজাখুঁজি করেছে, সূত্র খুঁজেছে। এক জায়গায় মাটিতে বসে যাওয়া ছয়টা ছোট ছোট বিচিত্র গর্ত ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি। মনে হয়েছে, ভারী কিছুর পায়ের চাপে তৈরি হয়েছে গর্তগুলো…

জানোয়ার বশ করার ক্ষমতাটা হার্টের কাছ থেকে রপ্ত করেছে সিসি। হাতে ধরে তাকে শিখিয়েছেন হার্ট। চেষ্টা করলে হয়তো কিশোরও শিখে নিতে পারত। কিন্তু কে জানত এমন বিপদে পড়বে! না শিখে এখন আফসোস হচ্ছে। বিদ্যেটা জানা থাকলে পাজি, কর্মবিমুখ, বেয়াড়া খচ্চরটাকে কাজ করাতে অসুবিধে হত না এখন। এটাকে দিয়েই তো দিব্যি হাল টানাতেন লং হার্ট, কোনই সমস্যা হত না। জানোয়ারটা কথা শুনত তাঁর…

বাস্তবে ফিরে এল আবার কিশোরের মন। চারপাশে ছড়ানো জমিটার দিকে তাকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল। সন্দেহ হচ্ছে, কোনদিনই হাল দিয়ে শেষ করতে পারবে না। ফসল বোনা তো দূরের কথা।

কি করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। খামারটা বাঁচানোর কোন উপায়ই মাথায় ঢুকছে না। নেকড়ের কবল থেকে বাঁচিয়ে এনে বাড়িতে জায়গা দেয়ায় হার্টের কাছে কৃতজ্ঞ সে। মৃত্যুকালে তাঁকে কথা দিয়েছে, সিসি আর হেনরিকে দেখবে। কথা যদি না-ও দিত, তাহলেও অসহায় ছেলেমেয়ে দুটোকে বাড়িতে একলা ফেলে চলে যেতে পারত না সে। যাওয়াটাও মুখের কথা নয়। যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে বেরোতে হলে প্রচুর টাকা দরকার। তার কাছে আছে মোটে বিশ হাজার চিলিয়ান পেসো, আমেরিকান ডলারে এর মূল্যমান পঞ্চাশ ডলারেরও কম। বাড়ির আলমারিতে সামান্য যা ফেলে গিয়েছিলেন হার্ট, তার অবশিষ্ট। এত কম টাকা দিয়ে কোনমতেই বড় শহরে পৌছতে পারবে না তিনজনে। তারপর আরও ঝামেলা আছে। রকি বীচে ফিরতে হলে পাসপোর্ট দরকার। সে-সব জোগাড় করতেও অনেক কাঠখড়

পোড়াতে হবে। কিভাবে এসেছে এখানে, বোঝাতে হবে কর্তৃপক্ষকে। সব কিছুর জন্যেই মোটা টাকা প্রয়োজন।

মিস্টার গ্যারিবাল্ডের কথা ভাবল। এখানকার ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট। গতকাল এসেছিল দেখা করতে। বলা ভাল, ধমকাতে।

লোকটার কথা মনে হতেই ভয় আর রাগ একসঙ্গে মাথাচাড়া দিল মনে। হুমকি দিয়ে গেছে, সময় মত কিস্তি শোধ করতে না পারলে বাড়িঘর সব দখল করে নেবে। ওই চামারটার কাছ থেকে জমিটা ইজারা নিয়েছিলেন হার্ট। বাড়িঘর হাতছাড়া হলে নিজের ব্যবস্থা নাহয় একটা করে নিতে পারবে কিশোর, কিন্তু পথে বসবে সিসি আর হেনরি। কি হবে ওদের?

মনকে শক্ত করল সে। এখন টাকা জোগাড়ের একটাই উপায়, ফসল ফলানো। খচ্চরের পিঠে আবার বাড়ি মারল লাগাম দিয়ে। 'হাঁট্, ব্যাটা, খচ্চরের বাচ্চা! তোর জন্যে সারাদিন খেতে পড়ে থাকব নাকি?'

বাড়ি খেয়ে চিৎকার করে উঠল জানোয়ারটা। এক পা আগে বাড়াল।

'হ্যাঁ, থামবি না,' সাবধান করল কিশোর। লাঙলের হাতলে শক্ত হলো আঙুল। ফালের খোঁচায় কেটে দুদিকে উল্টে পড়তে শুরু করল আবার কালো মাটি।

দেহের প্রতিটি পেশি টানটান হয়ে ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু পরোয়া করল না আর কিশোর।

ডাক শুনে ফিরে তাকাল সে। দৌড়ে আসতে দেখল সিসিকে। কাঁধে নাচছে কালো বেণী। পেছন পেছন আসছে হেনরি।

মোচড় দিয়ে উঠল কিশোরের পেট। দৌড়ানোর ভঙ্গিটা ভাল লাগল না তার। খারাপ কিছু ঘটল নাকি!

লাঙলের হাতল ছেড়ে দিয়ে ওদের দিকে দৌড় দিল সে। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, সিসি? কি ব্যাপার?'

দাঁড়িয়ে গেল সিসি। হাসল। 'না না, কিশোরভাই, ভয় পেয়ো না। খারাপ কিছু হয়নি।'

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। 'তাহলে ওরকম চিৎকার করছিলে কেন?'

ঝিক করে উঠল সিসির সবুজ চোখের তারা। 'আমাদের শহরে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল না আজ তোমার, মনে নেই?'

'সরি, সিসি, আজ পারব না। অনেক কাজ পড়ে আছে,' খেতের দিকে হাত তুলে দেখাল কিশোর।

কালো হয়ে গেল সিসির সবুজ চোখের তারা। উধাও হয়ে গেছে হাসি। মুখ নিচু করে বলল, 'কিন্তু তুমি আমাদের নিয়ে যাবে কথা দিয়েছিলে!'

'দিয়েছিলাম। কিন্তু...'

প্যান্ট খামচে ধরে টান দিল হেনরি। মুখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে। চোখে টলমল করছে পানি। সবুজ দৃষ্টিতে কাতর অনুনয়।

'তুমিও শহরে যেতে চাও?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল হেনরি। হার্ট দম্পতি মারা যাওয়ার পর থেকে কোন কথা

বলে না সে। প্রচণ্ড শক্ পেয়েছে বোধহয়। কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

মাটিতে বসে পড়ল কিশোর। টোকা দিয়ে একটা লাল রঙের গুবরে পোকা ফেলল হেনরির পা থেকে। পরনের ওভারঅলটা অতিরিক্ত খাটো হয়ে গেছে ওর। সিসির দিকে তাকাল। বড় বড় ফুলওয়ালা নীল পোশাকটা মলিন, বিবর্ণ। ফসল ঘরে না তোলা পর্যন্ত কাপড় কিনে দেয়ার উপায় নেই।

'জানি, শহরে যাওয়ার বড় শখ তোমাদের,' কিশোর বলল। 'কিন্তু জমি না চষলে ফসল বোনা যাবে না। ফসল না হলে জায়গা-জমি বাড়ি-ঘর সব হারাতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু, কিশোরভাই,' পাশে বসে কিশোরের হাত খামচে ধরল সিসি। সবুজ চোখে উত্তেজনা। 'টাকার জন্যেই তো যেতে চাইছি আমি। ভাবছি, ঘোড়দৌড়ে আমিও অংশ নেব। প্রথম পুরস্কার এক লাখ পেসো আমিই পাব, দেখো। আমি জানি, আমি জিতব!'

'এক লাখ!' প্রতিধ্বনি করল যেন কিশোর। টাকাটা পেলে ফসল ওঠা পর্যন্ত কোনমতে চালিয়ে নিতে পারবে সংসার।

সত্যি কি জিততে পারবে সিসি?

পারবে না। এত এত প্রতিযোগী রয়েছে। তাদের সঙ্গে সিসির জেতা, টাকা পাওয়া, সংসার চালানো…দূর! ছেলেমানুষী চিন্তা।

'দেখো, সিসি,' বোঝাতে গেল সে, 'আমি জানি, তুমি ঘোড়ায় চড়ার ওস্তাদ। কিন্তু অন্য ওস্তাদেরাও আসবে। তাদের সঙ্গে পারবে না।'

ঝটকা দিয়ে হাতটা সরিয়ে নিল সিসি। জ্বলন্ত চোখে তাকাল। 'আমি জিতব! আমি জিতব! আমি জিতব! তুমি যদি আমাকে নিয়ে যেতে না চাও, আমি একলাই যাব।'

এতদিনে এই দৃষ্টির অর্থ জানা হয়ে গেছে কিশোরের। একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সিসি, কোনভাবেই আর ঠেকাতে পারবে না তাকে। এ ধরনের গোঁয়ার্তুমি কিশোরের নিজের মধ্যেও আছে। আরেকজনকে বুঝিয়ে লাভ নেই। উঠে দাঁড়াল সে। 'দাঁড়াও, হ্যাটটা নিয়ে আসি।'

চার

হেনরিকে কাঁধে বসিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে হেঁটে চলল কিশোর। পাশে পাশে হাঁটছে সিসি। টানতে টানতে নিয়ে চলেছে তার প্রিয় ঘোড়াটাকে। ঘোড়াটা কালো। নাম গোস্ট। পিঠে চড়েই যেতে পারত সিসি, কিন্তু দৌড়ের আগে গোস্টকে ক্লান্ত করতে চায় না।

সিসির জেতার সামান্যতম সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আর কিছু বলল না কিশোর। শহরে গেলে সিসি নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারবে। জেতার কল্পনাটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

শহরের কাছাকাছি হতে লোকের হট্টগোল আর ব্যান্ডের বাজনার শব্দ কানে এল। চৌরাস্তায় এসে মেইন রোডে উঠল ওরা। প্রধান সড়কটাও কাঁচা। রাস্তার ওপরে উঁচুতে আড়াআড়ি ভাবে ব্যানার টানানো হয়েছে। লোকে-লোকারণ্য। কাঠের তৈরি সারি সারি দোকান। দরজায় বড় করে লেখা নোটিশ ঝুলছে: ঘোড়দৌড়ের জন্যে দোকান বন্ধ।

রাস্তার পাশে টানানো সাইনবোর্ড পড়ে জানা গেল ঘোড়দৌড় হবে মেইন রোডে। বেলা ১টায়। ঘড়ি নেই কিশোরের হাতে। কোথায় হারিয়েছে, তা-ও মনে করতে পারল না; জন্মদিনে পাওয়া ক্যামেরাটার মত। জোর করে মন থেকে দূর করল রকি বীচের ভাবনা। ভাবলে ভীষণ কষ্ট হয়। সূর্য দেখে অনুমান করল একটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই।

'দারুণ, তাই না?' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে সিসির। 'মনে হচ্ছে আশপাশের অঞ্চলের আর কেউ নেই ঘরে, সব ঝেঁটিয়ে চলে এসেছে রেস দেখতে।'

পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে টাউন হলের দিকে তাকাল সে। বারান্দা আর সিঁড়িতে দাঁড়ানো কিছু লোক। হাসাহাসি করছে, কথা বলছে। পিপার ওপর দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। দু'হাতে মাথার ওপর তুলে রেখেছে একটা বোর্ড। তাতে লেখা: ঘোড়দৌড়ে আগ্রহীরা এখানে এসে নাম লেখান।

'নামটা লিখিয়ে আসি,' সিসি বলল।

সিসির হাত থেকে লাগামটা নিয়ে নিল কিশোর। 'তুমি যাও। আমি গোস্টকে নিয়ে এগোচ্ছি।' এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে সরাল হেনরিকে। সিসির পিছে পিছে চলল।

বারান্দায় দাঁড়ানো লোকটাকে বলল সিসি, 'আমি নাম লেখাতে চাই।'

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল বারান্দার হট্টগোল। সবার চোখ সিসির দিকে। যেন আরেকটা মাথা গজিয়েছে ওর।

চওড়া কাঁধওয়ালা লম্বা এক যুবক এগিয়ে এল সামনে। 'মেয়েমানুষ। তুমি রেস খেলবে কি?'

নিজের নাকের ডগা টিপে ঘাম মুছল সিসি। 'কোথায় লেখা আছে সে-কথা, জন ফ্রেঞ্চ?'

গাঢ় লাল চুলে আঙুল চালাল যুবক। 'লেখা নেই, কিন্তু নিয়ম-কানুন সব মুখস্থ আমাদের। মেয়েমানুষ নেয়া হবে না।'

'অ, তাই নাকি। জানো যে, আমি খেললে জিততে পারবে না। ভয়ে নিতে চাইছ না।'

চোখের পাতা সরু হয়ে গেল জনের। 'তোমাকে ভয় পাব কেন! ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে কেউ পারে না।'

এগিয়ে গেল কিশোর। সে জানে, শহরের সবাই ফ্রেঞ্চদের ভয় পায়। এলাকার সবচেয়ে ধনী পরিবার। টাকা আর ক্ষমতার জোরে যে কাউকে ঘাড় ধরে বের করে দিতে পারে এ শহর থেকে। এখানকার স্থানীয় নয় ওরা। সেই সতেরোশো সালে উত্তর আমেরিকা থেকে এসেছিল ওদের পূর্বপুরুষ। ওদের দেখতে পারে না কিশোর, বিশেষ করে দুই ভাই জন ফ্রেঞ্চ আর মার্ক ফ্রেঞ্চকে। 'কেউ যদি না-ই পারে, নিতে

এত ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'আরে নিয়ে নাও,' বলে উঠল আরেকটা ভারী কণ্ঠ।

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল সেদিকে। দুটো সোনালি রঙের ঘোড়ার লাগাম ধরে টাউন হলের দিকে এগিয়ে আসছে মার্ক ফ্রেঞ্চ। হাঁটার তালে তালে ঢেউ খেলছে ঘোড়াগুলোর শক্তিশালী পেশিতে।

'দাও ওকে একটা সুযোগ,' সিসিকে দেখাল মার্ক। 'খেলুক না। বুঝুক কেমন মজা।'

দমে গেল কিশোর। ঘোড়া দুটো দেখেই বুঝে গেছে, ওগুলোর সঙ্গে পারতে হলে অলৌকিক ক্ষমতা লাগবে সিসির।

খুশিতে চিৎকার করে উঠল সিসি। 'থ্যাংকস, মার্ক। যাও কথা দিলাম, তোমাকে বেশি পেছনে ফেলব না আমি।'

সিসির আত্মবিশ্বাস অবাক করল কিশোরকে। ভাবল, বড় বেশি ছেলেমানুষ।

বারান্দায় দাঁড়ানো একজন লোক হাত নেড়ে ডাকল সিসিকে। বড় একটা চকবোর্ড দেখাল। রেসে অংশগ্রহণকারীদের নাম লেখা রয়েছে বোর্ডটায়।

'নাও, নিচে তোমার নাম লিখে দাও,' চক বাড়িয়ে দিল সে।

পরিষ্কার অক্ষরে দ্রুত নিজের নামটা লিখে দিল সিসি।

মার্ক আর জনকে পরস্পরের দিকে তাকাতে দেখল কিশোর। মুচকি হাসি ওদের ঠোঁটের কোণে। শঙ্কিত হলো সে। আল্লাহ্ই জানে, কি ফন্দি করেছে ওরা!

চকের গুঁড়ো কাপড়ে মুছে কিশোরের হাত থেকে লাগামটা নিয়ে নিল সিসি।

কিছুটা সরে এসে কানে কানে সিসিকে বলল কিশোর, 'ওদের ব্যাপারে সাবধান। ভাবভঙ্গি আমার ভাল লাগছে না।'

চোখের তারায় ছায়া পড়ল সিসির। 'ভঙ্গিই দেখায় ওরকম। ওদের আমি ভয় করি না।'

রেসের আগে বেশি কিছু বলে সিসিকে ঘাবড়ে দিতে চাইল না কিশোর। লাগামটা ফিরিয়ে দিল। হেনরিকে বলল, 'চলো, এমন কোথাও গিয়ে দাঁড়াই, ভালমত যাতে দেখতে পাই।'

'চিৎকার করে উৎসাহ দিও আমাকে,' সিসি বলল।

'দেব।'

হেনরিকে কাঁধে নিয়ে কোলাহল মুখর জনতাকে ঠেলে পথ করে এগোল কিশোর। কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে দর্শকরা। রাস্তার শেষ মাথার দিকে তাকাল সে। প্রতিযোগীরা তৈরি হচ্ছে। মেইন রোড ধরে সোজা ছুটে যাবে শহরের শেষ মাথায়, সেখানে রাখা একটা পিপা ঘুরে আবার ফিরে যেতে হবে যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানে। রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়ানোই ভাল, দৌড়ের সবটাই তাহলে দেখা যাবে।

দর্শকদের মাঝে এক ভদ্রলোকের ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। 'গুড ডে, মিস্টার রনসন।'

ঘুরে দাঁড়ালেন মিস্টার রনসন। তিনিও বিদেশী। এখানকার জেনারেল স্টোরের মালিক। এখানকার বাকি দোকানদারের মত আজকের দিনে তিনিও দোকান বন্ধ

করে দিয়েছেন, কিন্তু গা থেকে সাদা অ্যাপ্রনটা খোলেননি। 'আরি, কিশোর। আজকাল তো তোমাকে দেখাই যায় না।'

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল কিশোর, 'কি করব, এত কাজ।'

'ভাগ্যিস তোমাকে খুঁজে পেয়েছিল লং হার্ট, নইলে ছেলেমেয়েগুলোর যে কি দুর্দশা হত ভাবাই যায় না।'

অ্যাপ্রনের পকেট থেকে একটা স্যারসাপ্যারিলা স্টিক বের করে হেনরির দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

লোভে চকচক করে উঠল হেনরির চোখ। ছোঁ মেরে প্রায় কেড়ে নিল ক্যান্ডিটা।

হেসে উঠলেন মিস্টার রনসন।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার রনসন।' কাঁধের ওপর হেনরিকে সোজা করে বসাল আবার কিশোর। 'ওর আর কি দোষ। কতদিন যে মিষ্টি কিনে দিতে পারি না ওকে।'

'নিজের ভাইও এতটা করে না, কিশোর। সত্যি তুমি···'

কথা শেষ করতে দিল না তাঁকে কিশোর। 'সিসি এসেছে রেসে অংশ নিতে।'

'ও জিতলে টাকার সমস্যাটা তোমাদের কমবে, তাই না?'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই আসা।' রাস্তার শেষ মাথার দিকে তাকাল আবার কিশোর। ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে প্রতিযোগীরা। সিসিকে দেখতে পেল। গলায় হাত বুলিয়ে আদর করছে গোস্টকে। হাত তুলে দেখাল কিশোর, 'হেনরি, ওই যে দেখো, সিসি।'

হাততালি দিল হেনরি। বোনের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল।

হেসে সিসিও হাত নেড়ে জবাব দিল।

'হার্ট প্রায়ই আমাকে বলত,' কিশোরকে বললেন মিস্টার রনসন, 'জন্তু-জানোয়ারকে বশ করার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে সিসির মধ্যে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এখানেই দাঁড়াই, কি বলো, হেনরি?'

সরে জায়গা করে দিলেন মিস্টার রনসন। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়াও না। এসো, ঢুকে পড়ো।···তবে যতই ক্ষমতা থাক, ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে জেতা মুখের কথা নয়। সিসি পারবে না। একেবারেই ছেলেমানুষ সে, ঘোড়াটাও তেমন কিছু না। আমার কি মনে হয়, জানো? যদি পারেও, না জেতাই ভাল হবে সিসির জন্যে। জিততে না পারলে পাগলা কুত্তা হয়ে যাবে দুই ভাই।'

পাঁচ

প্রতিযোগীদের ঘোড়াগুলোর সামনে টানটান করে একটা রশি ধরে রেখেছে দুটো ছেলে।

'ঘোড়ায় চড়ো!' চিৎকার করে উঠল গ্যারিবাল্ড। রেস পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছে তার ওপর। শুধু ব্যাংকের মালিকই নয়, শহরের ভালমন্দ দেখার ভারও তার···

ভালমন্দ! মনটা তেতো হয়ে গেল কিশোরের। ভালটা কখনোই চোখে পড়ে না গ্যারিবাল্ডের, কেবল মন্দটাই দেখে–এই যেমন একটা অসহায় পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। গতকাল এসে হুমকি দিয়ে গেছে কিশোরকে। অথচ এখন গোল ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে এমন হাসি হাসছে যেন ঈশ্বরের পাঠানো দেবদূত। গাল দুটোও কুৎসিত রকমের ফোলা লোকটার। ঘেন্না লাগে! থুতু ফেলতে গিয়েও আশেপাশে লোক থাকায় ফেলল না কিশোর।

রশির কাছে এসে দাঁড়াল ডজনখানেক ঘোড়া। লাগাম ধরে তৈরি হয়ে আছে সওয়ারিরা।

ওদের মধ্যে সিসিই একমাত্র মেয়ে। দূর থেকেও ওর রক্তিম গাল দেখে মনের উত্তেজনা আঁচ করতে পারল কিশোর।

উত্তেজনার চেয়ে শঙ্কা বেশি কিশোরের মনে। সিসির দুই পাশে দাঁড়িয়েছে দুই ভাই–জন আর মার্ক। দুদিক থেকে চেপে এসে গোস্টকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে রশির কাছ থেকে। জনের বাহুতে ধাক্কা মারল সিসি। হেসে উঠল জন। নিজের ঘোড়া দিয়ে চাপ দিতে লাগল গোস্টের পেটে।

ওদের উদ্দেশ্য বুঝে ভয় পেয়ে গেল কিশোর। রেসে জেতার চেয়ে সিসিকে আহত করার দিকেই যেন ওদের খেয়াল বেশি। ওদের মাঝখানে বড়ই ক্ষুদ্র আর ভঙ্গুর লাগছে বেচারি সিসিকে।

হাত উঁচু করল গ্যারিবাল্ড। হাতে পিস্তল। আকাশের দিকে তাক করে গুলি করল একবার। হাত থেকে রশির দুই মাথা ছেড়ে দিল ছেলে দুটো।

রশিটা মাটিতে পড়ে যেতেই চিৎকার করে উঠল অশ্বারোহীরা। লাগামে টান দিয়ে চাপড় মারল ঘোড়ার গলায়। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়াগুলো। ধুলোর ঝড় উঠল ওগুলোর ছুটন্ত খুরের আঘাতে।

নাকেমুখে ধুলো ঢুকে যেতে কেশে উঠল কিশোর। চোখ বন্ধ করে ফেলল। কানের কাছে চিৎকার করছে উত্তেজিত দর্শকেরা: 'জোরে, জন! মার্ক, আরও জোরে!' রেসে যেন কেবল ওই দুজনই প্রতিযোগিতা করছে।

লোকে ভয় পায় ওদের। মনে মনে অন্য কাউকে সমর্থন করলেও প্রকাশ্যে সেটা জানানোর সাহস নেই। সিসির মত দুর্বল একটা মেয়ের পক্ষ নিলে নিজের বিপদ ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু পাবে না।

জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছে হেনরি। পা ছুঁড়ছে। ওর খুদে পায়ের লাথি লাগছে কিশোরের বুকে। কাঁধের ওপর তাকে সোজা করে বসাল কিশোর। দর্শকদের ঠেলে এগিয়ে গেল ভালমত দেখার জন্যে।

প্রাণপণে ছুটছে সিসি। দুই পাশে মার্ক আর জন। শুরু থেকেই গোস্টের প্রায় গা ঘেঁষে রয়েছে ঘোড়া দুটো। গোস্টের গায়ে ধাক্কা লাগছে। আগে বাড়ার পথ পাচ্ছে না সিসি।

হঠাৎ, হাত বাড়িয়ে গোস্টের লাগাম ধরে হ্যাঁচকা টান মারল মার্ক।

এলোমেলো পা ফেলতে শুরু করল গোস্ট। চিৎকার করে জোরে লাগাম টেনে ধরল সিসি।

'সিসি! ধরে রাখো! ছেড়ো না!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল কিশোর।

পেটের ভেতরে খামচি দিয়ে ধরেছে তার। ঘোড়াটাকে নিয়ে এখন সিসি পড়ে গেলে, দুজনেই মরবে, অন্য ঘোড়াগুলোর পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে।

নিষ্ঠুর, কুৎসিত হাসি দেখতে পেল দুই ভাইয়ের মুখে।

সামলে নিয়েছে গোস্ট। তাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে সিসি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। প্রায় সবগুলো ঘোড়াই এখন গোস্টকে পার হয়ে চলে গেছে। আগে বাড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সিসি। ঘোড়ার কাঁধ ডলে, পেটে পায়ের গুঁতো মেরে জোরে ছোটার ইঙ্গিত করছে।

গতি বাড়তে লাগল ঘোড়াটার। বাতাসে উড়ছে সিসির বেণী। দেখতে দেখতে ধরে ফেলল সামনের ঘোড়াটাকে। দ্রুত পাশ কাটাল ওটার। তারপর আরেকটার। আরও একটার। সামনে নুয়ে পড়ল সিসি। গোস্টের ঘামে ভেজা চকচকে কাঁধের ওপর নেমে এসেছে থুতনি।

কি করছে ও? অবাক হলো কিশোর। সিসির ঠোঁট যে নড়ছে কোন সন্দেহ নেই তাতে। যেন ফিসফিস করে কথা বলছে ঘোড়াটার সঙ্গে।

স্তব্ধ হয়ে গেছে কিশোর। একটার পর একটা ঘোড়াকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে সিসি। তীব্র গতিতে পিপাটার চারপাশে ঘুরে আসার সময় ঘোড়ার গায়ের ধাক্কা লাগল পিপাটাতে। দুলে উঠল ওটা।

দম আটকে ফেলল কিশোর। পিপাটা উল্টে পড়ে গেলে ডিসকোয়ালিফাই হবে সিসি। কিন্তু ভাগ্য ভাল, পড়ল না।

পিপা ঘুরে এসে বাকি ঘোড়াগুলোকে পেছনে ফেলতে শুরু করল গোস্ট। কোনদিকে নজর নেই আর। লক্ষ্য যেন একটাই–শুধুই এগিয়ে যাওয়া; ধুলো-ধূসরিত পথের মাঝে, ধুলোর মেঘের পেছনে ফেলে আসা বাকি ঘোড়াগুলোকে।

অবিশ্বাস্য দৃশ্য! জন আর মার্কের দুটো ঘোড়া বাদে বাকি সবগুলো ঘোড়ার আগে চলে গেছে গোস্ট।

'হেনরি, দেখো দেখো!' আনন্দে গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে এল কিশোরের। 'জিতে যাচ্ছে সিসি!'

ওর মাথাটাকেই যেন তবলা বাজিয়ে চাটি মারতে আরম্ভ করল হেনরি।

'সামনের ঘোড়া দুটোকে হারাতে পারলেই জিতে যাবে সিসি!' চাটির পরোয়া না করে আবার চিৎকার করে উঠল কিশোর।

জনের কয়েক ফুট পেছনে রয়েছে সিসি। হালকা ছিপছিপে শরীর নিয়ে যেন উড়ছে গোস্ট। ধরে ফেলছে বিশালদেহী সোনালি ঘোড়াটাকে।

ফিরে তাকাল মার্ক। হাসতে শুরু করল সিসির দিকে তাকিয়ে।

ওর উদ্দেশ্য বুঝে আতঙ্কিত হয়ে গেল কিশোর। আবার যদি লাগাম ধরে টান মারে, এই গতিতে থেকে কোনমতেই সামলাতে পারবে না গোস্ট। ডিগবাজি খেয়ে পড়বে। ঘোড়া আর তার সওয়ারি, দুজনেরই ঘাড় ভাঙবে।

চিৎকার করে সাবধান করতে গেল কিশোর। স্বর বেরোল না।

হাত বাড়াল মার্ক।

চাটি বাজানো থেমে গেছে হেনরির। কিশোরের চুল আঁকড়ে ধরেছে সে। শক্ত হয়ে গেছে শরীর। ফোঁপাতে শুরু করল। চিৎকার করে কেঁদে উঠবে মনে হচ্ছে।

ভয়ঙ্কর ওই দৃশ্য হেনরিকে দেখতে দিতে চাইল না কিশোর। টেনে তাকে কাঁধ থেকে নামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সেঁটে বসে আছে হেনরি। কোনমতেই তাকে নামানো গেল না।

কোন রকম আগাম সঙ্কেত না দিয়ে আচমকা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল মার্কের ঘোড়াটা। মার্কের একটা হাত বাড়ানোই আছে গোস্টের দিকে। ভয়াবহ হাঁক ছেড়ে, নাকের মাংস কুঁচকে ওপরে তুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জনের ঘোড়াটার ওপর। কামড় বসাল ঘাড়ে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ছিটকে পড়ল দুই ভাইয়ের ওপর। মার্কের আর্তনাদ কানে এল কিশোরের। ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে সে। মরিয়া হয়ে জিন ধরে ঝুলে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু থাকতে দিচ্ছে না তাকে খেপা ঘোড়াটা।

জনের ভয়ার্ত চিৎকারও কানে আসছে। কামড় খেয়ে উন্মাদ হয়ে যাওয়া ঘোড়ার পিঠে বসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। মাটির কাছে মুখ নামিয়ে দিল ঘোড়াটা। পেছনের দুই পা উঁচু করে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। এই উন্মাদ ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারল না জন। শেষ রক্ষা করতে পারল না। লাগাম থেকে ছুটে গেল হাত। দুই হাত দুদিকে বাড়িয়ে থাবা মেরে বাতাস ধরার চেষ্টা করল যেন। উল্টে পড়ে গেল জিনের ওপর থেকে। মাটিতে পড়ার শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেল কিশোর। জনের একটা হাত মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ল। সামনের দুই খুর সবেগে সেই হাতের ওপর নামিয়ে আনল মার্কের ঘোড়াটা।

চোখ বুজে ফেলল কিশোর। জনের যন্ত্রণাকাতর ভয়ানক আর্তচিৎকার কানে এল তার। চোখ মেলল আবার। দেখল, মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে জন। তার ঘোড়াটা তীরবেগে ছুটে চলে যাচ্ছে। খুরের আঘাতে হাড় ভেঙে গিয়ে চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে চোখা মাথা। মাটি ভেজাচ্ছে গাঢ় লাল রক্ত।

চিৎকার-চেঁচামেচি হই-চই করছে লোকে। হাত তুলে দেখাচ্ছে। জনের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর। সিসির ঘোড়াটা চলে গেছে রশির কাছে।

'জিতে গেছি! জিতে গেছি! হেনরি, জিতে গেছি আমরা!' কাঁধে বোঝা নিয়েই নাচতে শুরু করল কিশোর। হেনরির মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তবে বুঝতে পারছে, নীরব হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ওর।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ওদের দিকে ছুটে এল সিসি। 'কিশোরভাই! হেনরি! আমি জিতে গেছি! জিতে গেছি!'

কাছে এসে কিশোরের হাত জড়িয়ে ধরল সে। 'কি, বলেছিলাম না, আমিই জিতব! তুমি তো বিশ্বাস করোনি!'

'হ্যাঁ, দেখলাম তো!' সিসির কাঁধ চাপড়ে দিল কিশোর।

এতক্ষণে কিশোরের কাঁধ থেকে নামল হেনরি। গাছ থেকে নামার মত করে পিছলে নেমে গিয়ে বোনের কোমর জড়িয়ে ধরল। মুখ চেপে ধরল পেটে।

আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সিসি। 'তোকে অনেক ক্যান্ডি কিনে দেব, হেনরি। অনেক টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল।'

আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠল সিসি।

তার হাসির শব্দ মিলাতে না মিলাতেই শীতল শিহরণ বয়ে গেল কিশোরের

মেরুদণ্ড বেয়ে। লোকে ঘিরে ফেলেছে ওদের তিনজনকে।

জোরে কথা বলছে না কেউ। ফিসফাস করছে সবাই। সে-সব ছাপিয়ে বার বার কানে আসছে জনের যন্ত্রণাকাতর গোঙানি। যে ভঙ্গিতে সিসির দিকে তাকাচ্ছে লোকে, দেখে গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের।

'খবরদার, ওর বেশি কাছে যেয়ো না!' চিৎকার করে উঠল একজন। 'মেয়েটা মানুষ না, পিশাচ!'

'শয়তানের পূজারী!' বলল আরেকজন। 'জন্তু-জানোয়ারেও ওর কথা শোনে! দেখলে না কেমন করে নিজের ঘোড়াটার কানে কানে কথা বলল? খেপিয়ে তুলল ফ্রেঞ্চদের ঘোড়াগুলোকে! ওই ডাইনীটাই দুটো ঘোড়ার লড়াই লাগিয়েছে!'

বেশির ভাগ লোক তার কথা সমর্থন করল। গুঞ্জন উঠল তাদের মাঝে। ভুরু কুঁচকে সিসির দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে সন্দেহ।

'ও ডাইনী!' চিৎকার করে উঠল আরেকজন।

'ঠিক ঠিক, ঠিক বলেছ!' বলে উঠল অন্য আরেকজন। সুর করে বলতে শুরু করল, 'ডাইনী! ডাইনী! ডাইনী!'

তার কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাল আরও অনেকে।

ওদের ভাবভঙ্গি দেখে শিউরে উঠল কিশোর। মনে পড়ে গেল মধ্যযুগের ডাইনী পোড়ানোর কথা।

ছয়

'থামুন! থামুন আপনারা! দোহাই আপনাদের! শান্ত হোন!' পাগলের মত চিৎকার শুরু করল কিশোর। 'সিসি ডাইনী নয়! তাকে আমি চিনি। তার মত ভাল মেয়ে কম দেখেছি আমি।'

'কিশোর ভাই, ওরা আমাকে যা-তা বলছে,' কেঁদে ফেলল সিসি। 'আমি খারাপ কিছু নই। মোটেও ঠিক নয় ওদের কথা।'

সিসির দিকে তাকাল কিশোর। ওর সবুজ চোখের তারা পানিতে ঢাকা পড়েছে।

'ঠিক তো নয়ই, আমি কি জানি না সেটা,' সিসির কাঁধে হাত রেখে তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল কিশোর। ভয়ে কাঁপছে সিসি।

কিশোরের প্যান্ট খামচে ধরে পায়ের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে হেনরি। ওর মাথায়ও আলতো চাপড় দিয়ে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর।

কি করে ভাবছে ওরা সিসির মত একটা মেয়ে ডাইনী হতে পারে? রাগ ফুঁসে উঠতে লাগল কিশোরের মনের মধ্যে।

'ওকে খারাপ ভাবছেন কেন আপনারা?' লোকগুলোকে বোঝাতে গেল সে। 'লং হার্ট জন্তু-জানোয়ারদের বশ করতে জানতেন, তাঁর সঙ্গে থেকে থেকে ওদের সামলাতে শিখেছে সিসি। জানোয়ারেরা তাকে বিশ্বাস করে। যেমন আমি করি।'

দুই হাতে জনতাকে ঠেলে সরিয়ে এসে কিশোরের মুখোমুখি দাঁড়াল মার্ক

ফ্রেঞ্চ। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। চিৎকার করে উঠল, 'ওই ইনডিয়ান হারামজাদাটাই ছিল যত নষ্টের গোড়া। ওর ভয়ে গাঁয়ের কেউ কথা বলতে পারত না। সবাই ভেবেছিল, মরেছে, গাঁ-সুদ্ধ বেঁচেছে। কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে শয়তান কখনও মরে না। বংশধর রেখে যায়। সমস্ত তুকতাক শিখিয়ে দিয়ে গেছে এই ডাইনীটাকে।' সিসির দিকে আঙুল তুলল সে। 'ডাইনীদের চেহারা ভালই হয়। নইলে মানুষের মন ভোলাবে কি করে?'

সবাই মার্কের কথায় সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। জোরাল গুঞ্জন উঠল তাদের মাঝে।

'আপনারা যা-ই বলুন,' জনতার দিকে তাকিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, 'ঘোড়াগুলোর খেপে ওঠার পেছনে সিসির কোন হাত ছিল না। আপনারা নিজের চোখে দেখেছেন লাগাম টেনে ধরে সিসির ঘোড়াটাকে ফেলে দিতে চেয়েছিল জন। পড়ে গেলে ঘোড়াটা সহ মারা পড়ত সিসি। পরের বার যখন আবার একই কাজ করতে গিয়েছিল, বেসামাল হয়ে পড়ে ওদের ঘোড়া দুটো। এটা কি সিসির দোষ?'

কিশোরের দিক থেকে জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি জনতার দিকে ফেরাল মার্ক। অস্বস্তিতে পায়ের ওপর ভার বদল করল কেউ কেউ। সবাই চোখ নামিয়ে নিল। মার্কের বিরুদ্ধে সত্যি কথাটা বলতেও ভয় পাচ্ছে ওরা। ওর আক্রোশের শিকার হয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে ধনে-প্রাণে মারা পড়তে চায় না। গলা শুকিয়ে গেল কিশোরের।

'তুমি কি বলতে চাও আমার ভাই অন্যায় কিছু করেছে?' কিশোরের দিকে এক পা এগিয়ে গেল মার্ক।

'কি করেছে সেটা সবাই দেখেছে। আমি কেবল সত্যি কথাটা বললাম।'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল মার্কের। 'ওই বাড়ির সবগুলো মানুষ শয়তান। ফকির-ফোকরা যেগুলো বাইরে থেকে আসে সেগুলোও শয়তান।'

'আমার তো ধারণা, ফকির-ফোকরাগুলো আসে বলেই এই শয়তানের গাঁয়ে মানুষ এখনও বেঁচে আছে, নইলে বহু আগেই জমিদার-ফমিদারদের অত্যাচারে খতম হয়ে যেত। আর ফমিদারগুলোও তো বাইরে থেকেই ঘটি-কম্বল নিয়ে আসা। এখানকার নিরীহ মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত চুষে বড়লোক হয়েছে।'

'কি বললি! ফকিরের বাচ্চার এত্ত বড় সাহস!' চড় মারার ভঙ্গিতে হাত উঠে গেল মার্কের।

দুই ধাক্কায় সিসি আর হেনরিকে দুই পাশে সরিয়ে দিল কিশোর। চোখের পলকে ডান পা'টা চলে এল সামনে। সামনের দিকে সামান্য কুঁজো হয়ে গেছে দেহ। কারাতে মারের কায়দায় বাড়িয়ে দিয়েছে দুই হাত।

চীনা মারের এই ভঙ্গিটা মার্কের একেবারে অপরিচিত নয়। কিশোরের ক্ষিপ্রতা আর চোখের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দমিয়ে দিল তাকে।

ভুরু নাচাল কিশোর, 'কি হলো, মারছ না কেন? মারো! দেখি তোমার তাকত! মেয়েমানুষের সঙ্গে হেরে ভূত হও, চালাকি করেও জিততে পারো না, আবার বড় বড় কথা বলতে এসেছ!'

'খবরদার! মুখ সামলে কথা বলবে!' গর্জে উঠল মার্ক।

'তাই তো করছিলাম এতক্ষণ! দুর্বল পেলে মারতে খুব মজা লাগে, না? তোমার ভাইয়ের ভেঙেছে হাত, আমি তোমার ঘাড়টা মটকে দেব। এসো! মারো!'

কিশোরের মারমুখো ভঙ্গি দেখে আর এগোতে সাহস করল না মার্ক। এক পা পিছিয়ে গেল। দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'আজকে ছেড়ে দিলাম। আরেকদিন এ রকম বেয়াদবি করতে দেখলে...'

'আমরা কিচ্ছু করিনি,' জবাব দিল কিশোর। 'শয়তানিটা তোমরা শুরু করেছ। সিসিকে রেসে অংশ নিতে দেয়ার ইচ্ছে ছিল না তোমাদের।'

'হ্যাঁ, সত্যিই নিতে চাইনি,' মাথা ঝাঁকাল মার্ক। 'কেন জানো? কাচু-পিকচুতে তোমাদের চাই না আমরা। বাপ-মা দুটো উধাও হয়েছে। শয়তানের চেলা ছিল বোধহয়, শয়তানেই ধরে নিয়ে গেছে দোজখের মানুষকে জ্বালানোর জন্যে। বাকি দুটো চেলা ওয়্যাগন উল্টে মরেছে। বাকি আছ তোমরা।' মাটিতে থু-থু ফেলল মার্ক। সাহস করে কিশোরের চোখে আর ফেলতে পারল না। 'এতিমদের মিছিলের সঙ্গে বিদেয় হয়ে গেলেই পারো। শুনলাম, কয়েক দিনের মধ্যেই এখান দিয়ে যাবে একটা কাফেলা। যাওয়ার জন্যে সাহায্য চাইলে বরং সাহায্য করতে পারি। চাইকি, কিছু পয়সাও ভিক্ষে দিয়ে দেব।'

কিশোর কোন জবাব দেবার আগেই ঝটকা দিয়ে ঘুরে গটমট করে চলে গেল মার্ক।

চারপাশে ঘিরে থাকা জনতার দিকে তাকাল কিশোর। কারও চোখে ভয়। কারও রাগ। মিস্টার রনসনকে দেখল চোখে সহানুভূতি নিয়ে তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। কিশোরের চোখে চোখ পড়তেই মনে হলো কথা বলবেন। কিন্তু ওই মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়ালেন মিসেস রনসন। স্বামীর হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁকে।

কেউ আসবে না সাহায্য করতে, বুঝে গেল কিশোর। 'ফ্রেঞ্চরা জিততে পারেনি,' জনতার উদ্দেশ্যে বলল সে, 'আপনারা সবাই দেখেছেন। সিসি জিতেছে। প্রথম পুরস্কারটা তার পাওনা এখন।'

সামনে এগিয়ে এল গ্যারিবাল্ড। 'এ খেলার বিচারক হিসেবে আমার রায়, চালাকি করে জিতেছে সিসি। তার জেতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। এমতাবস্থায় তাকে পুরস্কারের টাকা দেয়া উচিত হবে না।' জনতার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল সে। 'আমার রায়ে কারও কোন আপত্তি আছে?'

একটা লোকও জবাব দিল না। সবাই নীরব।

'সিসি জিতেছে,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে দিল কিশোর, 'আপনি তাকে টাকাটা দেন বা না দেন।'

'ইয়াং ম্যান, যথেষ্ট বলে ফেলেছ। আর একটা বাক্যও না। যদি ভাল চাও, ছেলে-মেয়ে দুটোকে নিয়ে এখন বিদেয় হও এখান থেকে,' কর্কশ কণ্ঠে বলল গ্যারিবাল্ড।

লোকটার ফোলা ভুঁড়িতে ঘুসি মারার প্রবল ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল কিশোর। এত রাগ তার কমই হয়েছে। আঙুলগুলো মুঠোবদ্ধ হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা লক্ষ করল সিসি। তাড়াতাড়ি কিশোরের হাত ধরে টান দিল, 'এসো,

কিশোরভাই। চলো, বাড়ি চলো।...তোমরা এগোও, আমি গোস্টকে নিয়ে আসি।'

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। গ্যারিবাল্ড বা অন্য কারও দিকে একটিবারের জন্যে ফিরে তাকাল না আর। ওদের প্রতি তীব্র ঘৃণাটা বুঝিয়ে দিয়ে হেনরিকে বলল, 'চলো, হেনরি।'

শহর থেকে বেরোনোর রাস্তা ধরে দ্রুত এগিয়ে চলল সে।

'মগজে ওগুলোর একটারও ঘিলু নেই,' আনমনে বিড়বিড় করতে লাগল কিশোর। 'কুসংস্কারে ভরা। নইলে কি আর সিসিকে ডাইনী বলে।'

হেনরির দিকে তাকাল সে। নিষ্পাপ চোখ মেলে তার দিকে তাকাল হেনরি। বড় মিষ্টি লাগল মুখটা। রাগ অনেক কমে গেল কিশোরের। 'ভয় নেই, হেনরি। তোমাদের কিশোরভাই বেঁচে থাকতে তোমাদের একটা চুলও কেউ খসাতে পারবে না। গাঁয়ের লোককে নিয়েও চিন্তা নেই। সিসিকে টাকা দিতে হয়নি, চুকে গেছে। ঘটনাটা নিয়ে আর বিশেষ মাথা ঘামাবে না কেউ।'

হেনরিকে বলল বটে, কিন্তু কথাটা নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না কিশোর। ফ্রেঞ্চদের কোন বিশ্বাস নেই। তাদের সঙ্গে জুটেছে আবার গ্যারিবাল্ডের মত একটা ভয়ানক কুটিল পা-চাটা লোক।

শহরের বাইরে চৌরাস্তাটায় এসে সিসির অপেক্ষা করল ওরা। খানিক পরেই গোস্টের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে আসতে দেখা গেল সিসিকে। ঘোড়াটা কাছে এলে হেনরিকে ওটার পিঠে বসিয়ে দিল কিশোর।

'কিশোরভাই, সত্যি তুমি আমাদেরকে এতিম আর অসহায়দের মিছিলে দিয়ে দেবে?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল সিসি। গলা কেঁপে উঠল ওর।

ফিরে তাকাল কিশোর। 'না। ফার্মটা আছে এখনও। মাথার ওপর চালা আছে আমাদের, চাষের খেত আছে; আমরা তো বাস্তুহারা নই।'

আশ্বস্ত হলো সিসি। কিন্তু কিশোর হতে পারল না। আর কতদিন ওদের থাকতে দেবে গ্যারিবাল্ড? আজকের ঘটনার পর যে কোনদিন এসে হাজির হবে সে। টাকা দিতে না পারলে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। কিছুই করার থাকবে না তখন।

দমিয়ে দেয়া ভাবনাগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলল কিশোর। সিসির দিকে তাকাল। হাসল সিসি। দুশ্চিন্তার ছাপ নেই আর মুখে। হেনরির মুখেও ভয় নেই। এদেরকে অসহায় অবস্থায় বিপদের মধ্যে ফেলে কোথাও চলে যাওয়া এখন অসম্ভব—ভাবছে কিশোর। এমন এক বেকায়দা অবস্থায় পড়েছে, নিজের কথাও ভাবতে পারছে না। নিজে যে কি করে এখানে এল, কে তাকে ফেলে গেল, সেই রহস্যের সমাধান করারও সুযোগ নেই। ছেলে-মেয়ে দুটোর একটা কিনারা না করে বাড়ি ফিরে যাওয়ারও চেষ্টা করতে পারছে না। সিসি আর হেনরির একটা গতি না করে এই পরিস্থিতিতে ওদের ফেলে যেতে পারবে না সে।

'সিসি,' বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল সে, 'কোন চিন্তা কোরো না। তোমাদের ব্যবস্থা না করে আমি কোথাও যাব না।'

'তারমানে ব্যবস্থা হলেই তুমি আমাদের ফেলে চলে যাবে!' চোখ ছলছল করে উঠল সিসির।

'আরি, আবার কাঁদবে নাকি!...থাক থাক, যাব না কোথাও! কেঁদো না! যদি

কোথাও যাই, মানে যেতে হয়, তোমাদের সঙ্গে নিয়েই যাব।...নাও, এখন চোখ মোছো। বোকা মেয়ে কোথাকার।'

চোখ মুছল সিসি। কিন্তু হাসি ফুটল না মুখে। 'কিশোরভাই, তুমিও কি আমাকে ডাইনী মনে করো? লোকগুলো যা বলেছে, বিশ্বাস করো?'

'পাগল নাকি! আমি কি ওগুলোর মত ছাগল? জন্তু-জানোয়ারকে কথা শোনানোর ক্ষমতা আছে তোমার, গর্ব করার মত বিদ্যে এটা। এখন তো আমার রীতিমত দুঃখ হচ্ছে, আমিও শিখলাম না কেন!'

'শেখোনি ভাল করেছ। তাহলে তোমাকেও শয়তান বলত লোকগুলো।'

'তা তো বলতই।'

'তবে তোমার কিছু করতে পারত না। যা সাহস দেখলাম আজ তোমার। এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে যেভাবে রুখে দাঁড়ালে। মার্কের মত খেপা শুয়োরও তোমার ধমকে কুঁকড়ে গেল।...যা-ই বলো, ওর ভাইটার হাত ভাঙাতে আমি খুশিই হয়েছি। ঘাড় মটকে মরলে আরও খুশি হতাম।'

খিলখিল করে হাসতে লাগল সিসি। বোনকে হাসতে দেখেই যেন হেনরিও হাসল।

কিন্তু কিশোর হাসতে পারল না। সিসির কথা আর হাসি চমকে দিয়েছে তাকে। মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল শীতল শিহরণ।

সাত

দিন কয়েক পর। কুড়াল দিয়ে লাকড়ি ফাড়তে ফাড়তে ভাবছে কিশোর—এই একটি কাজ অন্তত জানোয়ারের সাহায্য ছাড়া করা যায়। মাথার ওপর কুড়াল তুলে ঘুরিয়ে কোপ মারল আবার লাকড়ির গায়ে। কাঠের টুকরো ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে। একপাশে জমে উঠছে লাকড়ির স্তূপ। লক্ষ্যই নেই সেদিকে। তার মন জুড়ে রয়েছে অচষা জমিটা।

পর পর কয়েকদিন খচ্চরটাকে দিয়ে হাল টানানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে সে। গ্যাঁট হয়ে থাকে। কোনমতেই ওটাকে দিয়ে কাজ করাতে পারে না। এগোতেই চায় না। প্রতিরাতে যখন বিছানায় এসে গড়িয়ে পড়ে কিশোর, সারা গায়ে ব্যথা, ক্লান্তিতে ভেঙে আসে, তখনও ঘুম আসতে চায় না তার। গ্যারিবাল্ডের মুখটা কুৎসিত, বিকৃত হয়ে চোখের সামনে ভাসতে থাকে। সেই যে পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরে, আর যেতে চায় না।

আজ আসেনি গ্যারিবাল্ড। কাল আসবে। কিংবা পরশু দিন। আসবেই সে, জানে কিশোর। সামান্য যে কটা টাকা আছে আর, তা দিয়ে গ্যারিবাল্ডের ঋণ শোধ হবে না। বাড়িটা কেড়ে নেবে গ্যারিবাল্ড।

ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে তখন কোথায় যাবে? কি করবে?

কাফেলার কথাটা প্রথমে পছন্দ হয়নি তার। কিন্তু এখন যতই ভাবছে, ততই

মনে হচ্ছে সে-ই ভাল। চলেই যাবে। আর কোন উপায়ও নেই। এ শহরে কেউ কাজ দেবে না তাকে। খাবার দেবে না। তার চেয়ে মিছিলে যোগ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাই উচিত। কি করে এল সে, সেই রহস্যের সমাধানের চেয়ে বেঁচে থাকার চিন্তা করা দরকার আগে।

কুপিয়েই চলেছে কিশোর। কুপিয়েই চলেছে। তার আশঙ্কাটা কোনমতেই প্রকাশ করতে পারে না সিসি আর হেনরির কাছে। মুখ ফুটে বলতে পারে না যে কোন সময় এসে ওদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে গ্যারিবাল্ডি। এতিমের মিছিলে ছাড়া তখন আর কোথাও ঠাঁই হবে না ওদের···

ঘোড়ার খুরের শব্দে ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল তার। কুড়ালটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে তাকাল। ওদের পড়শী আরনি হুফ। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। পাশাপাশিই থাকে, কিন্তু দেখা-সাক্ষাৎ খুব একটা হয় না।

আরনির ছুটে আসার ভঙ্গিতে অশনি-সঙ্কেত দেখতে পেল কিশোর। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। ইদানীং দুঃসংবাদের আশঙ্কা দেখলেই এমন হয় তার। হেঁটে গেল সামনের বারান্দার দিকে।

সিঁড়িতে বসে আছে হেনরি। কাঠের একটা খেলনা ঘোড়ার পা ছুটে গেছে, কোনমতেই লাগাতে পারছে না। লাগিয়ে দিল কিশোর। মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে হাসল হেনরি।

'কি হয়েছিল ঘোড়াটার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হাসিটা মুছে গেল হেনরির মুখ থেকে। কথা বলে জবাব দিতে না পারার দুঃখেই যেন জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

ওর চুলে আঙুল বুলিয়ে দিল কিশোর। 'থাক, হেনরি। একদিন তুমি আবার কথা বলতে পারবে।'

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল আরনি। মুখ তুলে তাকাল কিশোর। মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে মৃদু ডাক ছাড়ল ঘোড়াটা।

'হাল্লো, আরনি,' স্বাগত জানাল কিশোর। 'কেমন আছেন?'

'ভাল না, কিশোর। তোমাকে সাবধান করতে এলাম।'

'কি হয়েছে?' বুকের মধ্যে কাঁপুনি উঠে গেল কিশোরের।

'অদ্ভুত এক রোগ। গরুর। পাগল করে দিচ্ছে জানোয়ারগুলোকে। গতকাল ফ্রেঞ্চরা ওদের ছয়টা গরুকে গুলি করে মারতে বাধ্য হয়েছে। আমরা মেরেছি আজকে তিনটাকে।'

'বলেন কি!'

'হ্যাঁ, তাই।'

'কিন্তু আমাদেরগুলোর তো এখনও কিছু হতে দেখলাম না,' বলে বারান্দা থেকে নামল কিশোর। 'অসুস্থ যে সেটা কিভাবে বোঝা যাবে?'

ঘোড়া থেকে নামল আরনি। 'চলো, তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বাড়ির পেছনে আরনিকে নিয়ে এল কিশোর। পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখল হেনরিও এসেছে পেছন পেছন। তার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর।

'আমাদের তো আছেই মাত্র ক'টা গরু,' কিশোর বলল। 'ওখানটায় ছেড়ে

রেখেছি চরে খাবার জন্যে। গোয়ালে আর নিই না।'

নিচু হয়ে একটা গরুর শিং চেপে ধরল আরনি। মাথা ঝাড়া দিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল গরুটা। ডাকতে শুরু করল। কিন্তু শক্ত করে ধরে রাখল আরনি। একবার এপাশে, একবার ওপাশে কাত করে গরুর মুখটা দেখল।

'কি দেখছেন?' জানতে চাইল কিশোর। হাঁটু মুড়ে বসেছে গরুটার মুখের কাছে। তার পাশে বসে হেনরিও তাকিয়ে আছে কৌতূহলী চোখে।

'অসুস্থ হলে নাক দিয়ে সবুজ গ্যাঁজলা বেরোয়,' আরনি বলল। 'তারপর লাল হয়ে যায়। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে ওঠে গরুগুলো।'

'খুব খারাপ রোগ মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল।

'খারাপ না হলে কি আর নিজের গরু গুলি করে মারতে হয়। এ রকম রোগের কথা কেউ কখনও শোনেনি। গাঁয়ের লোকে ভাবছে, অশুভ কোন কিছুর ছায়া পড়েছে গাঁয়ে।' কিশোরের দিকে তাকাল আরনি, 'তোমাদের গরুগুলো তো ভালই আছে দেখছি।'

'এখনও আছে। হতে কতক্ষণ। ভালমত খেয়াল রাখতে হবে। একটা গরু খোয়ালেও মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের।'

ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গিয়েই বরফের মত জমে গেল যেন আরনি। আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ।

কি দেখে এমন হলো আরনির দেখার জন্যে তাকাল কিশোর। পেছনের আঙিনায় একটা নেকড়েকে মুখে তুলে মাংস খাইয়ে দিচ্ছে সিসি।

অস্ফুট একটা শব্দ করে পিছিয়ে গেল আরনি। 'সিসি, সাবধান! ওটা নেকড়ে! কুকুর নয়!' হেনরিকে দেখিয়ে কিশোরকে বলল, 'বাচ্চাটাকে ঘরে ঢোকাও। বন্দুক নিয়ে এসো।'

'ও কিছু না। ভয় পাবেন না,' আরনিকে আশ্বস্ত করতে চাইল কিশোর। 'জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে সহজেই খাতির করে ফেলতে পারে সিসি। নেকড়েটা ওর কিছু করবে না।'

কিন্তু শঙ্কামুক্ত হতে পারল না আরনি। 'কিন্তু ওটা নেকড়ে! গত বছর আমাদের অনেকগুলো গরু-ছাগল মেরে ফেলেছিল নেকড়েতে...আমি...আমি যাই...'

দৌড়ে আঙিনা পার হয়ে গেল আরনি। মিনিটখানেক পরেই ওর ঘোড়ার ছুটন্ত পদশব্দ কানে এল কিশোরের। গরুগুলো বাঁ-বাঁ করে হাঁক ছাড়ল কয়েকটা। তারপর নাক ঝাড়তে লাগল।

উঠে এসে একটা গরুর কপালে হাত রাখল সিসি। লম্বা জিভ বের করে ওর কনুই চেটে দিল গরুটা।

'আরনি এসেছিল কেন?' জিজ্ঞেস করল সিসি।

'গরুর নাকি কি এক আজব রোগ হচ্ছে,' কিশোর বলল।

মুখটা উঁচু করে ধরল সিসি। বাধা দিল না গরুটা। আরনি ধরাতে যেমন করেছিল, তার কিছুই করল না, চুপচাপ দেখতে দিল সিসিকে।

'নাহ্, আমাদেরটা সুস্থই আছে,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল সিসি। জন্তু-জানোয়ারের দুঃখ-যন্ত্রণা ওদের মত করেই বুঝতে পারে।

'আরনিও বলছিল ভালই আছে,' কিশোর বলল। 'কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। তুমি যখন বলছ কিছু হয়নি, তারমানে সত্যি হয়নি, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম।'

'ও ভাল থাকবে,' গরুটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সিসি। 'আমাদের একটা গরুরও কিছু হবে না।'

'না হলেই ভাল। এখন একটা গরু খোয়ানো মানে আমাদের বিরাট ক্ষতি। পাড়া-পড়শীদের গরুগুলোকে যে ভাবে গুলি করে মারতে হচ্ছে...'

'তার জন্যে কি দুঃখ হচ্ছে তোমার?' প্রচণ্ড রাগ ঝিলিক দিয়ে উঠল সিসির চোখে। 'মরুক না! সব মরে সাফ হোক শয়তানদের!'

'কি বলছ তুমি, সিসি!'

'ঠিকই বলছি। যেমন পাজী, ওদের শাস্তি হওয়াই উচিত। ওরা বলে আমি নাকি ডাইনী!'

আট

সেই শনিবারে হেনরি আর সিসিকে নিয়ে শহরে গেল কিশোর, দোকান থেকে জিনিস কিনে আনতে। সপ্তাহের এ দিনটিতে এলাকার সমস্ত চাষী বাজার করতে আসে। লোকে গমগম করে শহরটা।

কিন্তু সে দিন লোকের ভিড় দেখা গেল না মোটেও। কাঠের সাইডওয়াক ধরে হাতে গোণা কয়েকজন লোক হেঁটে যাচ্ছে। কেমন ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা। পুরো শহরই যেন শোক পালনে রত।

রনসন'স জেনারেল স্টোরের দরজা ঠেলে খুলল কিশোর। পাল্লার ওপরে লাগানো ঘণ্টা বেজে উঠে জানান দিল দোকানে খরিদ্দার ঢুকেছে। শব্দটা অনেক বেশি জোরাল মনে হলো কিশোরের কাছে। কারণ ভেতরে খরিদ্দারের ভিড় নেই, কোলাহল নেই। জুতোর শব্দ তুলে লোহাকাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল কিশোর। তাকে অনুসরণ করল সিসি আর হেনরি।

স্টোররুমের পর্দা সরিয়ে দোকানে ঢুকলেন মিস্টার রনসন। হাসলেন। 'গুড ডে, কিশোর। তারপর, কেমন আছ তোমরা?'

'আছি ভালই,' জবাব দিল কিশোর। 'শহরটা এমন নীরব কেন?'

'সারা হপ্তা ধরেই নীরব,' রনসন জানালেন। 'গরুর রোগ নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় আছে লোকে। রোগ সারানোর সব রকম চেষ্টা করছে। কোন লাভ হচ্ছে না। তুমি ক'টাকে গুলি করলে?'

'একটাও না।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মিস্টার রনসনের। 'বলো কি! কি খাইয়ে রোগ সারালে?'

'আমাদের গরুর রোগই হয়নি।'

সন্দেহ জাগল মিস্টার রনসনের চোখে। 'কেন হচ্ছে না বুঝতে পারছ কিছু?'

'কেন আবার। আমাদের ভাগ্য ভাল।'

সিসির দিকে দৃষ্টি সরে গেল মিস্টার রনসনের। 'হবে হয়তো।...ভাগ্য ভাল, নাকি অন্য কিছু?'

'অন্য আর কি হবে?'

'হুঁ!' আনমনে মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার রনসন। 'অবস্থাটা এমনই এখানকার, কারোরই মন-মেজাজ ভাল নেই। তা কি লাগবে তোমাদের?'

'কিছু চিনি আর ময়দা,' কিশোর বলল। 'আর সামান্য টিনের খাবার।'

পকেট থেকে তার শেষ সম্বল নোটের তাড়াটা বের করে আনল কিশোর। এক হাজার পেসো কাউন্টারে রেখে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এতে যা হয়, দিন।'

'দাঁড়াও, বাক্সে ভরে দিচ্ছি।'

কাউন্টারের ওপাশে নিচু হয়েই স্থির হয়ে গেলেন তিনি। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'এই, তোমরা সরে যাও ওখান থেকে!'

কাউন্টারের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল সিসি। দেখল, একটা বাক্স উঁচু করে ধরে রেখেছেন মিস্টার রনসন।

'কি হয়েছে, মিস্টার রনসন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'সাপ,' ফিসফিস করে জবাব দিলেন মিস্টার রনসন। 'এত বড় সাপ জীবনে দেখিনি। জলদি গিয়ে দেখো বাইরে কার কাছে বন্দুক আছে।'

কিশোর বাধা দেয়ার আগেই কাউন্টার ঘুরে অন্যপাশে চলে গেল সিসি। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সাপটার কাছে। 'ঘাবড়াবেন না, মিস্টার রনসন। ও আপনাকে কিছু করবে না।'

আস্তে হাতটা বাড়িয়ে দিল সিসি। ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে কিশোর দেখল, বিশাল সবুজ সাপটা ধীরে ধীরে সিসির হাত বেয়ে উঠে আসছে কাঁধের দিকে। ওর গলায় পেঁচিয়ে গেল মালার মত। শয়তানি ভরা কালো চোখের চাহনি সিসির ওপর স্থির। চেরা মাথাওয়ালা লাল জিভটা ঘন ঘন বেরিয়ে আসছে মুখের ভেতর থেকে।

হ্যাঁচকা টানে হেনরিকে নিজের পেছনে নিয়ে গিয়ে আড়াল করে রাখল কিশোর। সাপটার বাঁকা বড় বড় বিষদাঁতের দিকে তাকিয়ে শুকিয়ে গেল গলা। ঢোক গিলল বড় করে।

সাপটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সিসি। ফোঁস ফোঁস করছে ওটা। কিশোরের চোখে চোখ রাখল সিসি। 'ভয় নেই, কিশোরভাই, ওটা আমাকে কিছু করবে না। বাড়ির কাছে গিয়ে বনে ছেড়ে দেব।'

কাউন্টারের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল সিসি। সাপের লম্বা লেজটা ঝুলে আছে ওর পিঠের ওপর। হাত বাড়িয়ে লেজের ডগাটা ছুঁয়ে দেখল হেনরি। কিশোর ওসব কিছুই করতে পারল না। ভয়ে কেঁপে উঠল সে। জানে, বনের জানোয়ারের সঙ্গে ভাব করতে এক মুহূর্তও লাগে না সিসির। কিন্তু তাই বলে এতবড় একটা বিষাক্ত সাপকে গলায় পেঁচিয়ে রাখা!

পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার রনসন। কাঁপছেন থরথর করে। 'দোকান বন্ধ করে দিচ্ছি আমি,' কম্পিত স্বরে বললেন।

'আমাদের জিনিসগুলো?' কিশোর বলল।

'আরেক দিন এসে নিও।'

কাউন্টারে রাখা মুদ্রাটা হাত দিয়ে টেনে সরিয়ে আনল কিশোর। তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। হতাশ কণ্ঠে বলল, 'সিসি। হেনরি। চলো, যাই।'

দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। দড়াম করে মিস্টার রনসনকে পাল্লা লাগাতে শুনল। তালা আটকে দিলেন তিনি।

রাস্তা ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় পথচারীদেরকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল কিশোর। সবার চোখ সিসির গলার সাপটার দিকে। একটা বাড়ির জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল এক মহিলা। ঝট করে পর্দা টেনে দিল। দেখেও দেখল না সিসি। আপনমনে হেঁটে চলল।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল কিশোর। যত তাড়াতাড়ি বনের কাছে পৌছানো যাবে, সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

সেদিন রাতে। লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল কিশোর। দ্বিধায় পড়ে গেছে। ঘুম ভাঙাল কিসে?

শব্দটা কানে এল আবার। একজন মানুষের কণ্ঠ। খসখসে। ক্রুদ্ধ।

একজন নয়। আরও মানুষের কথা বলার শব্দ কানে আসতে লাগল।

ঘোড়ার খুরের ভোঁতা শব্দ শোনা গেল। বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়া শুরু হলো যেন তার।

জোরাল হতে লাগল খুরের শব্দ।

এগিয়ে আসছে।

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে শার্টটা গায়ে দিল। ওপরে চাপাল ওভারঅল।

কারা আসছে? কি চায়?

জানালার কাছে দৌড়ে এল সে। বাইরে ঘন কালো রাতের অন্ধকার। ঘোড়ার তীক্ষ্ণ ডাক কানে এল। সেই সঙ্গে মানুষের রাগত চিৎকার।

দেখতে পেল লোকগুলোকে। বাড়ি ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। শিকার কোণঠাসা করা নেকড়ের পালের মত।

জিভ শুকিয়ে সিরিশ কাগজের মত হয়ে গেল কিশোরের। চাঁদিটা দপদপ করতে লাগল। নিচে নামার সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল সে।

সামনের পারলারের একধারে দেয়ালে ঝোলানো লং হার্টের রাইফেলটা হুক থেকে খুলে নিল। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

সিঁড়ি বেয়ে ছুটে নেমে এল নিচের বারান্দায়। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দেখার চেষ্টা করল অন্ধকারে। অস্পষ্ট দেখতে পেল রাস্তা দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে কয়েকটা বড় বড় ছায়া। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দটা কেবল স্পষ্ট।

বারান্দা থেকে নেমে এল কিশোর। চাঁদের ওপর থেকে সরে গেল কালো মেঘের ঢাকনা। বড় একটা জিনিসকে পড়ে থাকতে দেখল আঙিনায়।

দৌড়ে এল কাছে। প্রচুর রক্তের মাঝখানে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে আছে একটা গরু। একরাশ অভিযোগ নিয়ে যেন কিশোরের দিকে স্থির তাকিয়ে রয়েছে নিষ্প্রাণ চোখ দুটো।

নয়

চিৎকার করে উঠল কিশোর। রাগ যেন টগবগ করে ফুটতে লাগল মগজে। খুনীকে এখন সামনে পেলে নির্দ্বিধায় গুলি করে বসত। গরুটার লম্বা লাল জিভ বেরিয়ে এসেছে মুখের ভেতর থেকে। গলা থেকে চুইয়ে পড়ছে এখনও রক্ত।

মর্মান্তিক দৃশ্যটা সইতে না পেরে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গেল কিশোর। গরুর মুখের মধ্যে একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। একটা কাগজ দলা পাকিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে মুখের ফাঁকে।

গরুর মুখে কাগজ কেন? হাত বাড়াল কিশোর। লালা আর রক্ত মাখা জিভটায় আঙুল লাগতেই ঝটকা দিয়ে সরিয়ে আনল। অনুভূতিটা ভয়ঙ্কর। সাবধানে আবার হাত বাড়িয়ে খুলে আনল কাগজটা। চাঁদের আলোয় খুলে দেখল লেখা রয়েছে:

আমাদের গরু মেরেছ, তোমাদের গরু মারলাম।
মেয়েটাকে ঠেকাও।
তুমি না পারলে আমরা ঠেকাব।

বোকা হয়ে লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ওরা ভাবছে, গরুর মড়ক লাগার পেছনে সিসির হাত আছে। কি অসম্ভব ভাবনা!

মরা গরুটার দিকে তাকাল সে। গরুটাকে জবাই করে রেখে গেছে ওরা। সিসিকেও কি খুন করতে আসবে!

দ্রুত ঘরের দিকে ফিরল কিশোর। সিসির কিছু হয়েছে কিনা দেখার জন্যে। সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সে। সাদা লম্বা নাইটগাউনের ঝুল উড়ছে বাতাসে। বেণী খুলে ফেলায় কালো চুলের বোঝা এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সারা কাঁধে। সুন্দরী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। চাঁদের আলোয় বাতাসে দুলন্ত গাউনটাকে অদ্ভুত লাগছে। মুখের ভঙ্গিটাও যেন কেমন।

বোনের পাশে দাঁড়ানো হেনরি। দুই হাত আড়াআড়ি রাখা বুকের ওপর। হেনরির সবুজ চোখ বিস্ফারিত। ঠোঁট কাঁপছে। ভাইয়ের কাঁধে একটা হাত রেখে তাকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করছে সিসি।

'আর কোন ভয় নেই,' অন্যদিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'ওরা চলে গেছে।' সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল সে। বন্দুকটায় হাত বোলাল। 'আবার এলে সোজা গুলি মেরে দেব।'

'কাগজটায় কি লেখা?' জানতে চাইল সিসি।

'ও কিছু না...' দেখলে ঘাবড়ে যাবে ভেবে দেখাতে চাইল না কিশোর। তাড়াতাড়ি কাগজটা পকেটে রেখে দিতে গেল।

কিন্তু কাগজটা কেড়ে নিল সিসি। পড়তে পড়তে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

'কি করে ভাবতে পারছে ওরা!' কেঁদে ফেলল সিসি। কাগজটা দলা পাকিয়ে

ছুঁড়ে ফেলে দিল উঠানে।

কিশোরের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে। চাঁদের আলোতেও ওর চোখের রাগ স্পষ্ট দেখতে পেল কিশোর।

'ওরা ভাবছে আমি অশুভ কিছু!' চিৎকার করে উঠল সিসি। 'জাহান্নামে যাক সব! মরুক! আমি ওদের ঘৃণা করি!'

দু'দিন পর। অনিচ্ছুক খচ্চরটার পেছন পেছন ভারী হাল ঠেলে নিয়ে এগোচ্ছে কিশোর, এই সময় দেখতে পেল গ্যারিবাল্ডকে। মুখটাকে আষাঢ়ের মেঘের মত গোমড়া বানিয়ে ভারী পায়ে হেঁটে আসছে খেতের ওপর দিয়ে।

খচ্চরটাকে থামাল কিশোর। পকেট থেকে রুমাল বের করে ভুরুর ওপরের ঘাম মুছল।

কাছে এসে দাঁড়াল গ্যারিবাল্ড। পেছনে ঠেলে দিল হ্যাটটা। ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি বলল, 'কিশোর, আগেই সাবধান করা হয়েছিল তোমাকে। সাফ কথা বলো, আজকের মধ্যে টাকা দিতে পারবে কিনা?'

ঢোক গিলল কিশোর। 'আমার কাছে মাত্র বিশ হাজার পেসো আছে। ফসল না উঠলে কোনমতেই আর একটা পয়সাও জোগাড় করতে পারব না।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল গ্যারিবাল্ড। চোখ নামিয়ে বলল, 'বেশ, ওটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপাতত বাড়ি থেকে আর বিদেয় করলাম না তোমাদের।'

পকেট থেকে নোটগুলো বের করল কিশোর। ফেলে দিল গ্যারিবাল্ডের ছড়ানো তালুতে। ভারী চাপ অনুভব করছে বুকের মধ্যে। কিছুই রইল না আর তার কাছে। তিনজন মানুষের কি করে চলবে! ভয়ানক দুর্ভাবনাটা জোর করে তাড়াল মাথা থেকে।

নোটগুলোর ওপর শকুনের নখের মত বাঁকা হয়ে চেপে বসল গ্যারিবাল্ডের আঙুল। হাতটা ঢুকে গেল কোটের পকেটে। ভঙ্গি দেখে প্রচণ্ড রাগ যেন দলা বেঁধে উঠে আসতে শুরু করল কিশোরের গলা বেয়ে।

'তোমাদের জানোয়ারগুলো সব সুস্থ আছে?' জিজ্ঞেস্ করল গ্যারিবাল্ড।

'আছে।'

'ফ্রেঞ্চদের ভাগ্য অতটা ভাল নয়। গাঁয়ের সবাই অবাক। সবার গরু মরছে, তোমাদের মরে না কেন?'

'জানি। রাতের বেলা চোরের মত এসেছিল ওরা। সিসিকে খুন করার হুমকি দিয়ে গেছে।'

'এ ভাবে গরু যদি মরতেই থাকে, সিসিকে সত্যিই খুন করবে ওরা; কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'কিন্তু সিসি কি ওদের গরু মারছে নাকি?' রাগটা দমন করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে কিশোরের পক্ষে। 'গরু মরছে রোগে। দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা পেতে চাইছে হদ্দ বোকাগুলো।'

হ্যাটটা টেনে সোজা করে বসাল গ্যারিবাল্ড। 'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলেও, কিশোর, গাঁয়ের অন্য কেউ করবে না।'

দশ

কিশোরের যখন এই দুর্গতি, রিটার তখন অন্য ঘটনা। রবিনদের লিভিং-রুমে ডায়েরী পড়ে সেই ঘটনার কথাই জানছে রবিন। গভীর আগ্রহে শুনছে মুসা আর জিনা।

পোশাকের দোকানটাতে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে–রিটা লিখেছে।

জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকাল ক্লডিয়া। 'চুরি করে পালাচ্ছিলে, তাই না? মজা টের পাবে। চোরের জন্যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে আমাদের।'

'কি বলছেন?' চমকে গেলাম। 'চোর হতে যাব কেন আমি?'

'চোর নও তো কি?' আঙুল তুলল ক্লডিয়া। 'তোমার গায়ে এখনও পরাই আছে ব্লাউজটা। নিয়ে পালাচ্ছিলে, আবার বলছ চোর নও!'

ব্লাউজটার দিকে তাকালাম। ধীরে ধীরে মাথায় ঢুকল ঘটনাটা কি ঘটেছে। ব্লাউজ সহ দোকানের বাইরে ধরেছে আমাকে ওরা। না বলে জিনিস নিয়ে বেরিয়েছি। চুরিই তো। কিন্তু আসলে তো আমি চুরি করিনি। বোঝাতে গেলাম, 'দেখুন...' বলেই চুপ হয়ে গেলাম। কি বলব? সময় পেরিয়ে অন্য সময়ে চলে গিয়েছিলাম! বিশ্বাস করবে?

'চুপ হয়ে গেলে কেন?' ধমকে উঠল ক্লডিয়া।

'দেখুন, জিনিসটা কিনতেই তো চেয়েছিলাম আমি,' জবাব দিলাম। 'নাহয় বাইরে থেকেই ধরে আনা হয়েছে আমাকে। তাতে কি হয়েছে? দাম দিয়ে দিচ্ছি। জিনিসটা আমার হয়ে গেল। ব্যস, ঝামেলা খতম।'

'উঁহু, তা হবে না,' মাথা নাড়ল ক্লডিয়া। 'সবাই সুযোগ পেয়ে যাবে তাহলে। পকেটে টাকা নিয়ে এসে জিনিস চুরি করবে। ধরা পড়লে বলবে, দাম দিয়ে দিচ্ছি। একটা উদাহরণ তৈরি করে রাখা দরকার। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। চুরি করার আগে যাতে দশবার ভাবে কেউ...'

'ভাল করে তাকিয়ে দেখুন তো, আমাকে কি চোর বলে মনে হচ্ছে?'

'ভদ্র চেহারার আড়ালেই চুরি করা সহজ,' কঠোর জবাব দিল ক্লডিয়া। প্রহরীদের বলল, 'এই, সিকিউরিটি অফিসে নিয়ে যাও একে।'

জঘন্য কথা বলল আমাকে সিকিউরিটি-ইন-চার্জ। বার বার 'চোর' বলে অপমান করল। বাবাকে খবর দিল।

আমার বাবা একজন সম্মানিত লোক, ভাল মানুষ, যে কেউ পছন্দ করবে তাকে। জন হপকিনস ইউনিভার্সিটি থেকে সাইকোলজিতে ডিগ্রি নিয়ে এখন মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন। টাকার সমস্যা নেই। তাঁর মেয়ে হয়ে আমি এ ধরনের অপরাধ করতেই পারি না। এ সব বলে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম ইন-চার্জকে। বুঝল তো না-ই, বরং ধমক দিল। আমার বাবার নাম নিয়ে ব্যঙ্গ করে

বলল, মানুষের রোগ সারাতে যাওয়ার আগে নিজের মেয়ের চিকিৎসা দরকার ছিল।

এত রাগ লাগল, কোন কথাই বলতে গেলাম না আর। একেবারে চুপ মেরে গেলাম। এদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। বাবার আসার অপেক্ষায় রইলাম।

বাবা এল। নির্বিকার ভঙ্গিতে সিকিউরিটি-ইন-চার্জের সব কথা শুনল। কোন প্রতিবাদ করল না। আমার পক্ষে কোন সাফাই গাইতে গেল না। ইন-চার্জের কথা শেষ হলে শান্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'কি করতে চান এখন? ওর বিরুদ্ধে কেস করবেন? আমার উকিলকে ফোন করব?'

'না, এতটা নিচে নামব না আমরা,' ইন-চার্জ বলল। 'অনেক কিছুই করতে পারতাম, কিন্তু আপনি সম্মানী লোক বলে ছেড়ে দিচ্ছি। পুলিশকে আর ডাকাডাকি করলাম না।' বাবার দিকে চেয়ে কঠিন হাসি হাসল লোকটা। 'তবে, এ ধরনের কাজ করতে যাতে আর কেউ সাহস না পায়, সে-জন্যে একটা ব্যবস্থা করে রাখা দরকার।'

আমার কয়েকটা ক্লোজআপ ছবি তুলে রেখে, বেশ কিছু সারগর্ভ উপদেশ দিয়ে বাবা সহ আমাকে বিদায় দিল সিকিউরিটি-ইন-চার্জ।

ছবি তোলায় আতঙ্কিত বোধ করলাম। কি করবে? পোস্টারে আমার ছবি ছেপে চোর আখ্যায়িত করে লাগিয়ে দেবে মলের দেয়ালে দেয়ালে? অন্য দোকানদারদের সাবধান করে দেবে?

সর্বনাশ হবে! এই মলে ঢোকার এখানেই ইতি। রকি বীচেও টিকতে পারব কিনা সন্দেহ। স্কুলের সব ছেলেমেয়েরা জেনে যাবে, শিক্ষকরা জানবে, পাড়া-পড়শীরা জানবে; হাত তুলে দেখাবে আর হাসাহাসি করবে—ওই যে চোরনি রিটা যায়! কোনমতেই সহ্য করতে পারব না। এতক্ষণ এত গালাগাল অপমানেও যা হয়নি, তা-ই হলো, চোখ ফেটে পানি এল আমার। যে অপরাধটা আমি করিনি তার জন্যে এতবড় শাস্তি আমাকে না দিলেও পারত ওরা।

আমার হাত ধরে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল বাবা। আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে। পার্কিং লটের চত্বর ধরে গাড়ির দিকে এগোলাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই বিকট শব্দে বাজ পড়ল। গাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেলাম।

গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে বাবা। এতক্ষণে কথা বলার সুযোগ পেলাম, 'বাবা, ব্লাউজটা আমি চুরি করিনি।'

'থাক, ও নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই। দোষটা আমারই। বাবার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করিনি আমি।'

'বাবা, সত্যি বলছি, ওটা আমি চুরি করিনি! বিশ্বাস করো!'

'যা হবার হয়ে গেছে। এখন থেকে আরও বেশি সময় দেব তোমাকে।' আমার হাতে চাপ দিল বাবা।

'বাবা, তুমি আমার কথা শুনছ না! আমি বলছি, আমি চুরি করিনি। সব দেখেশুনে চুরিই মনে হতে পারে, কিন্তু যা ঘটেছে সেটা সাংঘাতিক।'

পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে নীরবে কয়েক মিনিট গাড়ি চালাল বাবা। ভীষণ অস্বস্তিতে ভুগতে থাকলাম আমি। অবশেষে বাবা বলল, 'বেশ, বলো, কি ঘটেছে।

আমি শুনছি।'

ভেজা চুলে হাত বোলালাম। ঠোঁট কামড়ালাম। বাবাকে সব কথা বলি আমি, কোন কিছু গোপন করি না। বাবা আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। আমাকে বিশ্বাস করে। কিন্তু আজকের ঘটনাটা কি করবে?

'বাবা, যে কথাটা আমি বলব এখন, কথা দিতে হবে চুপ করে শুনবে। কথার মাঝখানে কোন মন্তব্য করবে না। কোন পরামর্শ দেবে না।'

'ঠিক আছে, কথা দিলাম।'

'ঘটনাটা হলো...' ঢোক গিললাম। দ্বিধা যাচ্ছে না আমার। শেষমেষ বলেই ফেললাম, 'বাবা, আমি সময় পেরিয়ে চলে গিয়েছিলাম।'

মাথা ঝাঁকাল বাবা, 'বলো, আমি শুনছি।'

'বাবা, ব্লাউজটা পরে দেখার জন্যে চেঞ্জিং রুমে ঢুকেছিলাম। হঠাৎ আলোগুলো মিটমিট শুরু করল। বিচিত্র শব্দ হতে লাগল। আবার আলো জ্বললে যখন বেরিয়ে এলাম, আমি এক ভিন্ন জগতে চলে গিয়েছি। বাবা, সেটা উনিশশো সাতাশি সাল।'

বাবাকে বিশ্বাস করতে বলছি, অথচ তখনও আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না, সত্যি সত্যি আমি অন্য সময়ে চলে গিয়েছিলাম।

'উনিশশো সাতাশি? তেরো বছর আগে?'

'হ্যাঁ, বাবা।' আমার কথা বিশ্বাস করছে কিনা বুঝতে পারলাম না। 'রাস্তার মোড়ের বিখ্যাত সেই অ্যামোজ কুকিস স্ট্যান্ডটা, যেটাতে প্রায়ই আমরা কুকিস কিনতে যেতাম...'

'এক সেকেন্ড,' রাস্তা থেকে মুহূর্তের জন্যেও নজর সরাচ্ছে না বাবা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসে শুকনো-শ্যাওলা-ভেজা গন্ধের মত গন্ধ, গরমকালে বৃষ্টির সময় যা হয়। বেশি স্পীডে চালানোর সময় কথা বললে অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে, তাই গতি কমাল বাবা। 'হ্যাঁ, এবার বোঝার চেষ্টা করে দেখা যাক, এ ধরনের কল্পনা কেন করতে গেলে তুমি।'

দমে গেলাম। 'অ, তারমানে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না! তুমি ভাবছ, মিথ্যে কথা বলছি!'

'আমি কি বলেছি, মিথ্যে বলছ? সত্যি কথাই বলছ তুমি,' ডাক্তারী-কণ্ঠে বলল বাবা, ফোনে রোগীদের সঙ্গে এ ভঙ্গিতে কথা বলতে বহুবার শুনেছি। 'অনেক সময় কিছু কিছু ঘটনা একেবারে বাস্তব মনে হয়, কিন্তু আসলে সেগুলো বাস্তব নয়। মন আমাদের সঙ্গে চাতুরি করে। কল্পনা বাস্তবতাকে দাবিয়ে দেয়।'

'হা কপাল!' বিড়বিড় করলাম। 'কেউ আমার কথা বুঝছে না, বিশ্বাস করছে না, এমনকি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধুটিও নয়। কেউ না! কেউ না!'

'রিটা,' বাবা জবাব দিল, 'সত্যিই বলেছ, আমি তোমার এত ঘনিষ্ঠ, এত কাছের মানুষ হয়েও পুরোপুরি বুঝতে পারিনি তোমাকে। কি করে বুঝব? আমি তো আর তোমার বয়েসী কিশোরী ছিলাম না কখনও। সেটা তোমার মা হলে পারত।...উনিশশো সাতাশি বললে না? এই সালটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তোমার মা মারা গিয়েছিল ওই বছর। আজকে তোমার জন্মদিন। এই দিনে মাকে তোমার খুব দেখতে ইচ্ছে করবে, এটাই স্বাভাবিক।'

'তারমানে,' ধীরে ধীরে বললাম, 'তুমি বলতে চাও, মাকে দেখার ইচ্ছে আমার এতটাই বেড়ে গিয়েছিল, কোনভাবে সময়কে ডিঙিয়ে পেছনে চলে গিয়েছিলাম?'

'না, ঠিক তা নয়। তবে মাকে দেখতে এতই ইচ্ছে করছিল, তোমার মনে হয়েছে তোমার মায়ের বেঁচে থাকার সময়টায় চলে গেছ।'

'তারমানে এখনও তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না!' কান্না এসে যাচ্ছিল আমার, জোর করে ঠেকালাম। বাবার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। বড় বড় ফোঁটা ক্রমাগত আঘাত হানছে জানালার কাঁচে।

'আমি বিশ্বাস করি বা না করি, রিটা,' বাবা বলল, 'সত্যিই যদি তুমি পিছিয়ে চলে গিয়ে থাকো, সাংঘাতিক ভাগ্য বলতে হবে তোমার। কতবার আমি পিছিয়ে যেতে চেয়েছি সেই সময়টাতে...কিন্তু কখনও পারিনি।'

হঠাৎ করেই বাবার জন্যে বড় মায়া লাগল। বেচারা! মাকে অসম্ভব ভালবাসত। মা'র কথা মনে হলে ভীষণ কষ্ট পায়। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে তার কাঁধে রাখলাম। পাশে কাত হয়ে আমার মাথায় চুমু খেল বাবা।

ঘুরে পেছনে তাকালাম। পেছনের সীটে রাখা লাল কাগজে মোড়া একটা বড় বাক্স। 'ওটা আমার জন্মদিনের কেক, তাই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল বাবা। 'মল থেকে যখন ফোন পেলাম, তখনই বুঝতে পারলাম তোমার মনের অবস্থা কি হবে। তোমাকে খুশি করার জন্যে কেকটা কিনে নিয়েছিলাম।'

বললাম না, পৃথিবীতে আমার বাবা আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু!

'কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব, বাবা,' নাক টানলাম। ঠাণ্ডাটা ধরতে আরম্ভ করেছে মনে হয়। 'আমি সত্যিই এখন খুশি।'

বুনো অঞ্চলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি তখন। গাড়ির ছাতে তবলা বাজাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা। কুয়াশা এত ঘন হয়ে গেছে, সামনে পনেরো ফুট দূরেও দৃষ্টি চলে না।

আর ঠিক এই সময় ঘটল অঘটনটা।

এগারো

দম নেয়ার জন্যে থামল রবিন।

কিন্তু চুপ থাকতে দিল না তাকে মুসা আর জিনা।

'থামলে কেন?' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'পড়ো পড়ো! তারপর?'

'অঘটনটা কি?' জিনাও উত্তেজিত। 'পড়ো জলদি!'

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে রবিনের। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করল:

চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল গাড়ির ইঞ্জিন। চুপ হয়ে গেল রেডিও। বাতি নিভে গেল। যেন চলতে চলতে মরে গেল গাড়িটা।

কোনমতেই স্টার্ট করতে না পেরে বৃষ্টির মধ্যেই ছাতা আর টর্চ হাতে নেমে

গেল বাবা। হুড তুলে খানিকক্ষণ ইঞ্জিনের এটা-ওটা নাড়াচাড়া করল। চালু করতে পারল না।

ফিরে এসে ড্রাইভিং সীটে বসল বাবা। 'আশ্চর্য! মনে হচ্ছে কেউ যেন ব্যাটারির সমস্ত শক্তি শুষে নিয়েছে। অলটারনেটর ঠিক, কোন লীকটিক নেই...'

'বজ্রপাতের জন্যে নয় তো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হতে পারে...কিংবা ভিনগ্রহবাসীর মহাকাশযান,' রসিকতা করল বাবা। ইদানীং রকি বীচের বাসিন্দারা কিভাবে ইউ এফ ও নিয়ে মেতে উঠেছে, জানা আছে তার।

'দূর, ইউ এফ ও না ছাই। আকাশে তো কোন আলোই দেখছি না।...কি করব এখন?'

'কাছেই একটা গ্যাস স্টেশন আছে। মেকানিক আছে কিনা দেখতে পারি গিয়ে। তুমি গাড়ির মধ্যে বসে থাকো। গাড়ি পাহারা দাও। নেকড়েরা ঘিরে ধরলেও গাড়ি থেকে বেরোবে না।'

এই শেষ কথাটাও বাবার রসিকতা। একটা সিনেমায় বনের মধ্যে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ছবির বাবাকে বেরোতে হয়েছিল তার মেয়েকে রেখে। নেকড়েরা ঘিরে ধরেছিল গাড়িটা। ভয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাতে চেয়েছিল মেয়েটা। মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে তার।

কথাটা মনে করিয়ে বাবা বরং ভয় ধরিয়ে দিল আমার। বাইরের অবস্থাটা খুব খারাপ। চাঁদ নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার। গাড়ি খারাপ হয়েছে একেবারে নির্জন জায়গায়।

ছাতা আর টর্চ হাতে আবার বেরিয়ে গেল বাবা। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে নেচে নেচে এগিয়ে যেতে দেখলাম টর্চের আলোটাকে। কমতে কমতে হঠাৎ মিলিয়ে গেল। বাবাকে গিলে নিল যেন প্রবল বৃষ্টিপাত আর ঘন কালো অন্ধকার।

একা বসে রইলাম গাড়ির মধ্যে।

তবলায় টোকার বিরাম নেই। গড়িয়ে গড়িয়ে আসতেই আছে কুয়াশা। পেঁজা তুলোর মত ঘিরে ফেলছে সব কিছুকে। বিদ্যুৎ নেই, উইন্ডশীল্ড ওয়াইপার চলতে পারছে না। সামনের জানালার বাইরেটাকে লাগছে একটা ভেজা ব্ল্যাকবোর্ডের মত।

নিজের অজান্তে গায়ে কাঁটা দিল। গাড়ির মধ্যে থাকাটা নিরাপদ কিনা বুঝতে পারলাম না। এ সব নিয়ে যতই ভাবব, ভয় বাড়তে থাকবে। তাই বর্তমানের ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে দূর করে দিয়ে অন্য চিন্তায় মন দিলাম। সারাটা দিন যা যা ঘটেছে, বিশেষ করে মলে, সেটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। বাবা হয়তো ঠিকই বলেছে, কল্পনাতেই আমি সময় পেরিয়ে গিয়েছিলাম। একটা ঘোরের মধ্যে চেঞ্জিং রুম থেকে বেরিয়ে দোকানের বাইরে চলে গিয়েছিলাম। ক্লডিয়া অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল বলে আমাকে দেখেনি।

কিন্তু কল্পনা কি এত বাস্তব হয়? নাকি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার? উল্টোপাল্টা, ভুলভাল সব দেখেছি! এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছিল মন, যেখানে কল্পনা আর বাস্তবের প্রভেদ বোঝা কঠিন ছিল।

পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো?

অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে বসতে গেলাম। সীট বেল্ট পরাই আছে। খুলতে যেতেই

স্কার্টের পকেটে খসখস করে উঠল কিছু। একটা কাগজ। বিজ্ঞাপনের ছেলেটা দিয়েছিল।

এক সেকেন্ড! বিজ্ঞাপন!...এই তো প্রমাণ! এতক্ষণ মনে পড়েনি। আর কোন সন্দেহ নেই। কল্পনা নয়। সত্যি সত্যি সময় পেরিয়ে অতীতে চলে গিয়েছিলাম আমি।

পকেট থেকে কাগজটা বের করে পড়ার চেষ্টা করলাম। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ চমকাল। সবুজ রঙের কাগজ। আবার বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় রইলাম। যতবার চমকাল, একটু একটু করে পড়তে লাগলাম। দোকানটার গুণগান করেছে। ক্রিসমাসে কিছু জিনিস খুব সস্তায় পাওয়া যাবে, সেকথা লিখেছে। তবে আমার কথার সপক্ষে প্রমাণ করার মত তারিখ বা সন লেখা নেই।

পেছনটা উল্টে দেখলাম। আকাশ চিরে দিল বিদ্যুতের নীল শিখা। গুড়ুগুড়ু শব্দ কেঁপে কেঁপে চলে গেল এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। আমাকে অবাক করে দিয়ে স্পষ্ট যেন একটা পরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা দেখতে পেলাম:

না, তুমি পাগল নও।
তবে মস্ত বিপদের মধ্যে রয়েছ।
কেকটা বের করে হাতে নিয়ে নাও।
এখনই।

লেখা বলছে পাগল নই, কিন্তু আমার মনে হলো বদ্ধ পাগল হয়ে গেছি, একেবারে উন্মাদ। কেক বের করলে কি হবে?

আবার পড়তে গেলাম লেখাটা। নেই। সেই ফোন নম্বরটাই শুধু। নাহ্, সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছি! ভয় দুর্বল করে দিল আমাকে। কিন্তু কৌতূহল দমাতে পারলাম না। আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাতে কাত হয়ে পেছনের সীট থেকে তুলে আনলাম কেকের বাক্সটা। কিন্তু তেমন ভারী লাগল না। বোমা থাকলে নিশ্চয় অনেক বেশি ভারী হত।

কি জানি, এমন কোন বোমাও রেখে থাকতে পারে, যেটা হালকা। খুব সাবধানে ডালা খুললাম। সিনেমায় দেখেছি, বাক্সে ভরা বোমার ডালা খুলতে গেলেই বুম করে ফাটে। ভেতরে তার-টার দেখলাম না। টিক টিক করে ঘড়িও চলছে না। কেকের গায়ে লেখা রয়েছে: হ্যাপি বার্থডে, রিটা।

এটাই কি বিপদ? এই কেক? হো হো করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। মনকে ধমক দিলাম: নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করো, রিটা! পাগলামি শুরু করেছ তুমি!

বিদ্যুৎ চমকাল আবার। কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে আসতে দেখলাম। নিশ্চয় মেকানিক নিয়ে ফিরে এসেছে বাবা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কেকের কথাটা বাবাকে বললে হেসেই খুন হবে।

কাছে এসে দাঁড়াল সবচেয়ে আগের মূর্তিটা। দরজার লক খুলে দিয়ে, হাতল ঘুরিয়ে জানালার কাঁচ নামালাম। বাবা ভেবে জিজ্ঞেস করতে গেলাম, 'মেকানিক পেয়েছ?'

এই সময় চেহারাটা চোখে পড়ল।

বাবা নয়। কিন্তু চেনা চেনা লাগল। কোথায় দেখেছি? কোথায় দেখেছি? হ্যাঁ,

মনে পড়ল। দেখেছি মলের দেয়ালে। পোস্টারের ছবিতে। যেখানে অপরাধীদের ছবি সাঁটানো হয়। এই গুণ্ডাটার চেহারার পাশেই হয়তো এতক্ষণে মলের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে আমার মুখটাও। ভাবতে কালো হয়ে গেল মনটা।

আতঙ্কটা আসতে সময় লাগল। ধীরেই এল। তবে, এল। মুখ দিয়ে ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি। দ্রুত কাঁচটা নামিয়ে দিতে গেলাম। চট করে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। ভেতরে ঠেলে দেয়ার আগেই তুলে দিতে পারলাম কাঁচটা। ভাগ্যিস গাড়িটাতে চাইল্ড লক আছে। দরজাটা খুলতে পারল না তাই। পটাপট যতখানে যতগুলো লক আছে, সব লাগিয়ে দিলাম।

তারপরের দৃশ্যটা হরর সিনেমার ভয়াল দৃশ্য বললে কম বলা হবে। চুপচুপে ভেজা ফ্যাকাসে চামড়া, চোখা নাক, মাথায় লেপটানো নানা রঙের চুলওয়ালা যুবকগুলোকে দেখে মনে হলো নরক থেকে উঠে এসেছে। মোট চারজন ওরা। গাড়ি ঘিরে ঘুরতে শুরু করল। থেকে থেকে চামড়ার দস্তানা পরা হাত দিয়ে চাপড় মারতে লাগল জানালার কাঁচে।

'হাই, বেবি,' দাঁত বের করে হাসল ওদের লাল-চুলো নেতাটা, যার ছবি মলে সাঁটানো আছে, 'বেরিয়ে এসো। কি বসে আছ গাড়ির মধ্যে!'

'হ্যাঁ, চলে এসো,' সুর মেলাল আরেকজন। 'এই গরমে বৃষ্টিতে ভিজতে বড় আরাম।' শরীরটা তার এত মোটা, ছোটখাট একটা জলহস্তী মনে হচ্ছে। কপালে উল্কি দিয়ে সাপ আঁকা।

'খেয়েদেয়ে আর কোন কাজ নেই তোমাদের?' চিৎকার করে জবাব দিলাম। 'বৃষ্টিতে ভেজার চেয়ে বরং গাঁজায় দম দাওগে। ইচ্ছে করলে ড্রাগও নিতে পারো। এখানে আমাকে জ্বালাতে এসেছ কেন?'

গাড়ির ট্রাংকে উঠে লাফাতে শুরু করল একজন। অন্য আরেকজন বুট পরা পায়ে লাথি মেরে একে একে ভেঙে ফেলতে লাগল হেডলাইট, টেল লাইট, পার্কিং লাইট।

'তুমি বললে ড্রাগ-ট্রাগ সবই নেব,' খিকখিক করে হেসে জবাব দিল নেতা। 'কিন্তু গাড়িতে বসে আছ কেন? বেরোও। বেরিয়ে এসে তারপর বলো। নাকি ভাবছ ওখান থেকে তোমাকে বের করে আনতে পারব না আমরা?'

'জাহান্নামে যা, শয়তানের দল!' চিৎকার করে উঠলাম আমি।

গাড়িটাকে দোলাতে শুরু করল ওরা। ভাগ্যিস ভলভো গাড়িগুলো খুব মজবুত করে বানায় কোম্পানি। দোলানোর চোটে গা গুলিয়ে উঠল আমার। ভয় পেয়েছি সেটা বুঝতে দিলাম না ওদের, চিৎকার করে বললাম, 'এ গাড়ির মধ্যে জীবনেও ঢুকতে পারবি না তোরা। এটা কি জানিস? ভলভো এস সেভেন্টি। গাড়ির জগতে সবচেয়ে শক্তগুলোর একটা।'

পাথর দিয়ে বাড়ি মারল জলহস্তীটা। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল ড্রাইভারের পাশের জানালা। ফোকর দিয়ে মাথা গলিয়ে বলল সে, 'সরি! তোমার ছোট্ট বাহনটার ক্ষতি করে ফেললাম না তো?'

কেকটা ব্যবহার করার সময় এসেছে। খানিক আগে কাগজে দেখা লেখাটার কথা মনে পড়ল। আশ্চর্য! কিভাবে সতর্ক করে দিল আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়!

বাক্স থেকে কেকটা বের করে যতটা জোরে সম্ভব বসিয়ে দিলাম ওর মুখে। কেক, মাখন, সব ছড়িয়ে গেল চতুর্দিকে। দলা দলা আটকে গেল ওর নাকে-মুখে, চুলে, মাথায়।

'সরি,' চিৎকার করে ওর কথাতেই জবাব দিলাম, 'তোমার ছোট্ট মুখটার কোন ক্ষতি করে ফেললাম না তো?'

মুখ খারাপ করে একটা গালি দিল সে। চোখ থেকে আঠাল চকলেট বের করার চেষ্টা করছে। 'আমি তোমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব!'

'ধরতে পারলে তবে তো,' বলেই ওদিককার দরজার লকটা নামিয়ে, হ্যান্ডেলে মোচড় দিয়ে, জোড়া পায়ে লাথি মারলাম দরজার গায়ে। আঘাতটা সবচেয়ে বেশি লাগল জলহস্তীর মোটকা ভুঁড়িতে। হুঁক করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল তার পেট থেকে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল কাদার মধ্যে।

দলের বাকি তিনজন রয়েছে অন্যপাশে। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ঝেড়ে দৌড় লাগালাম বনের দিকে।

বারো

এত বছরের চীয়ারলীডিং প্র্যাকটিস কাজে লাগল এখন। প্রায় উড়ে পার হয়ে এলাম খোয়া আর কাদাপানিতে ভরা রাস্তা। ঢুকে পড়লাম ঝড়ে উন্মত্ত বনের মধ্যে। যে ভাবে কোনদিকে না তাকিয়ে দৌড়াচ্ছিলাম, কপাল ভাল গাছের গায়ে কপাল ঠুকে গেল না। ডালপাতার বাড়ি লাগছে মুখে। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে সরানোর চেষ্টা করতে করতে ছুটলাম। ভেজা কাপড় সেঁটে আছে গায়ের সঙ্গে। ডালপাতা, কাঁটালতা জড়িয়ে যাচ্ছে হাতে পায়ে, আঁকড়ে ধরছে। তবুও বনটা এখন গাড়ির চেয়ে নিরাপদ।

জীবনেও এত ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে দেখিনি আমি। সারা আকাশটাতে জালের মত বিছিয়ে যাচ্ছে তীব্র নীল শিখা। ক্ষণে ক্ষণে বজ্রের গর্জন। যেন কোন অজানা দানবেরা দল বেঁধে পৃথিবী আক্রমণ করতে আসছে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালাম। নীলচে-সাদা বিদ্যুতের আলোয় ঠিক আমার পেছনেই লেগে থাকতে দেখলাম গুণ্ডাগুলোকে।

প্রাণপণে দৌড়াতে থাকলাম। পেছন ফিরে তাকালাম না আর। যখন মনে হলো, আর পারব না, ধরা পড়ে যাবে, ঠিক তখন চোখে পড়ল সার্ভিস স্টেশনের আলো। পাহাড়ের মাথায়। বাবা সম্ভবত ওখানেই গেছে মেকানিকের খোঁজে। কুয়াশায় উজ্জ্বল হতে পারছে না আলোটা, ঘোলাটে গোল একটা আভা। যা-ই হোক, এ যাত্রা বোধহয় বেঁচে গেলাম।

কিন্তু পাহাড়ের ঢালটা চোখে পড়তে দমে গেলাম। ওটা বেয়ে দৌড়ে ওঠা সহজ নয়। ধরে ফেলবে আমাকে গুণ্ডাগুলো। পেছনে চলে এসেছে।

তাই বলে থামলাম না। খোয়া বিছানো একটা রাস্তা উঠে গেছে চূড়ায়। সেটা

ধরে উঠতে গিয়ে শরীর বাঁকা হয়ে গেল সামনের দিকে। পিছলে গেল স্যান্ডেল। পড়ে গেলাম উপুড় হয়ে। হাতের আঙুলগুলো নিজের অজান্তেই কাদায় বসে গিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরল। হাঁপাতে হাঁপাতে বুক ব্যথা হয়ে গেছে।

ধরে রাখতে পারলাম না। আঙুলের সঙ্গে উঠে এল নরম মাটি। পিছলাতে শুরু করলাম। খানিকটা পিছলে নামার পরই গড়ানো শুরু করলাম। ধারাল পাথরের আঘাতে কেটে যেতে লাগল কপাল, কনুইয়ের চামড়া। পড়ে গেলাম কাদাপানিতে ভরা ছোট একটা গর্তের মধ্যে।

'তোলো ওকে!' চিৎকার করে বলল জলহস্তী। চোখেমুখে এখনও মাখন লেগে রয়েছে। এক হাতে পেট চেপে ধরে রেখেছে, যেখানে লেগেছিল গাড়ির দরজা। 'ওর বারোটা বাজাব আমি আজ!'

দুজন এসে দুদিক থেকে ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল আমাকে।

'খুব চালাক ভাবো নিজেকে, তাই না?' বলল ওদের নেতাটা।

'না, তা আমি ভাবি না,' জবাব দিলাম। 'ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে আমার। খিদেয় পেট জ্বলছে। যে ভেজা ভিজেছি, সর্দি লেগে যাবে জানা কথা।' বেপরোয়া হয়ে উঠেছি। কাজেই কথা বলতে পরোয়া করলাম না। 'আর কি ভাবছি শুনবে? ভাবছি, সকালে কার মুখ দেখে আজ ঘুম ভেঙেছিল, তোমাদের মত একদল ঘেয়ো কুত্তার সামনে পড়তে গেলাম।'

আমার চারপাশ ঘিরে ঘুরতে শুরু করল নেতাটা। রাগে কথা বেরোচ্ছে না মুখ থেকে। ঢোক গিললাম। কিন্তু যা বলার বলে ফেলেছি, ফিরিয়ে নেয়া যাবে না আর।

'ঘেয়ো কুত্তা হই আর যা-ই হই,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ওদের নেতা, 'তোমাকে একটা শিক্ষা না দিয়ে ছাড়ব না আজ, বিচ্ছু মেয়ে কোথাকার! রিকোর যা অবস্থা করেছ,' জলহস্তীকে দেখাল সে, 'তার জন্যে শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।'

'অ, মোটকুর নাম তাহলে রিকো!' চুকচুক শব্দ করলাম জিভ দিয়ে। মুখ ফসকেই যেন বেরিয়ে গেল, 'আমি তো ভেবেছিলাম হিপো, হিপোপটেমাস।'

'চুপ...!' মুখ খিস্তি করে গালি দিল জলহস্তী। গর্জন করে বলল, 'আজ তোকে আমি...!'

কালো জ্যাকেটের নিচ থেকে টান দিয়ে বের করল কি যেন। বোতাম টিপতে ঝটাৎ করে খুলে গেল আট ইঞ্চি লম্বা ইস্পাতের ফলা। একটা সুইচব্লেড।

'আমাকে ইয়ার্কি মারা হচ্ছে, না! আমি হিপো?' ছুরির মাথাটা আমার পেটের দিকে তাক করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রিকো, 'মজাটা আজ টের পাওয়াব!'

এক পা এগিয়ে এল সে।

দম বন্ধ করে পেটে ছুরি খাওয়ার অপেক্ষায় আছি। হাঁচি দিয়ে ফেললাম। হাঁচি দেয়ার মোটেও উপযুক্ত সময় নয় এটা। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে, কাদায় গড়াগড়ি খেয়ে, পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে আমার অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়।

আচমকা ঝলকে উঠল লালচে-সাদা তীব্র আলো। আকাশের বিদ্যুতের মতই অসংখ্য বিদ্যুতের শিখা উঠে আসতে শুরু করল আমার পায়ের কাছ থেকে। আমাকে ঘিরে, আমার সমস্ত দেহ ঘিরে, ছড়িয়ে পড়ল কাদাপানিতে; সরু সরু আলোর সাপের মত ছুটে গেল আমার শত্রুদের দিকে।

সবগুলোকে জীবন্ত জালের মত জড়িয়ে ফেলতে লাগল সেই রঙিন বিদ্যুৎ-শিখা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল ওরা। পাগলের মত নাচতে লাগল কাদার মধ্যে। হাত-পা ছুঁড়ে সেই বিদ্যুৎ-বিভীষিকার কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে।

দৃশ্যটা দ্রুত মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। তারপর সব অন্ধকার।

তেরো

জেগে উঠে চারপাশে বিচিত্র সব পোশাক পরা মানুষকে দেখতে পেলাম হাসপাতালে রয়েছি। পায়ের কাছে দাঁড়ানো মহিলা ডাক্তার। ধূসর-চুল। বুকে লাগানো নেম-ট্যাগে নাম লেখা শেলী অলরিজ। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাবা। সাংঘাতিক উদ্বিগ্ন। বাবার পাশে দাঁড়ানো একজন পুলিশ অফিসার।

পুলিশ কেন?

কাল থেকে সেই যে শুরু হয়েছে–আমার আতঙ্কের প্রহর কি আর শেষ হবে না!

'আমি ওই ব্লাউজ চুরি করিনি!' চিৎকার করে উঠলাম। 'জীবনে কারও জিনিস চুরি করিনি আমি!'

'কিসের ব্লাউজ?' জানতে চাইল অফিসার।

'চুরির অভিযোগে তোমাকে দায়ী করা হচ্ছেও না,' ঘরের আরেক পাশ থেকে বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। সেদিকে তাকাইনি, তাই দেখিনি এতক্ষণ–এখন দেখলাম, পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। হাসিমুখে এগিয়ে এলেন তিনি।

'চুপ করে থাকো, হনি,' আস্তে করে বাবা আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিল। 'চুপচাপ শুয়ে থাকো। কোন চিন্তা কোরো না।'

'কিন্তু ও কিসের কথা বলল?' চুরির প্রসঙ্গ টেনে আনতে চাইছে অন্য অফিসার।

'আহ্, থামো তো, ডেরিয়াল,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'মেয়েটা অসুস্থ। তাকে এ সময় বিরক্ত করার কোন দরকার আছে?…রিটা, আমাদের আসার কারণটা তোমাকে বলি। কিছুক্ষণ আগে তোমার ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। মনে আছে?'

ধীরে ধীরে স্মৃতিটা ফিরে আসতে শুরু করল আমার। গাড়িতে আটকা পড়া…বনের মধ্যে ছোটার দুঃস্বপ্ন…আমাকে ঘিরে ছড়াতে থাকা বিদ্যুতের জাল…হাসপাতালে রয়েছি যখন, নিশ্চয় আমাকে ছুরি মেরেছে…

'হ্যাঁ, মনে আছে,' জবাব দিলাম। 'আমাকে ছুরি মারা হয়েছে!'

'না না, হনি,' বাবা বলল, 'তোমার কিচ্ছু হয়নি। ছুরি ওরা মারতে পারেনি তোমাকে।'

ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। বালিশে মাথা রাখলাম। চোখের পাতা মেলতেও কষ্ট হচ্ছে।

'তোমাকে এখন প্রশ্ন করতে খারাপই লাগছে,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'কিন্তু

তোমার স্মৃতিটা তাজা থাকতে থাকতে সব কথা জেনে নিতে চাই। বদমাশগুলোকে শায়েস্তা করতে হলে সব জানতে হবে আমাদের।'

'ওই চার গুণ্ডার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। ওরা এখন পুলিশের কব্জায়। শয়তানের গোড়া একেকটা। ওদের বিরুদ্ধে আগেও পুলিশের খাতায় অভিযোগ ছিল। এখন তো হাতেনাতেই ধরা পড়ল। দেখলে চিনতে পারবে?'

'পারব মানে?' হেসে উঠলাম। 'ওদের চেহারা এখনই মুখস্থ বলে দিতে পারি আপনাকে।...এমনকি ছবি কোথায় পাবেন, তা-ও বলতে পারব।'

'ছবি!'

মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলে আফসোস করতে লাগলাম। কিন্তু আর ফেরার উপায় নেই। 'মলের দেয়ালে অভিযুক্তদের ছবি যেখানে সাঁটানো হয়, সেখানে দেখতে পাবেন ওদের নেতার ছবি–বাকি চারটেও নিশ্চয় আছে, অত খেয়াল করিনি; আমার ছবিটার পাশে।'

'তোমার ছবি মানে?' কথাটা ধরে বসল অফিসার ডেরিয়াল। 'তুমি চুরি করেছিলে নাকি?'

'না, করিনি!'

'সে অনেক কথা,' প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার চেষ্টা করল বাবা।

বিরক্ত দৃষ্টিতে ডেরিয়ালের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আসল কথা আগে। রিটা, গুণ্ডাগুলো কিভাবে তাড়া করল তোমাকে, খুলে বলতে পারবে?'

'হ্যাঁ, পারব। গাড়িতে বসে ছিলাম,' বললাম আমি। 'বাবা গিয়েছিল সার্ভিস স্টেশনে, গাড়ি ঠিক করার জন্যে মেকানিক আনতে। চারপাশ থেকে ভূতের মত এসে উদয় হলো শয়তানগুলো। গাড়িটাকে ঘিরে ফেলে জানালায় থাবা মারতে লাগল কেউ, কেউ ট্রাংকে উঠে লাফানো শুরু করল; তারপর একজন পাথর দিয়ে বাড়ি মেরে জানালার কাঁচ ভাঙল।'

'কোন্‌টা?'

'মোটকা জলহস্তীটা। ওর নাম নাকি রিকো।'

'খোঁচা দিয়ে কথা বলেছিলে?'

'নামটা ঠিক হয়নি বলে হেসেছিলাম।'

'তারমানে নাম নিয়ে ব্যঙ্গ!' আনমনে বিড়বিড় করে ছোট একটা কালো পুলিশ বুকে তথ্যটা লিখে নিল ডেরিয়াল।

'ডেরিয়াল, তুমি এখান থেকে যাও তো,' শীতল কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। 'হলে গিয়ে অপেক্ষা করো।...রিটা, জানালার কাঁচ ভাঙার পর কি করলে?'

'কোনমতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে ঢুকে পড়লাম বনের মধ্যে। সার্ভিস স্টেশনটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম। ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেলাম নিচে। একেবারে ওদের হাতের মুঠোয়।'

'তারপর? বাধা দিলে কিভাবে?'

'আমি আসলে বাধা দিতে পারিনি,' ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা কল্পনা করে নিজের অজান্তেই

ভুরু কুঁচকে গেল আমার। 'ছুরি বের করে আমাকে মারতে আসছিল হিপো…মানে, রিকো, হঠাৎ বাজ পড়ল ওদের ওপর…'

'বাজ পড়লে তুমি রেহাই পেলে কি করে?' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ডেরিয়াল।

'তোমাকে না এখান থেকে যেতে বললাম!' ধমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

দরজার দিকে এগোল ডেরিয়াল। ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল, যেতে ইচ্ছে করছে না।

আমার দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'হ্যাঁ, বাজ পড়ল, তারপর?'

আমি জবাব দেবার আগেই ডাক্তার বলে উঠলেন, 'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? রিটা, তুমি যা-ই বলো, ওই ছেলেগুলো বজ্রপাতের শিকার নয়।'

'কিন্তু ডাক্তার,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক্ খেয়েছে ওরা, এটা তো ভুল নয়?'

'না, ভুল নয়। তবে বজ্রপাত থেকে শক্ খায়নি ওরা। বজ্রপাত হলে জুতো, কাপড়-চোপড় পুড়ে যেত, চামড়া ঝলসে যেত। কিন্তু তেমন কোন জখমই নেই ওদের শরীরে। কাপড়ের কোন ক্ষতি হয়নি। এত কাছে থেকে রিটাও অক্ষত থাকত না।'

'কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখলাম,' জোর দিয়ে বললাম আমি। 'হঠাৎ জ্বলে উঠল লাল-সাদা বিদ্যুতের শিখা, ঘিরে ফেলল ওদের।'

'অন্য কোন ধরনের বজ্র নয় তো?' বাবা বলল। 'বল্ লাইটনিং বা অন্য কিছু?'

'বল্ লাইটনিং জাতীয় কিছু বাস্তবে সত্যি আছে কিনা জানা নেই আমার,' ডাক্তার বললেন। 'যদি থাকেও, ওই বিদ্যুতের শিকার নয় ছেলেগুলো। ওদেরকে যেটা আঘাত হেনেছে সেটা লো-অ্যাম্পিয়ারেজ কিন্তু হাই-ভোল্টেজ এনার্জি সোর্স থেকে আসা। কোন ধরনের স্টান গান হতে পারে।'

'স্টান গান! মানে অবশ করে দেয়া বন্দুক?' বাবা বলল। 'তারমানে আর কেউ ছিল তখন ওই বনে, গাছের আড়ালে লুকানো…'

'আমার তা মনে হয় না,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'ওই নির্জন গভীর জঙ্গলে, অন্ধকারে, প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অকারণে কে বসে থাকবে ট্যাজার গান নিয়ে?' তারপর যেন নিজেকেই বোঝালেন, 'অবশ্য এ ছাড়া আর ব্যাখ্যাটাই বা কি!'

আমিও ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একমত। আমি আর ওই গুণ্ডাগুলো ছাড়া জঙ্গলে কেউ ছিল না তখন। ভেবে অবাক হলাম। বজ্রপাত না হলে বিদ্যুৎ এল কোথা থেকে? আমার কিছু হলো না কেন? তবে কি…নিজের কাছেই প্রশ্নটা বেখাপ্পা লাগল আমার: আমিই কি কোনভাবে উৎপন্ন করেছি ওই বিদ্যুৎ?

'স্টান গানটা তোমার কাছে ছিল না তো, রিটা?' দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করল ডেরিয়াল। চলে যায়নি সে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল।

হাসলাম। ডান হাতের তর্জনী তুলে পিস্তলের মত তাক করলাম তার দিকে। 'এই যে আমার স্টান গান।'

রীতিমত চমকে গেল ডেরিয়াল। লাফ দিয়ে সরে গেল দরজার কাছ থেকে।

আমার রসিকতায় হেসে উঠল ঘরের সবাই।

'যাকগে, ওসব কথা,' যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যাখ্যা না পাওয়ায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না ক্যাপ্টেন। 'রিটা, বদমাশগুলোকে চিকিৎসার জন্যে স্টেট হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চিকিৎসা শেষে থানায় নেয়া হবে। যাবে দেখতে?'

রাতের ঘটনার কথা ভাবলাম। আরেকবার ওদেরকে দেখার কৌতূহল সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম, 'যাব।'

হাসপাতালের লোডিং বে-তে পৌঁছে শব্দ শুনেই বোঝা গেল কোথায় আছে ওরা।

'আমি যাব না! আমি যাব না!' শুনতে পেলাম চিৎকার। পরিচিত সেই কর্কশ কণ্ঠ। নেতাটা। 'হাত সরাও!'

'তোমাকে কে কেয়ার করে, দারোয়ানের ছাও?' চিৎকার করে উঠল আরেকজন। 'পিস্তল রেখে এসো দেখি, হয়ে যাক এক হাত, কে হারে কে জেতে!' হিপোর কণ্ঠ।

এক সারি অ্যামবুলেন্সের কাছে এসে থামল আমাদের গাড়ি। বাবা, ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার, অফিসার ডেরিয়াল এবং আমি–গাড়ি থেকে নামলাম। দেখতে পেলাম সেই চার যুবককে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। ওদের ভ্যানে তোলার চেষ্টা করছে দুজন পুলিশ। কোনমতেই ভ্যানে উঠতে চাইছে না। হাসপাতালের সিকিউরিটি গার্ডেরা ঘিরে রেখেছে চারপাশ থেকে।

চারজনের হাতেই হাতকড়া। একজনের হাতের সঙ্গে আরেকজনকে জোড়া দিয়ে শেকল বানিয়ে ফেলা হয়েছে। আলাদা থাকলে দৌড় দিত। একটা বিচিত্র জিনিস লক্ষ করলাম–ওদের চুল; তারের মত খাড়া হয়ে আছে। বৈদ্যুতিক শক খেয়েছে যে, নিশ্চয় সেজন্যে।

'বাহ্, চুলের ছাঁট তো বেশ চমৎকার হয়েছে!' বলতে বলতে হাসিমুখে এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। 'কে ছেঁটে দিল? ডিজাইনার হবিস হপকিনস?'

আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে নেতা-গুণ্ডা। আতঙ্ক ফুটল চোখের তারায়। ঝুলে পড়ল নিচের চোয়াল। চিৎকারের ভঙ্গিতে হাঁ হয়ে গেল মুখ। শব্দ বেরোল না।

কিন্তু হিপোর চিৎকার রুদ্ধ হলো না। আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। সোজা দৌড় দিল পুলিশ ভ্যানের দিকে। বাকি তিনজনকেও টানতে টানতে নিয়ে চলল সঙ্গে। যেটাতে উঠতে বাধা দিচ্ছিল এতক্ষণ, সেই ভ্যানটাই যেন ওদের শেষ আশ্রয়স্থল।

'সরাও, সরাও ওকে!' মুখে কথা ফুটল লাল-চুলো নেতাটার। 'ও একটা আস্ত ডাইনী!' দুজন পুলিশ অফিসারের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে চাইল সে। 'এবার আমাদের মেরেই ফেলবে! দোহাই 'তোমাদের, আমাকে জেলখানাতেই নিয়ে চলো!'

'প্লীজ!' কেঁদে ফেলল বাহাদুর হিপো। 'ওকে কাছে আসতে দিয়ো না!'

স্তব্ধ বিস্ময়ে দৃশ্যটা তাকিয়ে দেখলেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার, অফিসার ডেরিয়াল ও বাবা। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ। একজন একজন করে চোখ ফেরাল আমার দিকে।

'হ্যাঁ, এরাই,' ক্যাপ্টেনকে বললাম আমি। 'এই শয়তানগুলোই কাল রাতে ধাওয়া করেছিল আমাকে।'

চোদ্দ

ঘড়ির অ্যালার্মের শব্দে চোখ মেলতে বাধ্য হলাম। মনে হলো কয়েক মিনিট আগে ঘুমিয়েছি। রাগ হলো ঘড়িটার ওপর। তাকিয়ে দেখি, দুপুর পেরিয়ে গেছে। তারমানে দীর্ঘ সময় ঘুমিয়েছি।

জানালার বাইরে উজ্জ্বল আলো। মনে পড়ল সব কথা। কাল রাতে ডাক্তার অলরিজকে দিয়ে আমার রিলিজ পেপার সই করিয়ে বাড়ি নিয়ে এসেছে বাবা। ঘড়িটাতে আমিও অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম। গরমের ছুটি। স্কুলে যাবার তাড়া নেই। ভাবলাম, আরেকটু ঘুমিয়ে নিই।

অ্যালার্ম বন্ধ করার জন্যে সুইচ টিপতে গেলাম। কিন্তু ঘড়িটার গায়ে আমার আঙুলের ছোঁয়া লাগতেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল। বন্ধ হয়ে গেল ঘড়িটা। পুরোপুরি মৃত! অ্যালার্ম তো বন্ধ হলোই, সময় শো করার যে লাল নম্বরগুলো জ্বলছিল, সেগুলোও নিভে গেল মুহূর্তে।

চোখ থেকে ঘুম দূর হয়ে গেল আমার। মনে পড়ল গাড়িটার কথা। গতরাতে গাড়িটাও এই ঘড়ির মতই আচমকা মরে গিয়েছিল।

তুলে নিলাম ঘড়িটা। অদ্ভুত একটা সুড়সুড়ি জাতীয় অনুভূতি টের পেলাম আঙুলে। হাত, বাহু বেয়ে উঠে এল শরীরে, পেটের কাছে নেমে গেল। চাঙা বোধ করতে লাগলাম।

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে মাটিতে নামলাম। ড্রেসারের ওপর চোখ পড়তেই দেখতে পেলাম সিডি প্লেয়ারটা। পাশে রাখা সেই ব্লাউজ, যেটার কারণে এত হেনস্তা হতে হয়েছিল গতকাল।

সিডিটা নতুন। নিশ্চয় আমার জন্মদিনের উপহার। বাবা কিনে এনে রেখে দিয়েছে, আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম।

খুব খুশি হলাম। বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল মনটা। এত ভাল বাবা খুব কম মেয়েরই ভাগ্যে জোটে।

এ রকম একটা সিডি প্লেয়ার পাওয়ার আমার বহুকালের শখ। বাজাতে গেলাম। ড্রেসারের নিচে কার্পেটের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে বাক্সটা। ওতে একটা পাতলা বই পেলাম। কি করে বাজাতে হয়, লেখা রয়েছে তাতে।

সিডি প্লেয়ার বাজাতে জানি আমি। তা-ও বইটা দেখে নিলাম ভালমত। সিডির পেছনের তার-সহ প্লাগটা বের করে নিলাম। সকেটে ঢোকাতে হবে। সকেটটা রয়েছে আমার পড়ার টেবিলের নিচে। চেয়ার সরিয়ে ঢুকে পড়লাম টেবিলের নিচে। প্লাগের কাঁটাগুলো ঢোকাতে গেলাম সকেটে। ঢুকল না।

কয়েকবার চেষ্টা করে কেন ঢুকছে না দেখার জন্যে তুলে আনলাম চোখের

সামনে। একটা কাঁটা সামান্য বাঁকা হয়ে আছে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। নতুন জিনিসটার বাঁকা কাঁটা! সোজা করতে প্লায়ার্স লাগবে। বেরিয়ে আসার আগে প্লায়ার্স ছাড়াই সোজা করা যায় কিনা দেখার জন্যে দুই আঙুলে টিপে ধরে চাপ দিলাম। বাকি আঙুলগুলোর কোন একটা বোধহয় অন্য কাঁটাটাতে লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল এক আজব ঘটনা। জ্যান্ত হয়ে উঠল সিডি প্লেয়ার। পাওয়ার পেয়ে গেছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়ে গেছে মেশিনে। একটা সিডি ঢোকানোই ছিল, প্লে বাটনটাও অন করা ছিল, বাজতে শুরু করল সেটা।

এমন ভাবে চমকে গেলাম, টেবিলের নিচে আছি ভুলে গিয়ে মাথা তুলতে গিয়ে বাড়ি খেলাম টেবিলে। ব্যথা লাগল। উহ্ করে মাথা নিচু করে ফেললাম।

প্লাগটা ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম বাইরে। আমি ছেড়ে দিতেই আবার পাওয়ার চলে গেছে, অফ হয়ে গেছে প্লেয়ার। বুঝতে আর অসুবিধে হলো না, আমি একটা চলমান জেনারেটরে পরিণত হয়েছি।

চোখ পড়ল আবার ব্লাউজটার ওপর। মনে হলো, গতকাল ওটা গায়ে দেয়ার পর থেকেই যত গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। গায়ে দিয়ে অতীতে চলে গিয়েছিলাম। নিজের মধ্যের ভয়ঙ্কর ক্ষমতাটা প্রকাশ পেল···

সত্যি কি তাই?

আরেকবার পরীক্ষা করে দেখার কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। নিশ্চিত হতে হবে, ওই ব্লাউজটার মধ্যেই লুকানো রয়েছে কিনা এত ক্ষমতা। জানাটা জরুরী মনে হলো আমার কাছে।

ব্লাউজটা হাতে করে নিয়ে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। আয়নার দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে পরে ফেললাম। ভয় লাগছে। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। কি ঘটবে জানি না।

মলের ড্রেসিং রুমে যা ঘটেছিল, ঠিক একই ভাবে মিটমিট করতে লাগল ঘরের বাতিটা। কানের কাছে গুঞ্জন শুনলাম। তারপর দপ করে বাতি নিভে গেল।

জ্বলে উঠল আবার।

ঘরের বাইরে পদশব্দ শুনতে পেলাম। বাবা আসছে নিশ্চয়। 'বাবা!' গলা চড়িয়ে ডাক দিয়ে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। উপহারটার জন্যে একটা ধন্যবাদ দেয়া দরকার। 'বাবা···'

দরজা খুলেই স্থির হয়ে গেলাম।

বাবা নয়!

পড়া থামাল রবিন। দম নিল। ডায়েরীতে ক'টা পাতা আর বাকি আছে উল্টে দেখল। মুখ তুলে বলল, 'আর বেশি নেই। মাত্র কয়েকটা পাতা।'

'পড়ে ফেলো,' মুসা বলল। 'বাপরে বাপ, এ কি গল্প শোনাচ্ছে! আমার কাছে তো রীতিমত ফ্যান্টাসি মনে হচ্ছে!'

মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'চোখের সামনে সেদিন কিশোরকে রূপ পাল্টাতে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। ভাবতাম, রিটা গুল মারছে।'

'পড়ো, পড়ো!' তাগাদা দিল মুসা।

লম্বা শ্বাস টেনে ফুসফুস বোঝাই করল রবিন। ধীরে ধীরে সেটা বের করে দিয়ে চোখ নামাল আবার ডায়েরীর পাতায়। রিটা লিখেছে:

এমন একজনকে দেখতে পেলাম, যাকে বহুকাল দেখি না। পরনে বড় বড় গোলাপী ফুল আঁকা কাপড়ের হাউসড্রেস। কানে ম্যাচ করা রঙের রিং। ওই পোশাক আমার অতি পরিচিত। কতবার ওটার নিচের অংশ ধরে টানাটানি করেছি। ওটা ধরে শপিং সেন্টারে গেছি, আরও কত কি।

'মা!' চিৎকার দিয়ে সামনে ছুটে গেলাম।

ঠোঁটে আঙুল রেখে চিৎকার করতে মানা করল মা। আমার ঘরে ঢুকে আস্তে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আবার সেই মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, বহু বছর আগেই যাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। জীবনে আর কোনদিন দেখতে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি। হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারছি। স্বপ্ন নয়, পুরোপুরি বাস্তব।

হঠাৎ লক্ষ করলাম আমার ঘরটাও বদলে গেছে। গত গ্রীষ্মে কেনা বাঘের গায়ের ডোরাকাটা রঙের বেডশীটটা নেই বিছানায়, তার জায়গায় পাতা রয়েছে জলকুমারী আঁকা চাদর। জানালার পর্দাগুলো রঙধনু রঙের। বহু বছর আগে বাবা কিনে এনে দিয়েছিল মাকে। আমার প্রিয় গায়ক-গায়িকার পোস্টারগুলো দেয়াল থেকে উধাও। ওগুলোর জায়গায় টানানো রয়েছে কয়েকটা হাতে আঁকা ছবি। একটা বিশেষ ছবির দিকে চোখ পড়তে যেন প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম। নতুন টানানো হয়েছে। একটা শপিং সেন্টার থেকে কিনে আনা হয়েছিল, ১৯৮৭ সালে। তেরো বছর আগে আমার বেডরুমটা যে ভাবে সাজানো ছিল, সেই দৃশ্য।

আমার মাকেও সে-সময় যেমন দেখেছিলাম, তেমনি আছে। তেমনি সুন্দরী। তেমনি হাসিখুশি।

ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। বহুদিন পর আবার যখন ফিরে পেয়েছি, কোনমতেই আর ছাড়ব না।

'আরে, ছাড়, ছাড়!' সেই আগের মত হেসে বলল মা। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। 'রিটুমণি, কেমন আছিস, মা?'

মায়ের মুখের সেই পুরানো আদুরে ডাক শুনে সহ্য করতে পারলাম না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। মায়ের জন্যে কি যে শূন্যতা জমে ছিল আমার বুকের মধ্যে! হাজারটা প্রশ্ন ছলবলিয়ে উঠে আসছে যেন আমার মুখে। কোন্‌টা বাদ দিয়ে কোন্‌টা করব? জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার কি হয়েছে, মা? আমি এখানে এলাম কি করে?'

'আমিই প্রোগ্রাম সেট করে রেখেছি, যাতে তুই চলে আসতে পারিস এখানে,' মা জবাব দিল।

'প্রোগ্রাম মানে?' তাজ্জব হয়ে গেলাম। 'আমি কি ভিসিআর নাকি?'

হেসে উঠল মা। 'অনেকটা তা-ই। ভিসিআর-এর সার্কিটে ছোট্ট কম্পিউটার চিপ থাকে, মনে করিয়ে দেয় কখন যন্ত্রটাকে অন করে রেকর্ড শুরু করতে হবে, জানিস তো?'

মাথা ঝাঁকালাম।

'মানুষের দেহটাকেও ভিসিআর-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। তফাৎটা শুধু তারের

মাধ্যমে সঙ্কেত পাঠায় কম্পিউটার চিপ, আর মানুষের পাঠায় মগজ–খুব সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক সঙ্কেত, স্নায়ুর মাধ্যমে।'

'তারমানে আমি যা করতে পারছি,' জিজ্ঞেস করলাম, 'সব মানুষই তাই পারবে?'

'না,' মাথা নাড়ল মা, 'তা পারবে না। আর সব মানুষের মধ্যে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত এত দুর্বল, আছে যে সেটাই বুঝতে পারে না। তোর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। তুই যে কোন মেশিনের ব্যাটারি থেকে শক্তি সংগ্রহ করে নিজের ভেতরে সঞ্চয় করতে পারিস। একটা জিনিস লক্ষ করেছিস, তোর এবারের জন্মদিনের শুরু থেকে তোর ছোঁয়ায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলো কেমন উদ্ভট আচরণ করে?'

'হ্যাঁ,' উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। 'আমাদের গাড়িটা আচমকা মাঝরাস্তায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘড়িটা গেল ডেড হয়ে। সিডি প্লেয়ার চলল। বাতিগুলোর কাছাকাছি গেলেই মিটমিট শুরু করে।'

'হুঁ, তারমানে আঁচ করে ফেলেছিস নিজের ভেতরের ক্ষমতার কথা,' মা বলল। 'ওসব যন্ত্র থেকে সমস্ত বিদ্যুৎ শুষে নিয়ে নিজের ভেতরে জমা করে ফেলেছিলি নিজের অজান্তে। সে-জন্যেই ডেড হয়ে গিয়েছিল যন্ত্রগুলো।'

'বলো কি! আমি তাহলে বান মাছের মত মানুষকে বৈদ্যুতিক শক্ দিতে পারি?'

হাসিতে ঝিলিক দিয়ে উঠল মায়ের চোখ। 'বান মাছের চেয়ে অনেক বেশি পারিস। তবে কাউকে যাতে অহেতুক শক্ না দিয়ে বসিস, সে-জন্যে এটার ব্যবহার শিখতে হবে তোকে। নিয়ন্ত্রণ করা জানতে হবে। তা না হলে কখন যে কাকে খুন করে ফেলবি, ঠিক নেই।'

আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিল মা। 'তবে ভয় নেই, নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে সময় লাগবে না। এটা তোর একটা বাড়তি ক্ষমতা। আসল ক্ষমতাটা জাম্পিং। তুই একজন জাম্পার।'

'আমি কি?'

'জাম্পার। আমাদের বাস্তবতাকে নিয়ন্ত্রণ করে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, নিজের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করে তার মধ্যে সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলতে পারিস তুই। সেই সুড়ঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে চলে যেতে পারিস যে কোন সময়ে–যাকে মোটামুটি ভাবে বলা হয়ে থাকে টাইম ট্র্যাভেল বা সময়-ভ্রমণ।'

'ওভাবেই আমাকে এই উনিশশো সাতাশি সালে নিয়ে এসেছ নাকি?' মায়ের কথা হাঁ করিয়ে দিয়েছে আমাকে।

মুচকি হাসল মা। 'আমি আনিনি। আমি জাম্পার নই। তুইই এসেছিস আমার কাছে। নিজেই নিজেকে নিয়ে এসেছিস।'

'কিন্তু কিভাবে? আমি তো চেষ্টাও করিনি।'

'চেষ্টা তোকে করতে হয়ও না। তোর অতি-ইন্দ্রিয়ই এ ব্যাপারে তোকে সাহায্য করে।'

'বুঝলাম না।'

'আচ্ছা, বল্ তো, কখন উড়তে শেখে পাখির ছানা? ওড়ার জন্যে তাকে কি কোন শিক্ষা নিতে হয়?'

'না,' জবাব দিলাম।

'তারমানে উড়তে পারার ক্ষমতাটা ওর জন্মগত। ডিমের ভেতর থেকে যেদিন বেরোয় সেদিন থেকে ক্ষমতাটা তৈরি হয়ে যায় ওর মধ্যে। কিন্তু পারে না যতক্ষণ না মা ওকে বাসা থেকে ঠেলে ফেলে দেয়।'

মা'র কথা ভয় ধরিয়ে দিতে লাগল আমার। 'তুমি কি বলতে চাইছ আমি উড়তেও পারি?'

'না, তা পারিস না। একটা উদাহরণ দিলাম। বাসা থেকে ঠেলে ফেলার পর হঠাৎ করেই আবিষ্কার করে ফেলে পাখির ছানা, সে উড়তে পারে। কিছুক্ষণ আনাড়ির মত ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে শেষে ঠিক শিখে ফেলে কি করে ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সময়মত আমিও তোকে কেবল একটা ঠেলা দিয়ে দিয়েছি। বাকিটা তোর আপনা-আপনিই হয়ে যাবে।'

'কিন্তু,' মহা অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম, 'তুমি আমাকে ঠেলা দিলে কিভাবে? তুমি তো আমার সঙ্গেই ছিলে না।'

'ছিলাম,' মাথা ঝাঁকাল মা। 'তুই সেটা বুঝতে পারিসনি। বহুকাল আগে তোর মগজে একটা মেসেজ রেখে দিয়েছিলাম আমি। তোর এবারকার জন্মদিনে যাতে আমার কাছে আসতে পারিস, পিছিয়ে আসতে পারিস এখনকার সময়ে। মেসেজটাকে উস্কে দেয়ার জন্যে আরও একটা জিনিসের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম, যেটা দেখলেই মনের মধ্যে ঝড় ওঠে তোর...'

'ব্লাউজটা!' জোরে কথা বলতেও ভয় পাচ্ছি, যেন চিৎকার করলেই এই মধুর স্বপ্নটা টুটে যাবে, অদৃশ্য হয়ে যাবে মা।

বুঝতে পারছি এখন, দোকানে ব্লাউজটা দেখে চেনা চেনা লেগেছিল কেন।

'হ্যাঁ,' মা বলল, 'ওটা এক ধরনের ভিজিউল ট্রিগার। অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই জাম্প করতে পারবি। কিন্তু আপাতত ট্রিগারটা অন করার জন্যে সামনে একটা কিছু থাকা দরকার। ব্লাউজটা দিয়েই প্রোগ্রাম সেট করে রাখতে হয়েছিল আমাকে।' ঘড়ি দেখল মা। 'আর বেশি সময় নেই আমাদের হাতে।'

এই কথাটা শোনার ভয়ই করছিলাম। আবার হারাতে যাচ্ছি মাকে। 'কেন? যাবে কেন?'

মা যেন আমার কথা শুনতেই পেল না। 'একটা কথা মনে রাখবি, সময়-ভ্রমণ একটা ভয়ানক ব্যাপার। এতে স্পেস-টাইম কনটিনামে চিড় ধরায়। অতীতের সামান্যতম পরিবর্তনও ভয়ঙ্কর সময়-কম্পন সৃষ্টি করতে পারে...'

চোখ বন্ধ করল মা। মাথা ঝেড়ে অতীতের কোন স্মৃতি যেন ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল। 'ব্যাপারটা বড়ই জটিল, রিটু। এখানে যত কম সময় কাটাবি তুই, ততই ভাল। সে-জন্যে মাত্র পনেরো মিনিটের জন্যে তোকে এখানে নিয়ে এসেছি আমি।'

'পনেরো মিনিট! মাত্র! কিন্তু আমার তো আরও অনেকক্ষণ থাকার ইচ্ছে।'

আমার হাতে মা'র হাতের চাপ শক্ত হলো। 'চাইলেই তো আর সব হয় না। কথা বাড়াসনে। জরুরী কথা সারতে হবে। তোকে এখানে ডেকে আনার সেটাও

একটা কারণ।' একটা খাম থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করল মা। ছয় থেকে সাত বছর বয়সের পাঁচটা হাসিখুশি ছেলেমেয়ের গ্রুপ ছবি। 'নে, এগুলো দেখ। দেখে বল তো, কাউকে চিনতে পারিস কিনা।'

ছবিগুলো পরিচিত লাগল আমার। বিশেষ করে একটা মেয়ের চোখ। মাথা নেড়ে বললাম, 'চেনা চেনাই লাগছে, তবে চিনতে পারছি না।'

'এদের সবার বয়েস এখন তোর সমান হয়ে গেছে,' মা বলল। 'নাম বললে হয়তো চিনবি না। কারণ পরিচয় গোপন রাখার জন্যে আসল নামও হয়তো বদলে ফেলা হয়েছে।'

ছবিটা হাতে নিয়ে আরও ভাল করে চেহারাগুলো দেখতে লাগলাম। চিনে ফেললাম একজনকে। একটা মেয়ে, যার চোখ বেশি পরিচিত লাগছিল। মেয়েটার ছবিতে আঙুল রেখে বললাম, 'ডানা হিউগ্রি! কিন্তু ও তো কিছুদিন আগে রহস্যময় ভাবে উধাও হয়ে গেছে। ভিনগ্রহবাসীরা ধরে নিয়ে গেছে তাকে!'

'সর্বনাশ!' খবরটা শুনে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল মা। আমার চোখের দিকে তাকাতে পারল না।

'কি মা, কি হয়েছে?' জানতে চাইলাম।

'তারমানে ওরা জেনে গেছে,' মা বলল। 'এবং তারমানে তোকেও ধ্বংস করতে কিংবা ধরে নিয়ে যেতে আসবে ওরা। সাবধান, রিটা,' মা কতটা সিরিয়াস, আমাকে 'রিটা' বলে ডাকাটাই তার প্রমাণ, 'খুব সাবধান! তোকে বাঁচানোর জন্যে আমি ওখানে থাকতে পারব না। নিজেকে বাঁচাতে হবে তোর নিজেরই।'

'কি বলছ, মা? কার হাত থেকে বাঁচাব?'

'সময় নেই, যা বললাম মনে রাখিস। আরেকটা কথা, কোন কথা জানতে হলে মাদাম জিৎসুর সঙ্গে যোগাযোগ করিস। ওই মহিলা অনেক জ্ঞানী, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অনেক খবর রাখে...'

'তুমি ওই জিপসি গণক মহিলার কথা বলছ? ও তো একটা চীট...'

'গুড-বাই, রিটু!'

'মা, মা যেও না! আরেকটু দাঁড়াও!' চিৎকার করে উঠলাম।

'কি, বল।'

আমার মনে হলো, মাকে যদি এখন বলে দিই, কিভাবে মারা গেছে সে, তাহলে হয়তো আর মারা যাবে না। ভয়াবহ সেই সকালটা এড়াতে পারবে। যদি পারে, নিয়তি বদলে যাবে তার। মারা আর যাবে না।

কিন্তু কোন ভাবেই কি নিয়তি বদলাতে পারে মানুষ? অতীতকে পরিবর্তন করে ভবিতব্য এড়াতে পারে?

চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? মাকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে বললাম, 'মা, শোনো, খুব জরুরী একটা কথা বলি তোমাকে।'

'কি, মণি?'

'জুলাইয়ের পাঁচ তারিখে তোমার অফিসে আগুন লাগবে...'

তাড়াতাড়ি আমার মুখে হাত চাপা দিল মা, কথা বলতে দিল না। 'না না, আমি শুনতে চাই না,' কেঁপে উঠল তার গলা। 'আমার অনেক কাজ, রিটা; আমাকে এক

জায়গায় যেতে হবে।'

'আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও, মা,' ককিয়ে উঠলাম। 'তোমাকে ছাড়া আমার আর দিন কাটে না। তুমি যেখানেই যাও, সেটা যদি পরকালও হয়, নিয়ে যাও আমাকে।'

'না, মণি, তা হয় না। তোর এখানে অনেক কাজ বাকি। ছবির বাকি ছেলেমেয়েগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে তোকে। ডানার মত ওদেরকেও যদি ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, উদ্ধার করে আনতে হবে। যে অসামান্য ক্ষমতা রয়েছে তোর, প্রয়োজনে সেটা প্রয়োগ করবি। বুদ্ধি করে চললে ওরা যত শক্তিশালীই হোক, তোর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বেঁচে যেতে পারবি।'

'কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে চাই না। তুমি নেই, আমার দিনগুলো বড় কষ্টে কাটে...'

'কে বলল নেই?' হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরল মা। তার কাঁধে মুখ লুকালাম। 'আমার অনেক কিছু তোর মধ্যে ভরে দিয়েছি। তোর মনের ক্ষমতা প্রয়োগ করবি। নিজের ভেতরের আয়নার দিকে তাকাবি। দেখতে পাবি আমাকে।'

আমাকে ছেড়ে দিল মা। চোখ মেললাম না। তার পারফিউমের গন্ধ নাকে আসছে আমার। হয়তো শেষবারের জন্যে।

অবশেষে কেটে গেল ঘোর। চোখ মেলে দেখলাম, মা নেই ঘরে।

দরজার বাইরে পদশব্দ। ভাবলাম, মা চলে যাচ্ছে ওদিক দিয়ে। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে বেরোলাম।

মা নয়, বাবাকে আসতে দেখলাম। আমাকে উত্তেজিত দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, রিটা?'

'অ্যাঁ!...না, কিছু না!'

'গালে পানি কেন তোর? কেঁদেছিস?'

'না, কই? কাঁদিনি তো।'

'কেঁদেছিস। নিশ্চয় মা'র জন্যে মন খারাপ লাগছিল।...যাই, বলে দিই ওকে, তোর শরীর ভাল নেই, এখন আর দেখা হবে না।'

'কাকে, বাবা?'

'আরে ওই পুলিশ অফিসারটা। ডেরিয়াল। এসে বসে আছে, তোর সঙ্গে নাকি কি জরুরী কথা আছে।'

এই এক বিরক্তি! সেদিনের পর থেকে, অর্থাৎ বনের মধ্যের সেই ঘটনাটার পর থেকে মাঝে মাঝেই এসে আমার সঙ্গে দেখা করে লোকটা। ইনিয়ে-বিনিয়ে একটা কথাই জানতে চায়: কি ভাবে ছেলেগুলোকে কাবু করলাম আমি?

বাবাকে বললাম, 'যাও, শরীর খারাপই বলে দাও। এখুন দেখা করতে পারব না আমি।'

শেষ হলো রিটার ডায়েরী। মুখ তুলে তাকাল রবিন। তার পড়া শেষ হবার পরেও দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না।

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল জিনা। 'চলো।'
'কোথায়?' অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল মুসা।
'রিটাদের বাড়িতে।'
'এখন!'
'হ্যাঁ, অসুবিধে কি? ডায়েরীটাও ফেরত দেব আর কিশোরের ব্যাপারে কি করা যায়, সেটাও আলোচনা করব।'
'তারমানে,' রবিন বলল, 'তুমি বিশ্বাস করেছ রিটার কথা?'
'নিজের ডায়েরীতে কেউ মিছে কথা লেখে না। তা ছাড়া কত রকমের উদ্ভট ঘটনা ঘটে পৃথিবীতে, তার হিসেব রাখে কে? চোখের সামনে যা যা দেখতে পাই আমরা, সে-সব ছাড়াও আরও বহু কিছু আছে—ব্যাখ্যার অতীত, যেগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে পাগল হয়ে যাওয়া লাগবে।'
'বাপরে!' হেসে বলল রবিন। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'একেবারে কিশোরের মত লেকচার শুরু করে দিলে।' ডায়েরীটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'চলো। যাই।'

পনেরো

বেডরূমের দরজায় টোকা শুনে উঠে গেল রিটা। খুলে দিল।
বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। 'রিটা, অফিসার ডেরিয়াল তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। রান্নাঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি। কফি খাচ্ছে।'
'কেন?'
'কি জানি, কি একটা ফর্ম নাকি পূরণ করতে হবে বলল। ওই যে সেদিন, বনের মধ্যে গোলমালটা করল—ছেলেগুলোকে নাকি কোর্টে নিয়ে যাচ্ছে। তোর ফর্মটা কোর্টে দাখিল করতে হবে।'
ঠোঁট কামড়াল রিটা। কি যেন ভাবল। 'বেশ, যাও, আমি আসছি। কাপড়টা বদলে আসি।'
মিস্টার গোল্ডবার্গ চলে গেলেন।
সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার অপেক্ষা করল রিটা। তারপর দৌড়ে এসে ঢুকল দোতলার হলরূমে, টেলিফোনটা যেখানে। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ডায়াল করল রবিনদের বাড়ির নম্বরে।
'হালো, কে, রবিন?…ও, আমাদের বাড়িতে আসছিলে?… শোনো, আসার দরকার নেই। আপাতত বাড়িতেই থাকো। সেই লোকটা, অফিসার ডেরিয়াল এসে বসে আছে। আমাকে থানায় নিয়ে যেতে চায়। কিসের ফর্ম নাকি পূরণ করতে হবে। আমার সন্দেহ লাগছে। কথা বলে আসি। আবার ফোন করব তোমাকে।'
ডেরিয়ালের সঙ্গে কথা বলে সন্দেহজনক তেমন কিছু বুঝতে পারল না। কিন্তু

মনটা খুঁতখুঁত করতেই থাকল তার।

আবার ওপরতলায় এসে রবিনকে ফোন করল সে। বলল, 'আমি থানায় যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, যাও। সাবধানে থেকো। থানায় গিয়েই একটা ফোন কোরো। আমরা ফোনের পাশে রইলাম।'

কয়েক মিনিট পর একটা পুলিশ ক্রুজারের পেছনে বসে রওনা হলো রিটা। অস্বস্তিটা কোনমতেই তাড়াতে পারল না মন থেকে। অফিসার ডেরিয়ালই ওকে পেছনে বসতে বলেছে, নিরাপত্তার খাতিরে। কেবলমাত্র পুলিশম্যানেরাই নাকি সামনে বসে।

পেছনের সীটটা বানানো হয়েছে অপরাধীদের জন্যে। দরজার হাতল নেই, জানালার বাটন বা লক নেই। ড্রাইভারের সীট থেকে পেছনের সীটটাকে আলাদা করে রেখেছে প্লাস্টিক আর ধাতুর তৈরি গ্রিল। ছোটখাট একটা হাজতের মত লাগছে রিটার কাছে।

'কোন অসুবিধে হচ্ছে?' রিটার অস্বস্তিটা টের পেয়েই যেন জিজ্ঞেস করল ডেরিয়াল।

'না, হচ্ছে না, অফিসার।'

'শুধু ডেরিয়াল বললেই চলবে। ঘুরে যেতে অনেক রাস্তা, দেখি, শর্টকাটে যাই। অনেক সময় বাঁচবে তাতে।'

কোন্‌দিক দিয়ে যাবে না যাবে, সেটা ডেরিয়ালের ইচ্ছে। রিটা আর কি বলবে। চুপ করে রইল।

মোড় নিয়ে সরু একটা নির্জন, পরিত্যক্ত রাস্তায় নামল ডেরিয়াল।

অস্বস্তিটা বাড়ল রিটার। দুই ধারে কোথাও চষা খেত, কোথাও বন। বাড়িঘরের চিহ্ন নেই।

পনেরো মিনিট পর যখন বন আরও ঘন হতে দেখল, আর জিজ্ঞেস না করে পারল না সে, 'এদিক দিয়ে কি সত্যি বেরোনো যাবে?'

জবাব পেল না। হঠাৎ করে চুপ হয়ে গেছে ডেরিয়াল।

আবার জিজ্ঞেস করল রিটা।

ভারী গলায় জবাব দিল ডেরিয়াল, 'বেরোনো যাবে, কিন্তু আমি থানায় যাব না। সন্দেহটা ঠিকই করেছ তুমি। পালাতে আর পারবে না, ডেলটা গার্ল। ধরা পড়ে গেছ।'

'ডেলটা গার্ল!'

'কেন, জানো না নাকি? তুমিও ডেলটাদের একজন। অসামান্য ক্ষমতাধর। কিন্তু আজ আর কিছু করতে পারবে না তুমি।'

'ডেলটাদের একজন মানে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'না পারার তো কথা নয়। মাত্র সেদিনই তো কিশোর পাশার নকল একজন ডেলটা এসেছিল। ওর নাম এজেন্ট নিমো। মিশন সাকসেসফুল না করেই চলে

যেতে হয়েছে তাকে।'

'এখন আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

'গেলেই দেখতে পাবে।'

চুপ হয়ে গেল ডেরিয়াল।

বিপদটা আঁচ করতে পারল রিটা। ডানা হিউগ্রি আর কিশোর পাশার মত তাকেও হয়তো উধাও করে দেয়া হবে।

পালানোর কথা চিন্তা করতে লাগল সে। জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়া যাবে? উঁহু! এটা মিনি-হাজত। এখান থেকে বেরোনো অসম্ভব। সেজন্যেই এ রকম জায়গায় তাকে বসতে দিয়েছে ডেরিয়াল।

হঠাৎ মনে পড়ল ওদের ভলভো গাড়িটার কথা। সে-রাতে রাস্তার মাঝে রহস্যময়ভাবে ডেড হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ল, মা'র কথা। মা বলেছে: যে অসামান্য ক্ষমতা রয়েছে তোর, প্রয়োজনে সেটা প্রয়োগ করবি। কি ক্ষমতার কথা বলেছে মা, বুঝে গেছে রিটা। ব্যাটারি থেকে শক্তি শুষে নিয়ে নিজের শরীরে স্টোর করতে পারে সে। পরে সেটা ব্যবহার করে শত্রুকে নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে। ভলভোর ব্যাটারি থেকে নিজের অজান্তে শক্তি শুষে নিয়ে সেদিন চার্জশূন্য করে দিয়েছিল বলেই থেমে গিয়েছিল ইঞ্জিন। সেই শক্তি পরে ব্যবহার করেছে ছেলেগুলোর ওপর।

হাসি ফুটল রিটার মুখে।

চোখ বন্ধ করে ধ্যানের জগতে চলে গেল সে। আশ্চর্য এক শক্তি অনুভব করতে শুরু করল শরীরে। রেডিওটা বাজতে বাজতে হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। মাঝপথে অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। মরে গেল যেন গাড়িটা।

ঝটকা দিয়ে ফিরে তাকাল ডেরিয়াল। গর্জে উঠল, 'জলদি ইঞ্জিন চালু করো!'

চিৎকার শুনে চমকে চোখ মেলল রিটা।

'তাড়াতাড়ি করো!' আবার চিৎকার করে উঠল ডেরিয়াল। 'ব্যাটারির চার্জ ফিরিয়ে দাও!'

'রাগটা কমান,' শান্তকণ্ঠে বলল রিটা। 'কপালের রগ ছিঁড়ে যাবে তো।'

'তোমাকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাবার আদেশ আছে আমার ওপর,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ডেরিয়াল, 'কিন্তু জখম না করার কথা বলেনি।'

জানালার বাইরে তাকাল রিটা। এখনও বুনো অঞ্চলে রয়েছে। আর কোন গাড়ির চিহ্নও চোখে পড়ল না।

'আপনাকে তিনটে শব্দ বলার আছে আমার।'

'কি?'

'ধরতে পারলে ধরুন!' বলেই গাড়ির দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রিটা। ছরছর করে গোলাপী রঙের স্ফুলিঙ্গ-বৃষ্টি শুরু হলো যেন। দপ করে জ্বলে উঠল কমলা আগুন। প্রচণ্ড শক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হলো দরজাটা। কজা, লক সব ভেঙে খুলে গিয়ে ছিটকে পড়ল বাইরে। এক লাফে গাড়ি থেকে বেরিয়ে বনের দিকে দৌড় দিল সে।

পিছু নিল ডেরিয়াল।

রিটার চেয়ে শক্তিশালী সে। দ্রুতগতি। মাথা না খাটালে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে, বুঝে গেল রিটা। প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে কি করা যায় বুদ্ধি বের করার চেষ্টা করল।

সামনে তারের বেড়া দেখা গেল। সাইনবোর্ডে লেখা:

খাবার পানি সরবরাহ কেন্দ্র।
সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

ওই বেড়া ডিঙানো কোন ব্যাপারই না তার জন্যে।

সাইনবোর্ডের নির্দেশ অমান্য করল সে। কাঠবিড়ালীর মত বেড়া বেয়ে উঠে লাফিয়ে নামল অন্যপাশে। ফিরে তাকিয়ে দেখল, চোখ দুটো আর স্বাভাবিক মানুষের মত নেই ডেরিয়ালের। অদ্ভুত আকৃতি হয়ে গেছে। গোল গোল চাকতি। হীরার দ্যুতির মত রাগের আগুন বেরোচ্ছে যেন ও দুটো থেকে। 'দৌড়ে কোন লাভ হবে না, মেয়ে। পালাতে পারবে না আমার হাত থেকে।'

জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রিটা। দৌড়ে ঢুকে পড়ল আবার বনের মধ্যে।

ডেরিয়ালের বেড়া ডিঙানোর শব্দ কানে এল। ছুটে আসছে দ্রুত।

নাহ্, পালানো সম্ভব না। পাল্টা আঘাত হানার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল রিটা। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। সামান্য ঘুরে কিছুটা সরে গিয়ে ফিরে চলল বেড়ার দিকে।

আবার বেড়া ডিঙিয়ে অন্যপাশে চলে এল। না দৌড়ে আর, দাঁড়িয়ে রইল।

দেখতে পেল ডেরিয়ালকে। ছুটে এসে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো ডেরিয়াল। থামল না। এ পাশে আসার জন্যে তরতর করে বেড়া বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

গাড়ির ব্যাটারি থেকে সংগ্রহ করা অবশিষ্ট শক্তিটুকু বেড়ার ওপর প্রয়োগ করল রিটা। মুহূর্তে গোলাপী আলোর ফুলঝুরি শুরু হলো। সেই সঙ্গে আঁকাবাঁকা রঙিন আলোর সরু সরু বিদ্যুতের সাপ নাচানাচি শুরু করল বেড়ার গায়ে। হাই ভোল্টেজের ভয়ানক বৈদ্যুতিক শক হজম করতে পারল না ডেরিয়াল। চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। যে ভাবে পড়ল, সে-ভাবেই রইল, নড়ল না আর।

মরল কি বাঁচল, দেখারও সময় নেই রিটার। শত্রুকে কাবু করে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। ছুটতে শুরু করল।

ষোলো

মলে এসে যখন পৌছল সে, সারা গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। দাঁড়াতে পারছে না। পরিশ্রমে থরথর করে কাঁপছে শরীর। খাবার দরকার? না, খিদে তো বোধ করছে না। বুঝল, কি জিনিস দরকার তার।

ব্যাটারি! রিচার্জ করতে হবে দেহটাকে। ব্যাটারিশূন্য হয়ে গেছে একেবারে।

পথে একটা বুদ থেকে রবিনদের মলে আসতে ফোন করে দিয়েছে। এখানে লোকের ভিড়ে ডেরিয়াল বা তার দলের লোকেরা এসে আঘাত হানতে সাহস করবে না। নিরাপদে কথা বলা যাবে।

টলতে টলতে মলে ঢোকার গেটের দিকে এগোল রিটা। দিগন্তরেখার দিকে ঝুঁকে পড়েছে সূর্য। পার্কিং লটে বিরাট লম্বা ছায়া পড়েছে রিটার।

বিকেল শেষ হয়ে আসছে। কতক্ষণ ধরে দৌড়েছে সে? অনন্তকাল!

একটা খেলনা ঘোড়ার ওপর বসে কাঁদছে তিন বছরের একটা বাচ্চা। সারা মুখ আইসক্রীমে মাখামাখি। আরও আইসক্রীমের জন্যে কাঁদছে বোধহয়। ওকে ঘোড়ায় বসিয়ে নিশ্চয় কোন কিছু কিনতে গেছে মা। রিটার দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল বাচ্চাটা।

কারণটা বুঝতে সময় লাগল না রিটার। খাড়া খাড়া হয়ে গেছে চুল। কাপড় ছেঁড়া। কাদায় মাখামাখি সারা গা। হরর ছবির ভূত। নিশ্চয় বাচ্চাটা তাকে ভূতই মনে করেছে।

কেয়ার করল না রিটা। মলের দিকে এগোল। কিন্তু পা তুলতে পারছে না আর। খেলনা ঘোড়ার কয়েন বক্সটায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

মুহূর্তে শক্তি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল শরীরে। ছলকে উঠল রক্তস্রোত। চুলগুলো স্বাভাবিক হয়ে এল।

কয়েকবার জোরে জোরে ঝাঁকি দিয়ে আচমকা থেমে গেল ঘোড়াটা। ডেড। মেশিনের ব্যাটারি আবার রিচার্জ না করলে আর চলবে না।

ঘোড়া থামতেই আবার চিৎকার করে কেঁদে উঠল বাচ্চাটা।

হাঁটতে শুরু করল রিটা। মলে ঢুকল।

দেখল, ওর আগেই এসে বসে আছে রবিন। ভিডিও গেমের দোকানের সামনে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে। রিটার দিকে তাকিয়ে বড় বড় হয়ে গেল চোখ। হাঁ করে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর এগিয়ে এল।

'জিনা আর মুসা কোথায়?' জানতে চাইল রিটা।

'দোকানের ভেতর।'

'গেম খেলছে?'

'না। সবাই একসঙ্গে থাকিনি, নিরাপত্তার জন্যে। কে কোন্‌খান থেকে নজর রেখেছে বলা মুশকিল। বুঝতে পারছি শত্রুর চোখ রয়েছে আমাদের ওপর। তাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছি। আমি তোমার অপেক্ষাই করছিলাম।' রিটার ওপর নজর বোলাল রবিন। 'কিন্তু তোমার অবস্থা তো শোচনীয়। কি হয়েছিল?'

'আগে বাথরুম থেকে আসি। লোকে কিভাবে তাকাচ্ছে দেখছ না? কাদামাটিগুলো ধুয়ে আসি।'

'দাঁড়াও, আমরাও আসি তোমার সঙ্গে।' জিনা আর মুসাকে ডাকতে ভেতরে ঢুকে গেল রবিন।

ওরা তিনজন বেরিয়ে আসার পর পরই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মিটমিট করে উঠল মলের সমস্ত আলো।

'খাইছে!' অবাক হয়ে রিটার দিকে তাকাল মুসা। 'তুমি করছ?'

নীরবে মাথা নাড়ল রিটা। সে-ও অবাক।

একসঙ্গে নিভে গেল সমস্ত আলো। যে ভাবে নিভল, তাতে মনে হয় মেইন লাইন জ্বলে গেছে। কোথায় খারাপ হয়েছে, সেটা বের করে, সারিয়ে-সুরিয়ে আবার আলো জ্বালতে প্রচুর সময় লাগবে। বাইরে সূর্যও ডুবতে বসেছে। গোলাপী-কমলা আলোর খেলা ম্লান করে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে নীলচে-ধূসর গোধূলি।

বাতি নিভে যাওয়ায় মল জুড়ে শুরু হলো চিৎকার চেঁচামেচি। লুটপাটের ভয়ে তাড়াতাড়ি শাটার নামিয়ে দিতে শুরু করল দোকানদাররা। করিডরে ছোটাছুটি করছে লোকে। হলে উদ্বিগ্ন ক্রেতার ভিড়। কি হয়েছে জানতে চাইছে সবাই।

কালো পোশাক পরা চারজন গার্ডের আবির্ভাব ঘটল এ সময়। কালো সানগ্লাস, কালো শার্ট, কালো প্যান্ট, কালো বেজবল ক্যাপ নিয়ে অন্ধকারে চমৎকার ভাবে মিশে যাওয়ার সুযোগ হলো ওদের। তবে হাতে টর্চ আছে চারজনেরই।

'এদিক দিয়ে আসুন, প্লীজ,' টর্চের আলো নেড়ে উত্তেজিত ক্রেতাদের পথ দেখাল একজন। 'ঘাবড়াবেন না। আসুন।'

দ্রুত সাড়া দিল লোকে। পথ দেখিয়ে সবাইকে গেটের দিকে নিয়ে চলল গার্ডেরা।

সারির পেছনে রইল চার গোয়েন্দা।

'গার্ডগুলোকে সন্দেহ হচ্ছে আমার,' নিচুস্বরে রবিন বলল। 'দেখছ, কেমন টর্চের আলো ফেলছে সবার মুখে? কাউকে খুঁজছে ওরা।'

'আমাদের!' রিটার কণ্ঠে শঙ্কা।

'তাই তো!' জিনা বলল। 'দেখো, চোখ থেকে সানগ্লাস খুলছে না ওরা। তারমানে চোখ দেখলেই চমকে যাবে লোকে। বনের মধ্যে সে-রাতে নকল কিশোরের চোখ কি রকম ছিল মনে আছে?'

'ঠিক,' মুসাও একমত। 'অন্ধকারে সানগ্লাস পরে আছে কেন নাহলে?'

'তারমানে ওদের চোখে পড়া চলবে না,' উদ্বিগ্ন শোনাল রবিনের কণ্ঠ। 'পালাতে হবে। সরে যেতে হবে কোনদিকে।'

'কিন্তু ভেতরে তো অন্ধকার,' রিটা বলল। 'দেখতে পাব না কিছু। তা ছাড়া আরও গার্ড থাকতে পারে। ব্লাউজ চুরি করেছি ভেবে আমাকে সেদিন যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কেউ থাকলে মহা মুশকিলে ফেলে দেবে।'

'তাহলে!' চিন্তায় পড়ে গেল রবিন। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে সামনের লোকগুলো। ছোট হয়ে আসছে সারি।

হঠাৎ একজন গার্ড আলো ফেলল ওদের দিকে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল আলোটা। সঙ্গীদের কিছু বলল বোধহয় লোকটা। একসঙ্গে চারটে আলো এসে পড়ল ওদের মুখে।

আর কোন উপায় নেই। চিৎকার করে উঠল রবিন, 'পালাও!'

সতেরো

গেট ছেড়ে দৌড় দিল চার গার্ড। তাড়া করল ওদের।

ছুটতে ছুটতে রিটা বলল, 'ছোটাছুটি করে লাভ হবে না। পালাতে পারব না। ওদের ক্ষমতা অসীম। আমরা আছি, জেনে গেছে। না ধরে আর ছাড়বে না।'

মলের মেইন গেট লাগানোর শব্দ শোনা গেল।

'ওই যে,' মুসা বলল, 'গেট লাগিয়ে দিচ্ছে। খাঁচার মধ্যে আটকে ফেলে ধরবে আমাদের।'

'ছুটতে থাকো,' রবিন বলল। 'থেমো না।'

'কিন্তু এ ভাবে দৌড়ে কিছু হবে না তো,' জিনা বলল। 'একটা বুদ্ধি বের করা দরকার আমাদের।'

সামনে আরেকটা বড় দরজা। ওটার অন্যপাশে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল রিটা। খেলনা ঘোড়াটার ব্যাটারি থেকে যেটুকু শক্তি সঞ্চয় করেছিল, সেটা ব্যবহার করে লাগিয়ে দিল ইলেকট্রনিক দরজাটা। গার্ড আর ওদের মাঝে ভারী একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলো।

বন্ধুদের দিকে ফিরে তাকাল রিটা। 'এটা দিয়েও ঠেকানো যাবে না ওদের। দু'মিনিট। বড় জোর তিন।'

মাঝেসাঝেই মলে কেনাকাটা করতে আসে জিনা। তার দিকে তাকাল রবিন। 'জিনা, পেছন দিকে বেরোনোর দরজা-টরজা আছে, বলতে পারবে?'

'এ তলায়? উঁহু,' জবাব দিল জিনা। 'এসকেলেটরটা রয়েছে মেইন গেটের দিকে।'

'না, ওদিকে যাওয়া যাবে না। রিস্কি হয়ে যাবে।'

রিটাও বহুবার এসেছে এই মলে। জিনার চেয়ে কম চেনে না। বরং বেশিই চেনে। কোথায় কোথায় কি আছে মনে করার চেষ্টা করল। 'পেছন দিয়ে বেরোনোর পথ নেই। তবে একটা বিকল্প আছে!' প্রায় চিৎকার করে উঠল সে, 'শূ এলিভেটর!'

'কি?' বুঝতে পারল না মুসা।

'অনেকটা ডাম্বওয়েইটারের মত কাজ করে ওটা,' জবাব দিল রিটা। 'জুতো বয়ে আনে।'

'শুধু কিছু জুতো বওয়ানোর জন্যে একটা এলিভেটর বানিয়ে ফেলেছে ওরা?' অবাক না হয়ে পারল না রবিন।

'হ্যাঁ, বানিয়েছে। তবে কিছু জুতো নয়, অনেক,' রিটা বলল। 'যে জুতোটা তোমার পছন্দ, জানাবে সেলসম্যানকে, মিনিটের মধ্যে ওই মিনিএলিভেটরে করে এসে হাজির হবে তোমার জুতো।'

'ভাল বুদ্ধি করেছে,' প্রশংসা করল রবিন।

'জুতো কিনতে আসিনি আমরা,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'কাজেই এলিভেটরের প্রশংসা না করে ওটা দিয়ে কাজটা কি হবে সেটা জানতে পারলে ভাল হয়।'

রিটার কথা বুঝে গেছে রবিন। তুড়ি বাজিয়ে বলল, 'ঠিক! রিটা, ঠিক! তোমার বুদ্ধি আছে!'

'নাহ্, নেতৃত্ব পেলেই এরা সবাই কিশোর পাশা হয়ে যায়!' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'দুর্বোধ্য কথাবার্তা! মূল্যবান সময় নষ্ট না করে বলেই ফেলো না ছাই কি বলতে চাও।'

'বুঝতে পারছ না? জুতো বয়ে আনে, তারমানে ওটার সার্বক্ষণিক অবস্থান হলো স্টোরের মধ্যে। যে তলায় স্টোর আছে সেই তলায় রাখা হয় ওটা।' রিটাকে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'রিটা, আমাদের ভার বইতে পারবে ওটা?'

জিনাও দেখেছে এলিভেটরটা। 'জুতো বয়ে আনার জিনিস, মানুষের ভার বইতে পারবে না। তবে ওটা খুলে নিয়ে শ্যাফট্টা ব্যবহার করতে পারব আমরা।'

'জলদি এসো!' ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল রবিন।

এলিভেটরটা খুঁজে পাওয়া কঠিন হলো না। ছোট বাক্সমত কারটা খোলার চেষ্টা করে দেখল সে। খুলল না। অত সহজ হবে না খোলা।

সবাই মিলে চেষ্টা করতে লাগল। খুলল অবশেষে।

খুলে ওটা নামিয়ে রাখল ওরা, এই সময় বিকট শব্দ হলো পেছনে। কোন কিছু ভেঙে পড়েছে। ফুটখানেক পুরু, পনেরো ফুট উঁচু ভারী দরজাটাই হবে।

'গেল লাখ লাখ ডলারের দরজাটা,' মুসা বলল।

'ভাঙল কি করে!' জিনা অবাক।

'ওরা মানুষ নয়, আগেই তো বলেছি,' রিটা বলল। 'ওদের ক্ষমতা অসীম।'

সামনের এলিভেটরের শ্যাফট্টার দিকে তাকাল সবাই। চৌকোনা লম্বা একটা গর্ত। চওড়া খুব বেশি না। তবে একবারে একজন করে ঢুকতে পারবে।

গার্ডদের ছুটন্ত পায়ের শব্দ কানে এল।

'আগে আমি যাচ্ছি,' মুসা বলল। 'দেখি, নিরাপদ কিনা।'

কে আগে যাবে সেটা নিয়ে তর্ক করার সময় নেই। 'নিচে নেমে আমাদের জন্যে অপেক্ষা কোরো না,' রবিন বলল। 'দৌড়াতে শুরু করবে। ভাগাভাগি হয়ে একেকজন একেকদিকে চলে যাওয়াটাই ভাল। সবাইকে একসঙ্গে ধরা পড়তে হবে না।'

আইডিয়াটা খারাপ লাগল না রিটার। কিন্তু অন্ধকারে একা হয়ে যাওয়ার কথাটা ভাবতেও ভাল লাগল না।

শ্যাফট্ বেয়ে নেমে চলেছে রিটা। দুই হাতের তালু দুই দেয়ালে এমন শক্ত করে চেপে রেখেছে যাতে পড়ে না যায়। কোন কারণে হাতের চাপ ঢিল হলেই বিশ ফুট নিচের কংক্রীটের মেঝেতে গিয়ে পড়তে হবে।

স্টোররুমে নেমে এল সে। সবাই ওর আগে নেমে গেছে। ওপরে প্রচণ্ড শব্দ।

ভাঙচুর করছে গার্ডেরা। শ্যাফট্‌টা ওদের নজরে পড়তে দেরি হবে না। পড়লেই বুঝে যাবে সব।

'রবিন!' অন্ধকারে ফিসফিস করে ডাকল রিটা। 'মুসা! জিনা!'

জবাব নেই। পরিকল্পনা অনুযায়ী যার যার পথে চলে গেছে ওরা নিশ্চয়।

ভারী দম নিল রিটা। কম্পিত নিঃশ্বাস।

হাতড়াতে হাতড়াতে এগোতে শুরু করল সে। হাতে লাগছে জুতোর সারি। অবশেষে একটা ধাতব স্পর্শ পেল। দরজা। আস্তে করে ঠেলে খুলে বেরিয়ে এল।

নিচতলাটা ওপরের চেয়ে অনেক বেশি অন্ধকার মনে হয়। তবে এতবার এসেছে এ জায়গায়, মুখস্থ হয়ে গেছে, অনুমানের ওপর নির্ভর করে এগোতে পারল তাই।

কিন্তু যাবে কোথায়?

যেখানেই যাক, সে জানে, লোকগুলো তাকে খুঁজে বের করে ফেলবে। ভেতরে খুঁজছে চারজন। মেইন গেটের কাছেও নিশ্চয় আরও অনেকে অপেক্ষা করছে।

বনবন করে ভাবনার চাকাগুলো ঘুরতে আরম্ভ করল তার।

কি করা যায়? টাইম-জাম্প করে লাভ হবে? তাহলে আর ওরা ধরতে পারবে না তাকে। তেরো বছর যদি পিছিয়ে চলে যায়, কি করে খুঁজে পাবে! কিন্তু সময়-ভ্রমণে অভ্যস্ত নয় এখনও সে। কিভাবে নিজে নিজে যাতায়াত করতে হয়, জানে না।

ব্লাউজটা দরকার। যেটাতে প্রোগ্রামিং করা আছে ১৯৮৭ সাল। কিন্তু নেই ওটা সঙ্গে। ডেরিয়ালের সঙ্গে বেরোনোর সময় গায়ে দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। আচ্ছা, মনোনিবেশ করার জন্যে একমাত্র ব্লাউজটাই কি দরকার? বিকল্প কিছুতে কাজ হবে না? চকিতে মাথায় এসে গেল ছবিটার কথা। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

করিডরের শেষ মাথায় অন্ধকারের মধ্যে আবছা ধূসর একটা চৌকোনা বস্তুর মত চোখে পড়ল মেইন গেটটা। জুতো খুলে ফেলে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এগোল সে। কাছে এসে দেখল, তার অনুমান ঠিক। গেটের কাছে পাহারা দিচ্ছে একজন গার্ড।

লোকটা তাকে দেখতে পাওয়ার আগেই ইনফরমেশন কিসকের কাছে সরে গেল রিটা। হাত বাড়িয়ে খুলে আনল দেয়ালে টানানো নিজের ছবিটা। গার্ড-ইন-চার্জকে তখন পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে ইচ্ছে হলো তার, ছবিটা ওখানে টানানোর জন্যে।

এত অন্ধকার এখানে, ছবি দেখাটা খুব কঠিন। কাউন্টারের কাছ থেকে সরে এল, যেখানে কাঁচের দরজার ভেতর দিয়ে অতি সামান্য আবছা আলো চুইয়ে প্রবেশ করছে। দেখতে পেল ছবিটা। ব্লাউজের ওপর কেন্দ্রীভূত করল দৃষ্টি। কল্পনায় দেখতে শুরু করল ব্লাউজ পরা অবস্থায় তার নিজের ছবি। অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো। দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ঘাড়ের রোম।

তারমানে কাজ হচ্ছে!

মাথার ওপরে গুঞ্জন শুরু হলো।

মুখ তুলে তাকে দেখে ফেলল গার্ড।

ওয়াকি-টকিতে মুখ লাগিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, 'টার্গেট এখানে!'

দৌড়াতে শুরু করল লোকটা। বিশ গজ দূরে রয়েছে। দ্রুত চলে আসছে কাছে।

সময়ের দরজা সময়মত খুলবে কিনা বুঝতে পারছে না রিটা। ছবিটা শক্ত করে চেপে ধরল। গুঞ্জন বাড়ছে।

কঠিন কয়েকটা আঙুল চেপে ধরল তার কাঁধ। কথা বলে উঠল যান্ত্রিক একটা কণ্ঠ, 'এবার যাবে কোথায়!'

ফিরে তাকাল রিটা। কালো সানগ্লাস খুলে ফেলেছে গার্ড। টর্চের আলোর আভায় ভয়ঙ্কর দুটো চোখ দেখতে পেল রিটা।

'ছাড়ুন আমাকে,' নিজের শান্ত কণ্ঠ শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে। 'কিছু প্রশ্ন আছে আপনার কাছে।'

'কি প্রশ্ন?' ছাড়ল না গার্ড।

সময় নিতে চাইছে রিটা। গুঞ্জনটা যখন শুরু হয়েছে, 'জাম্প' করতে পারবে বুঝতে পারছে।

দপ করে চোখের সামনে থেকে নিভে গেল টর্চের আলো।

পরক্ষণে উজ্জ্বল দিবালোকে বেরিয়ে এল সে।

চারপাশে তাকাতে লাগল রিটা। দল বেঁধে কেনাকাটা করতে চলেছে ক্রেতারা। কি ঘটেছে, জানা আছে তার। তারপরেও অবাক না হয়ে পারল না। আবার অতীতে চলে এসেছে। আপাতত ভিনগ্রহবাসী গার্ডদের হাত থেকে বাঁচলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার তাকে ফিরে যেতে হবে বর্তমানে। বাইরে যখন বেরোতেই পেরেছে, বাঁচার একটা উপায় করে তবেই আবার ঢুকবে ভবিষ্যতের অন্ধকার মলে।

একটা ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের দোকানে ঢুকল সে। মুখ তুলে তাকাল সেলসক্লার্ক। ডিসেম্বরের শীতে ওর গায়ে গরমের পোশাক দেখে অবাক হয়ে গেল। মিষ্টি করে হেসে তার অবাক ভাবটা কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রিটা। বলল, 'হালো। আমি কিছু একটা কিনতে চাইছি, বাবার জন্মদিনে উপহার দেয়ার জন্যে।'

কয়েক সেকেন্ড পরেই দোকান থেকে বেরিয়ে এল রিটা, পেছনে হাঁ হয়ে থাকা সেলস-ক্লার্ককে রেখে। হতবাক হয়ে দোকানের জিনিসপত্রগুলো দেখছে সে। বুঝতেই পারছে না, হঠাৎ কি এমন ঘটে গেল যে বন্ধ হয়ে গেল চালু করে রাখা রেডিও-টেলিভিশন-অডিও সেটগুলো!

করিডর ধরে দ্রুত এগুলো রিটা। শক্তিতে টইটম্বুর হয়ে আছে দেহ। প্রজাপতির মত পাখা মেলে উড়ে চলেছে যেন।

খেলনার দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আরেকটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। থমকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল র‍্যাকে রাখা আলট্রা সোকার ওয়াটার গানটার

দিকে। খানিক দূরে একটা বাচ্চা ছেলে আরেকটা খেলনা হাতে নিয়ে দেখছে—একটা বড়, চকচকে সবুজ ডাবল-ব্যারেল খেলনা রাইফেল।

এগিয়ে গেল সে। হাত বাড়াল ছেলেটার দিকে, 'দেবে একটু? দেখব।'

এক মুহূর্ত রিটার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হাত সরিয়ে নিল ছেলেটা।

'দাও, খোকা,' জোর দিয়ে বলল রিটা। 'তোমার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ওটা আমার।'

কাঁধে টোকা পড়তে ফিরে তাকাল রিটা। দোকানের ম্যানেজার। বেজির মত মুখ। সরু কুৎসিত গোঁফ। মুখটাকে গোমড়া করে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'জন্মদিনে দেবে?'

'না।'

সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। ছাতের আলোগুলোর দিকে তাকাল সে। এখনও উজ্জ্বল। মিটমিট শুরু হওয়ার আগেই যা করার করে ফেলতে হবে।

'হুঁ।...যাকগে, কি জন্যে কিনবে সেটা তোমার ব্যাপার।...পছন্দ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

মাথা ঝাঁকাল রিটা। র‍্যাক থেকে তুলে নিল আলট্রা সোকারটা। একটা শপিং ব্যাগ চেয়ে নিয়ে আরও কতগুলো খেলনা র‍্যাক থেকে নামিয়ে দ্রুত ভরে ফেলল।

'এগুলোর দাম...' বলতে গেল ম্যানেজার।

দরজার দিকে রওনা হয়ে গেছে রিটা। ভেতরে থাকলে আটকা পড়তে হবে।

চিৎকার করে উঠল ম্যানেজার, 'আরে আরে, কোথায় যাচ্ছ...'

কথা শেষ হলো না। মিটমিট করতে লাগল বাতিগুলো। সেই সঙ্গে গুঞ্জন।

দপ করে নিভে গেল বাতি।

আঠারো

ভিন্ন আরেক নাটক চলছে তখন কাচু-পিকচুতে। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল কিশোর। শরীরের প্রতিটি পেশিতে ব্যথা। কাপড় খুলতেও ইচ্ছে করল না তার।

এত ক্লান্তির পরেও ঘুম এল না। যতবার চোখ বোজে, গলাকাটা গরুটার চেহারা ফুটে ওঠে তার কল্পনায়। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল গরুর চেহারা, তার জায়গা দখল করল সিসির মুখ।

সিসিকে কেন সন্দেহ করছে ওরা? জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে ভাল আচরণ করে সে, ওগুলোও তাকে পছন্দ করে, তার কথায় সাড়া দেয়। এর মধ্যে অশুভ ক্ষমতাটা কোথায় দেখতে পেল লোকে?

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে উঠে বসল বিছানায়। ঘোড়ার খুরের শব্দ।

গায়ের ওপর থেকে চাদরটা টান মেরে সরিয়ে ফেলে বিছানা থেকে নেমে

পড়ল। বুকের মধ্যে কাঁপুনিটা বেড়ে গেছে। জানালার কাছে এসে বাইরে উঁকি দিল।

চোখে পড়ল দলটাকে। দম আটকে আসতে চাইল।

সামনের আঙিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। কতজন? পাঁচ…দশ…বারো? নাকি আরও বেশি?

রাতের অন্ধকারে ছায়ার মত নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

কি চায়? শেষ পর্যন্ত হুমকিটা কার্যকর করতেই কি চলে এল?

সিসিকে খুন করতে?

পেছনের কাঠের মেঝেতে শব্দ হতে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে।

ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে হেনরি আর সিসি। তাকিয়ে আছে ওর দিকে। আতঙ্কিত।

'ওরা এসে গেছে, তাই না?' কাঁপা ফিসফিসে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সিসি।

জোরে একবার মাথা ঝাঁকি দিল কিশোর, 'হ্যাঁ।'

পাশে এসে দাঁড়াল দুই ভাই-বোন। একসঙ্গে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকাল সবাই। ঘোড়াগুলোর ঘোরাঘুরি বন্ধ হয়েছে। লম্বা সারি দিয়ে দাঁড় করিয়েছে তাদের সওয়ারীরা।

'আজ আরও অনেকগুলো গরুকে মেরে ফেলতে হয়েছে,' চিৎকার করে বলল একজন।

'এর জন্যে দায়ী হচ্ছে ওই ডাইনী মেয়েটা,' জন ফ্রেঞ্চ বলল। ওর স্লিঙে ঝোলানো হাতটাকে লাগছে সাদা তেকোনা নিশানের মত। 'ওকে নামিয়ে দাও। বাকি দুজনকে কিছু করব না।'

কিশোরের গা ঘেঁষে এল সিসি। ওর গায়ের কাঁপুনি টের পাচ্ছে কিশোর। কাঁধে একটা হাত রেখে সান্ত্বনা দিল। তার অন্য হাতটা আঁকড়ে ধরল আতঙ্কিত হেনরি।

'আপনাদের গরুগুলো মারা যাচ্ছে, এ জন্যে সত্যি দুঃখিত আমরা,' জবাব দিল কিশোর। 'এতে সিসির কোন হাত নেই। দয়া করে চলে যান আপনারা। আমাদের একা থাকতে দিন।'

'সব শয়তানির মূলে ওই ডাইনী মেয়েটা,' মার্ক ফ্রেঞ্চ বলল। 'নেকড়ে আর সাপ নিয়ে কি করেছে, সব শুনেছি আমরা। আমাদের সবারই গরু মরছে, তোমাদের একটাও মরে না কেন?…তুমি বাইরের লোক, কিশোর পাশা, তোমার সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। মেয়েটাকে পাঠিয়ে দাও এখানে, তোমার কিছু করব না আমরা।'

'জলদি বের করে দাও শয়তানীটাকে!' বলল আরেকজন।

'জীবনেও না!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'আমার প্রাণ থাকতে নয়!'

'বেশ, মরো তাহলে,' জন ফ্রেঞ্চ বলল। 'তোমাকে একটা সুযোগ দিয়েছিলাম, কিশোর পাশা, নাওনি…'

একটা মশাল জ্বলে উঠল। পটাপট জ্বলে উঠল আরও কয়েকটা। মশাল হাতে ঘোড়ায় চেপে বাড়ির চারপাশে চক্কর দিতে শুরু করল লোকগুলো।

'লাগিয়ে দাও! দেখছ কি?' মার্কের চিৎকার শোনা গেল। 'পুড়িয়ে মারো

ডাইনীটাকে!'

বাড়ির দিকে একজনকে মশাল ছুঁড়ে দিতে দেখল কিশোর।

ওপরের বারান্দার একপ্রান্তে এসে পড়ল মশালটা। কিশোরের জানালার সামনে নেচে উঠল আগুন।

চিৎকার করে উঠল সিসি।

'জলদি!' বলল কিশোর, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের!' জানালার কাছ থেকে ঠেলা দিয়ে সিসিকে সরিয়ে দিল সে।

হেনরিকে পিঠে তুলে নিয়ে সিসির পিছু পিছু এসে ঢুকল হলওয়েতে। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙছে। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে মশাল ছুঁড়ে মারছে লোকগুলো। গুলির শব্দ হলো।

সিঁড়ি দিয়ে ধোঁয়া উঠে আসছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। থমকে দাঁড়াল সিসি। পেছন থেকে তাকে ঠেলা দিল কিশোর। 'থামলে কেন? আর কোন পথ নেই!'

এলোমেলো পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল সিসি। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল তাকে কিশোর। কিশোরের গলা পেঁচিয়ে ধরে পিঠের ওপর ঝুলছে হেনরি।

বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে কিশোরের ফুসফুস। ধোঁয়া ঢুকে গেছে। চোখ জ্বালা করছে। কালো ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে কাশতে কাশতে নেমে চলল সিঁড়ি বেয়ে। এলোমেলো পা ফেলছে সে-ও। হেনরির হাতটা ঢিল করার চেষ্টা করল। বরং শক্ত হলো সেটা আরও। ধোঁয়া থেকে বাঁচার জন্যে মুখ চেপে ধরল কিশোরের কাঁধে। সমানে কাশছে।

মরতেই হবে বোধহয় আজ, ভাবছে কিশোর। কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র সে নয়।

পৌঁছে গেল নিচতলায়। ঘুরছে, পাক খাচ্ছে আগুনের শিখা; ধারাল নখর বের করে থাবা মারছে যেন কাঠের দেয়ালের গায়ে। মাথার মধ্যে দপদপ করছে কিশোরের। ভয়াবহ উত্তাপ ওকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।

বাঁচতে হলে এখনই বেরিয়ে যেতে হবে।

ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে গলা বাড়িয়ে তাকাতে লাগল সে। কোন্‌দিকে যাবে? চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে আগুন।

'সামনের দিকে যাও!' চিৎকার করে উঠল আচমকা। 'সামনের ঘরটা দিয়ে বেরোতে হবে!'

পায়ের কাছে লকলক করছে আগুনের শিখা। পরোয়া করল না। সোজা দৌড় দিল হলওয়ে ধরে সামনের বারান্দার দিকে। দেয়াল থেকে লাফ দিয়ে দিয়ে সামনে এসে পড়ছে আগুন। ওগুলোর চারপাশে নাচানাচি করে বাঁচার চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। মুখের চামড়া ঝলসে যাচ্ছে। ঝাঁঝাল ধোঁয়া চোখ পোড়াচ্ছে।

ছেলে-মেয়ে দুটোকে বের করে নিয়ে যেতেই হবে!—বার বার নিজেকে বলছে সে। ওদের বাঁচাতেই হবে।

দাঁড়িয়ে গেছে সিসি। তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। দিনের আলোর মত

আলোকিত হয়ে গেছে ঘর। গাল বেয়ে পানি নামছে। কেঁদে ফেলল, 'বেরোনোর জায়গা নেই, কিশোরভাই!'

বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাচ্ছে কিশোরের হৃৎপিণ্ড। পাগলের মত চারপাশে তাকাচ্ছে সে। পিছিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে আগুনের চাদর। সামনের দরজায় লাফালাফি করছে ছোট ছোট শিখা। মড়মড় শব্দ হলো। ছাতের কড়িকাঠ ভাঙতে শুরু করেছে।

বাড়িটাকে আগুনের পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলতে আর বেশি দেরি নেই। যে কোন মুহূর্তে তাসের ঘরের মত ধসে পড়বে। চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করবে ওদের। তারপর পুড়িয়ে ছাই করবে।

হেনরিকে পিঠ থেকে বুকের ওপর নিয়ে এল কিশোর। সিসিকে বলল, 'শক্ত করে আমার শার্ট চেপে ধরো। ওই দরজাটা দিয়ে বেরোব।'

দুই হাতে কিশোরের শার্ট খামচে ধরল সিসি। ফোঁপানি থামাতে পারছে না কোনমতে। হেনরিকে চেপে ধরে দরজার দিকে দৌড় দিল কিশোর। কাঁধের একপাশ দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল পুড়তে থাকা কাঠে।

ছুটে গেল কব্জা।

বাইরে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল। হেনরিকে ছাড়েনি। ওকে চত্বরে নামিয়ে দিয়ে ফিরে তাকাল সিসির অবস্থা দেখার জন্যে। শেষ মুহূর্তে শার্ট থেকে সিসির হাত ছুটে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এসেছে সে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও পারল না কিশোর। বিপদ এখনও কাটেনি।

ঘোড়ার পিঠে চেপে ওদের তিনজনকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল লোকগুলো।

'ভেতরে থাকলেই ভাল করতে!' ভয়ঙ্কর গলায় বলল মার্ক, 'তাড়াতাড়ি মরে যেতে। এখন মরবে ধীরে।'

'কাপুরুষের দল!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'আমরা কোন অন্যায় করিনি। সিসি নির্দোষ!'

ঘিরে ফেলা চক্রটা ছোট করে আনতে লাগল লোকগুলো। ঘোড়ার গরম নিঃশ্বাস পড়তে লাগল কিশোরের মুখে। কাঁধে কাঁধ, গলায় গলা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে ওগুলো। ঘামের গন্ধ পাচ্ছে কিশোর। পশুগুলোর নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ এসে লাগছে নাকে।

পালানোর পথ নেই! ঘোড়ার পায়ের ফাঁক দিয়ে দৌড়াতে গেলে মাটিতে ফেলে খুর দিয়ে মাড়িয়ে তিলে তিলে শেষ করা হবে ওদের।

খসখসে কি যেন গলায় লাগতে ফিরে তাকাল কিশোর। চামড়ার ফালির একটা ফাঁস তার গলায় নামিয়ে দিচ্ছে মার্ক ফ্রেঞ্চ।

'একটা জানোয়ারও আর অবশিষ্ট নেই তোমাদের,' বলল সে। 'এবার তোমাদের পালা। সব ক'টাকে ফাঁসিতে ঝোলাব। ইবলিসের ঝাড়-বংশ সব সাফ করে ফেলব।'

উনিশ

খেলনার দোকানটার দিকে ঘুরে তাকাল রিটা। শাটার নামানো। নীরব। অন্ধকার। রেগে যাওয়া ম্যানেজার নেই। বাচ্চা ছেলেটা নেই। কোন লোকই নেই।

অন্ধকার করিডরে চোখ বোলাল সে। রবিন কোথায়? মুসা? জিনা?

কয়েক মিনিট পরেই জানতে পারল, তার আশঙ্কাই ঠিক। বেরোতে পারেনি ওরা। সামনের অন্ধকারে, খাবারের দোকানটাতে হুটোপুটির শব্দ। বোধহয় লড়াই করছে।

দৌড় দিল রিটা। সামনের একটা ফোয়ারা থেকে পানি ভর্তি করে নিল সোকার গানটার ম্যাগাজিনে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, কাজ শেষ হয়ে গেলেই যাদের জিনিস আবার তাদের ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। জিনিস দিতে না পারলে, দামটা দিয়ে আসবে।

হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করল পুরো মল। ভূমিকম্প শুরু হলো নাকি? না, ভূমিকম্প নয়, বড় কোন জেট প্লেন যাচ্ছে। তারপর মনে হলো, উঁহু, জেট প্লেনও নয়। অন্য কিছু।

কি শুরু হলো এই মলে!

থামল না সে। খাবারের দোকানের কাছে এসে দেখল চেয়ার-টেবিল সব উল্টে পড়ে ছত্রখান হয়ে আছে। কোন্‌দিকে তাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রবিনদের, বোঝা যায়।

না, বেরোতে ওরা পারেনি। শেষ মাথায় নিয়ে গিয়ে কোণঠাসা করে ফেলেছে গার্ডেরা। পেছন দিকে হাত মুচড়ে ধরে দেয়ালের গায়ে চেপে ধরেছে মুসা, রবিন আর জিনাকে। নড়তেও কষ্ট হচ্ছে ওদের। লড়াই শেষ। সবার মুখ ওপর দিকে।

কি দেখছে ওরা?

রিটাও স্কাইলাইটের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

হাঁ হয়ে গেল মুখ।

একটা ইউ এফ ও। ফুড কোর্টের ওপর নেমে আসছে।

ভয়ানক শব্দে ভেঙে পড়ল স্কাইলাইটের কাঁচ। ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল যানটা। বিল্ডিঙের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওটার ভীষণ শক্তিশালী জেট ইঞ্জিন থেকে বেরোনো বাষ্প আর আগুনের হলকায় পুড়ে, গলে পানি হয়ে যেতে লাগল প্লাস্টিক। আগুন ধরে গেল চায়না-বান স্ট্যান্ডটায়। বৃষ্টির মত চতুর্দিকে ছিটকে পড়তে লাগল কাঁচ, ধাতু আর কাঠের টুকরো। ভয়াবহ গরম হলকা এসে লাগল রিটার মুখে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যি সত্যি একটা ইউ এফ ও নেমে এসেছে মলের ভেতরে।

ছয়টা ধাতব পা বেরিয়ে এল ওটার পেটের নিচ থেকে। পোড়া মেঝেতে ছড়িয়ে

বসল। খুলে গেল হ্যাচওয়ে। তীব্র সাদা আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। প্রায় নিঃশব্দে নেমে এল মইয়ের মত ধাতব সিঁড়ি।

ইউ এফ ও থেকে নামল একজন ভিনগ্রহবাসী। অবিকল মানুষের মতই দেখতে। তবে খুব লম্বা। চোখ দুটো কেবল অস্বাভাবিক। লাল অঙ্গারের মত জ্বলছে ধক্‌ধক্‌ করে। রূপালী রঙের পোশাক পরনে। হাতে ছোট একটা জিনিস। কোন ধরনের অস্ত্র।

কথা বলে উঠল লোকটা। ভারী কণ্ঠস্বর। একেবারে যান্ত্রিক। সিনেমার রোবটেরা ওরকম করে কথা বলে। মুসা, রবিন আর জিনাকে মহাকাশযানে তোলার হুকুম দিল।

ওদেরকে কি প্রয়োজন এই ভিনগ্রবাসীগুলোর? কি করবে নিয়ে গিয়ে?

প্রায় কোন রকম বাধাই দিতে পারল না তিন গোয়েন্দা। মহাকাশযানে তোলা হলো ওদের।

অন্ধকার ছায়ার দিকে তাকিয়ে বলল নেতা গোছের লোকটা, 'রিটা গোল্ডবার্গ, বেরিয়ে এসো। নইলে তোমার বন্ধুদের খুন করা হবে।'

মোটা থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে রিটা। ওখান থেকেই জবাব দিল, 'কি করে বুঝব, আমি বেরোলে আমাকে সহ খুন করবেন না?'

ঝটকা দিয়ে তার দিকে ঘুরে গেল নেতার মুখ।

চট করে সরে গেল রিটা। ময়লা ফেলার একটা ধাতব ড্রামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

'আমাদের ওপর বসের নির্দেশ আছে, তোমাদের জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে হবে,' জবাব দিল নেতা, 'যদি সম্ভব হয়। বেশি জ্বালাতন করলে শেষ করে দিতে বলা হয়েছে। এখন ভেবে দেখো, কোনটা তোমার পছন্দ। লাশগুলো নিয়ে গেলেও চলবে। তিনটে তাজা লাশ পেলে কম খুশি হবেন না বস্‌।'

ঢোক গিলল রিটা। চিন্তা করল এক মুহূর্ত। তারপর দুই হাত মাথার ওপর তুলে বেরিয়ে এল। 'এই যে, আমি এসেছি।'

'বুদ্ধিমতী মেয়ে!' একঘেয়ে কণ্ঠস্বর লোকটার। পুরোই রোবটের মত আচরণ। 'খুব চালাক। বন্ধুদের জীবন বাঁচালে।'

লোকটার চোখে চোখে তাকাল রিটা। ওর চেয়ে অনেক লম্বা। পারবে ওর সঙ্গে?

পারতেই হবে!

চোখ বুজল রিটা। ভয় নেই মনে।

শক্তি কেন্দ্রীভূত করছে।

বেজে উঠল সাইরেন। পুলিশের গাড়ির। ময়লা ফেলার পিপাটার কাছ থেকে বেরিয়ে এসে ফুড কোর্টটাকে ঘিরে ফেলল ডজনখানেক গাড়ি। তীব্র গতিতে ছোটাছুটি শুরু করল মেঝেতে। প্রচুর বিদ্যুৎ হজম করেছে রিটা। সেই শক্তি প্রয়োগ করে চালাচ্ছে খেলনাগুলোকে।

পায়ের কাছে রকেট-গতিতে ছোটাছুটি করতে থাকা খেলনাগুলো রিটার প্রতি

মনোযোগ নষ্ট করে দিল নেতার। এই সুযোগে পিপার আড়ালে চলে এল আবার রিটা। রাইফেলটা হাতে নিয়ে বেরোল।

'খবরদার!' গর্জে উঠল সে। নেতার দিকে তাক করে ধরেছে খেলনা অস্ত্র। 'নড়লেই গুলি করব!'

দ্বিধায় পড়ে গেল নেতা। অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে আছে। 'খেলনা। ওটা তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।'

ট্রিগার টেনে দিল রিটা।

পিচকারির মত তীব্র গতিতে ছুটে গেল রূপালী পানির সরু একটা ধারা। ভিজিয়ে দিল নেতাকে। মুখের ভেতর থেকে থু-থু করে পানি ফেলল নেতা। 'বোকা মেয়ে! তুমি ভেবেছ সিনেমার রোবটগুলোর মত পানি দিয়ে আমাকে গলিয়ে ফেলবে!'

গা বেয়ে পানি পড়ে লোকটার পায়ের কাছে জমা হলো। পায়ের কাছ থেকে পানির একটা রেখা মেঝে বেয়ে রিটার কাছে এসে থেমেছে।

'গলাব কেন?' জবাব দিল রিটা। 'কাবাব বানাব।'

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। পানির রেখার মাথাটার ওপর দৃষ্টি স্থির করল। ছিটকে বেরোতে শুরু করল গোলাপী স্ফুলিঙ্গ। পানি বেয়ে ভয়ঙ্কর ভোল্টের বিদ্যুৎ তীব্র গতিতে ধেয়ে গেল লোকটার দিকে। চোখের পলকে গিলে ফেলল তাকে গোলাপী বিদ্যুতের জাল। মাটিতে পড়ে জবাই-করা ছাগলের মত ছটফট শুরু করল সে। তারপর নিথর হয়ে গেল।

চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে এল চার গার্ড। মই বেয়ে দ্রুত নেমে এল নিচে। নেতার দেহটা দেখল।

'কে এগোবে এরপর?' হুমকি দিয়ে বলল রিটা।

এক মুহূর্ত থমকাল ওরা। তারপর এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করল ওকে।

ওদেরকে কাছে আসার সুযোগ দিল রিটা। হাসি হাসি কণ্ঠে বলল, 'জো-জো খেলবে?' লাফ দিয়ে তার হাতে বেরিয়ে এল একটা লম্বা ধাতব স্প্রিঙের মত খেলনা। মাথার ওপর ঘোরাতে শুরু করল। গোলাপী আলোর চক্র তৈরি করল স্প্রিংটা।

ভয়াবহ বিদ্যুতের ছোঁয়ায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল চার ভিনগ্রহবাসী গার্ড।

একটা সেকেন্ডও আর দেরি করল না রিটা। পাঁচ-পাঁচটা দানবকে ধরাশায়ী করে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে তার। ওরা জ্ঞান ফিরে পাওয়ার আগেই মই বেয়ে উঠে এসে ঢুকে পড়ল ইউ এফ ও-র ভিতরে।

মহাকাশযানের ভেতরটা আহামরি কিছু নয়। আধুনিক যাত্রীবাহী জেট প্লেনের পাইলটের কেবিনে যে ধরনের কন্ট্রোল প্যানেল থাকে প্রায় সেই রকম। কেবল ছাতটা অন্য রকম। ঝলমলে সাদা আলোকিত গম্বুজের মত।

হ্যাচটা লাগিয়ে দিল সে। দেয়ালে সুইচ রয়েছে। নিচে লেখা: হ্যাচ। সুইচটা

অন করে দিতেই লেগে গেল হ্যাচ।

ঘুরে তাকাতেই একধারে মুসা, রবিন আর জিনাকে দেখতে পেল সে। দাঁড়িয়ে আছে ওরা। কিংবা বলা যায় দাঁড়ানো অবস্থায় আটকে রাখা হয়েছে ওদের। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত লম্বা, পরিষ্কার হালকা হলুদ রঙের প্লাস্টিকের মোটা টিউব খাড়া করে রাখা। তাতে ভরে রাখা হয়েছে তিনজনকে। কেমন আচ্ছন্নের মত হয়ে আছে ওরা। ল্যাবরেটরিতে মৃত প্রাণীকে যেমন করে তরল ওষুধের মধ্যে ভরে রাখা হয়, অনেকটা তেমনিভাবে। তফাৎ কেবল, ওরা জ্যান্ত।

কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকাল রিটা। আশ্চর্য আরেকটা ক্ষমতা অনুভব করছে নিজের মধ্যে। প্যানেলটা যেন তার বহু পরিচিত। কোন সুইচটা টিপলে কি হবে, প্রায় সবই বুঝতে পারছে।

একটা চারকোনা বোতাম টিপে দিতেই নিঃশব্দে ওপরে উঠে গেল টিউবগুলো। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে মেঝের ওপর দিয়ে তার দিকে হেঁটে এল মুসা, রবিন আর জিনা।

'অনেক ধন্যবাদ, রিটা,' জিনা বলল। 'আমি জানতাম, তুমি আসবে।'

'ভেন্নাগুলোর কি অবস্থা?' মুসা জানতে চাইল। 'বিপদ কি কাটল আমাদের?'

'এখনও কাটেনি,' জবাব দিল রিটা।

'তুমি ঢুকলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'লড়াই করেছি ওদের সঙ্গে। ওরা হেরেছে।'

'খাইছে!' চোখ বড় হয়ে গেল মুসার। 'একা ওই পাঁচ-পাঁচটা দৈত্যকে কাবু করে ফেললে!'

'নইলে কি আর আমাকে এখানে ঢুকতে দিত? তোমাদের মত ধরে নিয়ে আসত। এতক্ষণে আমিও বন্দি হয়ে যেতাম কোন একটা টিউবে।'

'কথা পরেও বলা যাবে,' তাগাদা দিল জিনা। 'এখান থেকে পালানো দরকার।'

গর্তটার কাছে এসে দাঁড়াল আবার সবাই। সুইচটা অন করে দিল রিটা। সরে গেল হ্যাচের ভারী ঢাকনাটা।

নিচে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ানক রেগে যাওয়া পাঁচজন ভিনগ্রহবাসী।

হ্যাচ লাগানোর জন্যে তাড়াতাড়ি আবার সুইচ টিপল রিটা।

'আমি তো ভেবেছিলাম শয়তানগুলোকে মেরেই ফেলেছ বুঝি,' ঢাকনাটা খাপে খাপে বসে যেতে বলল মুসা।

'তারমানে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল,' রিটা বলল।

'বেশ। কোনভাবে তাহলে ওদের মনে করিয়ে দাও, শয়তানি করতে এলে আবার বেহুঁশ করা হবে।'

ধুড়ুম ধুড়ুম করে বাড়ি পড়তে শুরু করল হঠাৎ মহাকাশযানের পেটে। হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারছে মনে হচ্ছে। ধাতুর পাত ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করছে ভিনগ্রহবাসীরা। সে-রাতে গাড়ির মধ্যে বসে থাকার কথা মনে পড়ল রিটার। গুণ্ডা ছেলেগুলো এসে গাড়িটাকে এ রকম করে পিটাচ্ছিল। তবে সেবার জন্মদিনের কেক মুখে মাখিয়ে দিয়ে পালানোর সুযোগ পেয়েছিল, এবার আর তত সহজ হবে না।

'এই স্পেস শিপটা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভাল চেনে ওরা,' রবিন বলল। 'আমরা কিছু না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে ঠিকই ঢুকে পড়বে।'

'কি করব?' রিটার প্রশ্ন।

'এটা নিয়ে উড়ে চলে গেলেই হয়,' সহজ জবাব দিয়ে দিল মুসা।

'তা তো বটেই,' পছন্দ হলো না জিনার। 'উড়ে চলে যাক ভিনগ্রহে। শত্রুর দেশে। তারপর ফিরব কি করে?'

'যেতে পারলে ফিরতেও পারব,' কন্ট্রোল প্যানেলে বসে পড়ল মুসা। 'যা হবার হবে, সে পরে দেখা যাবে। আপাতত তো পালাই।'

'তা বটে,' মুসার সঙ্গে একমত হলো রবিন। 'বাঁচতে হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ফুড কোর্টটা থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। কোনমতে যদি ঢুকতে পারে ওরা, দ্বিতীয়বার আর ঠেকাতে পারব না। স্রেফ খুন করে ফেলবে।'

'বেশ,' কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে মনোযোগ দিল মুসা, 'চালানো শুরু করলাম আমি।'

বিশ

রবিন, জিনা আর রিটা মহাকাশযানের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ধরার মত যে যা পেল, শক্ত করে চেপে ধরল। কন্ট্রোল প্যানেলের সামনের চেয়ারে সীট বেল্ট লাগানো আছে, সেটা পরে ফেলল মুসা।

সমানে পিটিয়ে চলেছে ভিনগ্রহবাসীরা। বিকট শব্দ। সহ্য করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে মহাকাশযানের ভেতরেই তৈরি হচ্ছে শব্দটা। সময় বেশি নেই, বুঝতে পারছে গোয়েন্দারা। শীঘ্রি মারাত্মক জখম করে ফেলবে মহাকাশযানের শরীরে, হয়তো আর মাটি ছেড়ে যাওয়াই সম্ভব হবে না তখন। ওড়ার সময় যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হবে, দুর্বল জায়গা থাকলে ধ্বংস হয়ে যাবে মহাকাশযান।

'সবাই রেডি?' ভয়ানক শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'রওনা হলাম!'

কন্ট্রোলে হাত রাখল সে। কীবোর্ড নেই, স্টিয়ারিং হুইল নেই, শুধু দুটো ধাতব হাতের মত জিনিস। হাতের ছাপ নকল করে বানানো হয়েছে যেন। ওগুলোর ওপর হাত দুটো রাখল মুসা। বসে গেল সুন্দরমত। সঙ্গে সঙ্গে মনিটরে ফুটে উঠতে লাগল নানা রকম নম্বর আর লেখা।

আরও বেড়েছে বাড়ি মারার শব্দ। মরিয়া হয়ে উঠেছে ভিনগ্রহবাসীরা।

'রেডি তো?' জিজ্ঞেস করল মুসা। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে তিনজনকেই দেখল একনজর। আবার ফিরল কন্ট্রোলের দিকে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সাহস জোগানোর চেষ্টা করছে নিজেকে। একটা অচেনা যানকে চালাতে ভয় যে পাচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। চোখের দৃষ্টি

মনিটরের ওপর স্থির। হাতের আঙুলগুলো অস্থির ভঙ্গিতে ওঠানামা করছে।

মহাকাশযানের গভীর থেকে চাপা গুমগুম শব্দ শোনা গেল। ক্রমেই বাড়তে থাকল শব্দটা। ভারী হচ্ছে। জোরাল হচ্ছে গুঞ্জন। বাইরের হাতুড়ি পেটানো থেমে গেল আচমকা। রাগে চিৎকার শুরু করেছে ভিনগ্রহবাসীরা। গোয়েন্দারা কি করতে যাচ্ছে, বুঝে গেছে।

গুঞ্জনটা তীক্ষ্ণ হতে হতে যেন আর্তনাদে রূপ নিল। দুলে উঠল মহাকাশযান। পরক্ষণে ঝাঁকি দিয়ে তীরবেগে ওপরে উঠতে শুরু করল।

কোন কিছু ধরেই দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না তিনজনের পক্ষে। প্রচণ্ড গতিবেগের কারণে পড়ে গেল মেঝেতে। সেঁটে গেল যেন মেঝের সঙ্গে। নিজের ওজন দুই টন মনে হতে থাকল রিটার।

মাথার ওপরে গম্বুজের মত ছাতটা স্বচ্ছ হয়ে গেছে। কাঁচের বড় গামলার ভেতর দিয়ে তাকালে যেমন লাগে, তেমন লাগছে রাতের আকাশটাকে। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন, জিনা আর রিটা। কন্ট্রোল প্যানেলে ব্যস্ত থাকায় মুসা তাকাতে পারছে না। মলের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছাতের গর্ত দিয়ে তীব্রগতিতে বেরিয়ে এল মহাকাশযান। সোজা উঠে গেল মেঘের দিকে। জেট ইঞ্জিন থেকে বেরোনো উজ্জ্বল রঙিন ধোঁয়া প্রতিফলিত হয়ে মেঘটাকেও রঙিন করে দিল। জলযান চলার সময় যেমন পেছনে দীর্ঘ একটা ঢেউয়ের রেখা সৃষ্টি করে রেখে যায়, তেমনি করে মহাকাশযানটা রেখে যাচ্ছে ধোঁয়ার লেজ। উজ্জ্বল লেজটা মুছে না যাওয়া পর্যন্ত রঙিন হয়ে থাকছে মেঘ, অনেকটা ধূমকেতুর পুচ্ছের মত।

মেঘ থেকে বেরিয়ে এল মহাকাশযান। আরও ওপরে উঠল। আকাশটা এখন শুধুই কালো। গম্বুজের ভেতর দিয়ে তারাগুলোকে বড় বড় লাগছে, তবে কিছুটা ঘোলাটে।

রবিন ভাবছে, পৃথিবীর সীমানা কি ছাড়িয়ে এল? মহাকাশটাকে দেখতে কি এমনই লাগে? বিমান থেকে যে রকম দেখা যায়, তার সঙ্গে এখনকার আকাশের তেমন কোন তফাৎ খুঁজে পেল না সে। হতে পারে পৃথিবীর সীমানা এখনও কাটায়ইনি মহাকাশযান।

কখন কাটাবে? চলছে যে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

ওপরে ওঠার সময় নিচের দিকে যেভাবে টানছিল মাধ্যাকর্ষণ, যে কারণে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল ওরা, সেই টানটা আর এখন নেই। উঠে দাঁড়াল রবিন। দেখাদেখি জিনা আর রিটাও উঠল।

মুসার কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। 'চালাতে তাহলে পারছ।'

রিটা আর জিনাও এগিয়ে এল। ঘিরে দাঁড়াল মুসাকে।

'চালানো-টালানোর ব্যাপারে তুমি তো একটা জিনিয়াস,' প্রশংসা করল রিটা। 'প্লেন চালাতে পারো জানতাম। কিন্তু ভাবতেই পারিনি স্পেস শিপও চালাতে পারবে। কি করে বুঝলে?'

'খুব সহজ,' হাসতে হাসতে জবাব দিল মুসা। কেবিনের আলোয় ঝকঝক করতে থাকল তার সাদা দাঁত। 'রহস্যটা ফাঁস করে দিলেই বুঝবে, একটা বাচ্চা

ছেলেও চালাতে পারবে এটা। আমি শুধু "অটো পাইলট" চালু করে দিয়েছি।'

'তারমানে নিজে নিজে চলছে এখন এটা?' ভুরু কুঁচকে ফেলল জিনা। 'কোর্স যেখানে সেট করে রাখা আছে সেখানেই গিয়ে নামবে?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'তাই তো করার কথা। পৃথিবীতে মানুষের তৈরি প্লেন, জাহাজ তা-ই করে।'

'কাজটা কি ঠিক হবে?' রিটার প্রশ্ন।

'না হওয়ারই বা কি হলো?' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা। 'প্রাণে তো বাঁচলাম।'

'কই আর বাঁচলাম,' রবিন বলল। 'মলের লোকগুলোর হাত থেকে বেঁচেছি। কিন্তু গিয়ে তো নামতে হবে ওদেরই দেশে। অর্থাৎ, শত্রুর দেশে। কোন গ্রহে যাচ্ছি, ওখানকার কোন কিছুই না জেনে হুট করে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'তা তো হবেই না,' হাসিটা মুছে গেল মুসার। 'কিন্তু আর কি করতে পারি!'

'কিছু একটা উপায় বের করা দরকার, বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই,' চিন্তিত স্বরে বলল রবিন।

'করো, করো, যা করার জলদি করো। ভাবাভাবিগুলো আমার কর্ম নয়। আমাকে যে ভাবে চালাতে বলবে, আমি সেভাবেই চালাব।'

'তারচেয়ে এক কাজ করি বরং,' রিটা বলল। 'যে ভাবে চলছে এটা চলতে থাকুক। দেখি না কোনখানে গিয়ে থামে। জায়গাটা দেখে নেয়া দরকার। তারপর আবার অটো পাইলট চালু করে সহজেই পৃথিবীতে ফিরে আসা যাবে।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'বুদ্ধিটা মন্দ না।'

'হ্যাঁ, সুযোগ যখন একটা পাওয়াই গেল,' জিনার কণ্ঠেও উত্তেজনা, 'গ্রহটা দেখে এলে মন্দ কি?'

সীটে হেলান দিল মুসা, 'আমি রাজি।'

একুশ

কিশোরের গলা থেকে ফাঁসটা খুলে নিল মার্ক। খিকখিক করে হাসল। 'না, অত সহজে মারব না। এত তাড়াতাড়ি মেরে ফেললে মজাটা আর রইল কোথায়...'

হঠাৎ চালার একটা জ্বলন্ত অংশ খসে পড়ল মাটিতে।

ঘাবড়ে গিয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াগুলো। চোখ উল্টে দিয়েছে। ওগুলোর কালো চোখে আতঙ্ক।

হেনরির হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে সরিয়ে নিল কিশোর।

ঘোড়াগুলোকে সামলাতে পারল না সওয়ারিরা। ভয়ে চিৎকার করতে করতে অন্ধকারে ছোটাছুটি শুরু করল ওদের বাহনগুলো। জিন আঁকড়ে বসে রইল কেউ, কেউ বা ঝুলে রইল একপাশে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে অস্থির।

মাটিতে পড়তে পড়তে জিনে আটকে গেল জন ফ্রেঞ্চের ভাঙা হাতের স্লিং। পা পড়ে গেছে মাটিতে। হিঁচড়ে নিয়ে তাকে দৌড় দিল ঘোড়াটা। এতদিকে পথ খোলা থাকতে ওটা ছুটল জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে। একই রকম অদ্ভুত কাণ্ড করল মার্কের ঘোড়াটাও। সওয়ারি নিয়ে সোজা জ্বলন্ত বাড়ির দিকে দৌড়। ঠিক এই সময় চালার আরও একটা বিরাট অংশ ভেঙে পড়ল ওদের ওপর। আগুন গ্রাস করে নিল ওদের। মাথা ঝাড়া দিতে দিতে একটা ঘোড়াকে কোনমতে আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল কিশোর। কেশরে আগুন ধরে গেছে। মার্ক ফ্রেঞ্চ নেই তার পিঠে।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে দু'চারজন সাহসী যা ছিল দলে, তারাও আর দেরি করল না। হয় ঘোড়ার পিঠে বসে, নয়তো লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে দৌড়ে পালাতে লাগল দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে।

চোখের পলকে খালি হয়ে গেল জায়গাটা। আগুনের হলুদ আলোয় আলোকিত।

'গর্দভের দল!' বিড়বিড় করে বলল সিসি। 'ঘোড়া যে আগুনকে ভয় পায়, ভুলেই গিয়েছিল ওরা!'

'হ্যাঁ,' বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'আগুনের এত কাছে আসা উচিত হয়নি ওদের।'

জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে চোখ তুলে তাকাল সে। জন বা মার্ক বেরিয়ে আসছে কিনা দেখছে। ওদের ঘোড়া দুটো পালিয়েছে। একটার পিঠেও সওয়ারি ছিল না। চালার নিচে চাপা পড়েছে দুই ভাই। জ্ঞান হারিয়ে থাকলে সব সাহায্যের বাইরে চলে গেছে ওরা এতক্ষণে। গায়ে কাঁটা দিল তার। সিসি আর হেনরির কাঁধে দুই হাত রেখে যেন সাহস সঞ্চয় করতে চাইল।

আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমেই উঠে যাচ্ছে ওপরে। লোভী দানবের মত পুরো বাড়িটাকে গিলে নিয়েছে।

'পালানো দরকার!' সংবিৎ ফিরে পেল যেন কিশোর হঠাৎ। 'লোকগুলো শীঘ্রি ফিরে আসবে, মার্ক আর জনের কি হয়েছে দেখতে। দুই ভাই বেঁচে থাকলেও আমাদের ছাড়বে না, আর মরে গেলে তো খেপা কুকুর হয়ে যাবে ওদের পরিবারের লোকজন।'

কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে কোথায় যাবে সে? এই এলাকায় কে সাহায্য করবে তাকে? খাবার নেই। পকেটে একটা পয়সা নেই। রাইফেলটাও গেছে ঘরের সঙ্গে সঙ্গে।

'কোথায় যাব?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল সিসি।

বড় করে দম নিল কিশোর। 'বনের মধ্যে কাটিয়ে দেব আজকের রাতটা। কাল একটা বুদ্ধি বের করব।'

তার প্যান্ট খামচে ধরল হেনরি। চোখ নামাল কিশোর। হেনরির ছোট্ট তুলতুলে গালে ছাই আর কালি লেগে আছে। সবুজ চোখ দুটো অনেক বড় লাগছে এখন, টলটলে, যেন গভীর দীঘির পানি। ঝুলে পড়েছে ছোট ছোট কাঁধ।

'এখানে থাকব না আমরা,' ভীষণ ক্লান্ত লাগছে কিশোরের, কিন্তু তবু দুই হাত

বাড়িয়ে কোলে তুলে নিল হেনরিকে। 'থাকলে মরতে হবে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বনের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। 'সিসি, আমার শার্ট ধরে রাখো। কোন কারণেই আলাদা হবে না।'

বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা। চাঁদের আলোকে আড়াল করে রেখেছে গাছপালার ঘন ডাল-পাতা।

পেছন থেকে শার্ট ধরে হাঁটতে গিয়ে বার বার কিশোরের পায়ে হোঁচট খাচ্ছে সিসি, গায়ের ওপর এসে পড়ছে। কাঁধে বসা হেনরি দুই পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে গলা। এ অবস্থায় হাঁটা খুব কঠিন হয়ে উঠেছে কিশোরের জন্যে।

আরেক বার হোঁচট খেয়ে সিসি বলল, 'সরি, কিশোরভাই, দেখতে পাচ্ছি না।'

'হয়েছে,' জবাব দিল কিশোর, 'হাঁটার গতি এবার কমানো যায়।'

'বনের মধ্যে এত অন্ধকার, বাপরে!' গলা কেঁপে উঠল সিসির।

গাছের ডাল থেকে শূন্যে ঝাঁপ দিল একটা পেঁচা। মুহূর্ত পরেই আক্রান্ত ইঁদুরের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শোনা গেল। শিকার নিয়ে অন্য ডালে গিয়ে বসল আবার পেঁচাটা।

এরপর ভারী নীরবতা।

অন্ধকারে চোখ মেলে দেখার চেষ্টা করছে কিশোর। তার মনে হচ্ছে বনের সব হিংস্র জানোয়ারের চোখ এখন ওদের দিকে। যে কোন মুহূর্তে ইঁদুরটার যা গতিক হয়েছে, ওদেরও তা-ই হবে।

হেনরিকে এক কাঁধের ওপর বসাল সে। আগে বাড়তে গিয়ে পায়ের নিচে মট করে ভাঙল শুকনো ডাল।

সড়সড় করে দৌড়ে চলে গেল কি যেন। আরেকটা ইঁদুর হবে, ভাবল সে। কিংবা অন্য কোন ছোট প্রাণী। কাঠবিড়ালীও হতে পারে। নিরীহ–নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করল। ক্ষতি করবে না।

'হাঁটতে থাকো,' সিসিকে বলল সে।

বনের মধ্যে বাতাস ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা। যতই গভীরে ঢুকছে ঠাণ্ডা বাড়ছে। গাছের ডাল-পাতা এড়িয়ে চলার উপায় নেই। গায়ের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে। পায়ের নিচে ঝরা পাতার পুরু কার্পেট।

কানের কাছে হেনরির নিঃশ্বাস আর সিসির হাঁপানোর শব্দ ছাড়াও আরেকটা শব্দ কানে এল কিশোরের।

দাঁড়িয়ে গেল।

'কি হলো?' জানতে চাইল সিসি।

'চুপ!' চাপা গলায় বলল সে। 'শব্দ!'

'কিসের? কিসের শব্দ?'

'কথা বোলো না। দম বন্ধ করে রাখো। হেনরি, তুমিও।'

কান পেতে রইল কিশোর। কিছু শুনল না। অবশেষে ছেড়ে দিল দমটা।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে শুনল সিসিকে।

আবার হাঁটতে লাগল ওরা। কিছুদূর এগিয়ে কিশোর বলল, 'সামনে মনে হচ্ছে

থামার জায়গা পাব।'

ছোট একটা জায়গায় গাছপালা সামান্য পাতলা। চাঁদের আলো এসে পড়ছে মাটিতে। বেশি না, তবে দেখার জন্যে যথেষ্ট। বড় একটা গাছ কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মস্ত খোঁড়ল।

'ওতে ঢুকে লুকিয়ে থাকা যাবে,' খোঁড়লটা দেখিয়ে বলল কিশোর। হেনরিকে নামিয়ে দিল কাঁধ থেকে।

হামাগুড়ি দিয়ে তাতে ঢুকে গেল হেনরি।

তারপর ঢুকল সিসি। 'উঁহু, ভয়ানক গন্ধ!'

'ও কিছু না। পচা কাঠের গন্ধ,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল কিশোর। 'গন্ধ তোমার কোন ক্ষতি করবে না।'

সে নিজেও ঢুকে পড়ল খোঁড়লে। পা লম্বা করা যাচ্ছে না। মুড়ে নিয়ে এল বুকের কাছে। সারা শরীরে অকল্পনীয় ব্যথা।

ফার্মে আর ফিরে যেতে পারবে না রাতটা কোনমতে নিরাপদে কাটাতে পারলে আগামীকাল ভেবে দেখবে কি করা যায়।

পাতায় পাতায় কাঁপন তুলে বয়ে গেল এক ঝলক বাতাস। কি যেন গোপন কথা বলে গেল পরস্পরকে ফিসফিস কানাকানি করে। ডালে ডালে ঘষা খেয়ে বিচিত্র শব্দ সৃষ্টি করল।

জেগে বসে পাহারা দেয়া দরকার। কিন্তু কোনমতেই চোখ খোলা রাখতে পারছে না আর। দশ মণ ভারী হয়ে আসছে যেন চোখের পাতা।

আরেকটু আরাম করে বসার জন্যে নড়েচড়ে সোজা করল মাথাটা, নজর পড়ল সামনে গাছের বেড়ার মাঝে অন্ধকার ছায়ার দিকে।

জ্বলন্ত দুটো হলুদ চোখ সরাসরি তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বাইশ

আতঙ্কিত চিৎকারটা মুখ থেকে বেরোতে দিল না কিশোর। ঢোক গিলে নামিয়ে দিল বহু কষ্টে।

কিসের চোখ? নেকড়ে? ভালুক? পাহাড়ী সিংহ? ভয়ঙ্কর সব হিংস্র জন্তুর চেহারা খেলে যেতে লাগল মনের পর্দায়। সঙ্গে বন্দুক নেই। আত্মরক্ষার উপায় নেই।

আমাকে দেখেনি! নাকি দেখেছে? ভাবনাগুলো এলোমেলো আঘাত হানতে লাগল যেন মগজের মধ্যে। আমরা যে আছি খোঁড়লের মধ্যে, সেটাই জানে না!

বুকের মধ্যে ধুড়ুস ধুড়ুস করছে হৃৎপিণ্ডটা। গলা শুকিয়ে কাঠ। পিছিয়ে আসতে গেল।

'আউ!' চিৎকার করে উঠল সিসি। 'কি করছ?'

'চুপ!' নিচু স্বরে সাবধান করল কিশোর। 'বললাম না তখন, একটা শব্দ

শুনেছি!...পিছে পিছে চলে এসেছে ওটা। আমাদের খুঁজছে এখন।'

'কোথায়?' এগোতে গিয়ে জায়গা না পেয়ে কিশোরের পায়ের ওপর চেপে বসল সিসি।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর বেরিয়ে যেতে শুরু করল।

ধরার জন্যে থাবা মারল কিশোর। স্কার্ট চেপে ধরতে গেল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে গেল কাপড়। ধরে রাখতে পারল না। বেরিয়ে গেছে সিসি।

'সিসি! জলদি ভেতরে ঢোকো!'

ইঁদুরটার আর্তচিৎকারের কথা মনে পড়ল কিশোরের। সিসিকে কি করবে এই প্রাণীটা?

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। সিসির কোন ক্ষতি করতে দেবে না।

হামাগুড়ি দিয়ে খোঁড়লের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। কয়েক ফুট দূরে দেখা গেল সিসিকে। ঘন ডালপাতা ভেদ করে চাঁদের আলোর আবছা আভা এসে অদ্ভুত আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে তাকে ঘিরে।

ছায়া থেকে বেরিয়ে এল জ্বলন্ত চোখজোড়া।

চাপা গর্জন করে উঠল। ভারী গর্জন।

নেকড়ে!

সাপের মত নিঃশব্দে অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এল ওটা। কাঁপতে লাগল কিশোর। লম্বা, শক্তিশালী দেহটা এগিয়ে আসছে সিসির দিকে।

অত বড় জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করে পারবে না। দৌড় দিয়েও লাভ নেই।

নেকড়ের মুখটা স্পষ্ট হতেই হাঁ হয়ে গেল কিশোর। একটা মরা খরগোশ দাঁতে ঝুলছে।

ধীরে ধীরে সিসির দিকে এগোচ্ছে সাদা প্রাণীটা। চাঁদের আলোয় রূপালী লাগছে। সিসির কাছে এসে মাথা নিচু করল। খরগোশটা সিসির পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ল মাটিতে।

পালাও, সিসি! দৌড় দাও! চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল কিশোরের। নেকড়ের ভয়ে বলতে পারল না। সিসিকে নেকড়েটার পাশে শুয়ে পড়তে দেখে দম আটকে এল তার। চিৎকারটা ঠেলে উঠে আসতে চাইছে গলার কাছে, বহু কষ্টে নিচে নামাল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে দেখছে, আস্তে করে একটা হাত রাখল সিসি নেকড়েটার ঘাড়ে। ধীরে ধীরে নিজের মুখটা নিয়ে গেল সেদিকে। ওটার রোমশ চামড়ায় গাল রাখল সে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

সিসির সেই নেকড়েটা!

গাঁয়ের লোকে কি তাহলে ঠিকই বলে? জন্তু-জানোয়ারকে বশ করার অশুভ ক্ষমতা আছে সিসির? উঁহু! মেনে নিতে পারল না সে। যেটা আছে, সেটা ভাল ক্ষমতা। জানোয়ারের বিশ্বাস অর্জন করে নিতে পারে। ওদের ভালবাসে, বোঝাতে

পারে। যে ক্ষমতা ছিল লং জন হার্টের। তাতে অশুভ কোন ব্যাপার নেই।

খসখস শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। হেনরিও বেরিয়ে এসেছে। সিসি আর নেকড়েটার দিকে তাকিয়ে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ।

'ভয় নেই, হেনরি,' কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে বলল কিশোর। 'এটা সিসির সেই বন্ধু নেকড়েটা। খরগোশ শিকার করে এনে দিয়েছে খাওয়ার জন্যে।'

নেকড়েটার দিকে চুপ করে তাকিয়ে আছে হেনরি।

এখনও তার ভয় যাচ্ছে না ভেবে কিশোর বলল, 'নেকড়েটা কোনভাবে বুঝতে পেরেছে বিপদে পড়েছে তার বন্ধু। বাড়িতে সেদিন মাংস খাওয়াতে দেখে পরে আমি সিসিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বনের মধ্যে বাচ্চা অবস্থায় নাকি ওটাকে দেখতে পেয়েছিল সিসি। ওটার মা মরে গিয়েছিল। খাবার দিয়ে, আরও নানা ভাবে সাহায্য করে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল সিসি। বড় হয়ে বিপদের দিনে এখন বন্ধুকে সাহায্য করে প্রতিদান দিতে এসেছে নেকড়েটা।'

মাথা ঝাঁকাল হেনরি। ক্লান্ত চোখের পাতা ডলল। তাকে আবার খোঁড়লের মধ্যে নিয়ে গেল কিশোর। তার কোলের মধ্যে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল হেনরি।

সিসির দিকে তাকাল কিশোর। নেকড়ের কোলের কাছে কুঁকড়ে শুয়ে, গায়ে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে সিসি।

খোঁড়লের দেয়ালে মাথা ঠেস দিয়ে কিশোরও ঘুমিয়ে পড়ল।

তেইশ

ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। কেন ভাঙল? বুঝতে পারল না।

দম বন্ধ করে, কান পেতে রইল।

বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাল। নেকড়েটা চলে গেছে। খোঁড়লের মধ্যে কিশোরের পাশে এখন শুয়ে আছে সিসি। গভীর ঘুমে অচেতন।

নড়েচড়ে আরাম করে বসল কিশোর। চোখ বুজল। কিন্তু আর আসছে না ঘুম।

হাজারটা ভাবনা ভীড় করে এল মনে। কি করবে সকাল হলে? এই খোঁড়লে অনন্তকাল ধরে বসে থাকা যাবে না। আলো ফুটলে ফ্রেঞ্চরা দলবল নিয়ে ছুটে আসবে। পকেটে একটা পয়সা নেই। খাবার নেই। পরনের কাপড়ের হালও বড় করুণ। কি করে বাঁচাবে হেনরি আর সিসিকে?

কান পেতে শুনছে বাতাসে গাছের পাতার ফিসফিসানি। ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে চলেছে যেন। কিন্তু ঘুম আর তার কোনমতেই এল না। ভেবেই চলেছে। রহস্যময় কতগুলো প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছে না সে। মেলাতে পারছে না। এই যেমন, নেকড়ের কথাই ধরা যাক। এতদিন জেনে এসেছে, আন্ডিজ পর্বতমালায় নেকড়ে নেই। তাহলে এ বনেরগুলো এল কোথা থেকে? গাঁয়ের লোকে বলে, সিসির অশুভ ক্ষমতা আছে। জন আর মার্ক ফ্রেঞ্চের ঘোড়াগুলোকে খেপিয়ে তুলেছিল সে। ওদের

কথা ঠিক নয়–সিসি কিছু করেনি, কিশোর অন্তত বিশ্বাস করে না; কিন্তু তাহলে ওভাবে খেপল কেন ঘোড়াগুলো? অস্বাভাবিক ঘটনা। তারপর আজকে, দুই ভাইয়ের ঘোড়া দুটো প্রাণের মায়া না করে যে ভাবে ছুটে গেল আগুনের মধ্যে, তাতে যে কেউ বলবে উস্কানি দিয়ে ওগুলোকে সেদিকে যেতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তারপর রয়েছে লং জন হার্ট আর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুটা। গাড়ির ঘোড়াগুলো সেদিনও যেন অদৃশ্য কারও নির্দেশে সোজা খাদের দিকে ধেয়ে গিয়েছিল, নিজেদের প্রাণের পরোয়া না করে। তিনটে ব্যাপারকে এক করে দেখলে একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায়–মোটেও স্বাভাবিক নয় ঘটনাগুলো; এ সবের পেছনে কারও কোন হাত নেই, এটা বললেই বরং মেনে নিতে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া সিসি আর হেনরির মা-বাবা...

'কিশোরভাই, তুমি ঘুমাচ্ছ না?' সিসির কথায় বাস্তবে ফিরে এল কিশোর।

'তুমিও তো ঘুমাচ্ছ না।'

'ভেঙে গেল ঘুমটা। এভাবে কি ঘুমানো যায়?'

'বাইরেই তো ভাল ছিলে। নেকড়ে-বন্ধুর সঙ্গে। খোঁড়লে ঢুকলে কেন?'

'ও চলে গেল। ডাকলেই আবার আসবে।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সিসি বলল, 'কিশোরভাই, কাল আমরা কোথায় যাব? ভেবেছ কিছু?'

'কি আর ভাবব, বলো? কাফেলায় ঢুকে পড়াই উচিত।'

'ওই এতিমদের মিছিলে! ফকিরের মত ভিক্ষে করতে করতে যাব?' রাগত স্বরে বলল সিসি, 'কিশোরভাই, তুমি বলেছিলে আমাদেরকে এতিমের মিছিলে ঢোকাবে না।'

'বোঝার চেষ্টা করো, সিসি, আর কোন উপায় নেই এখন আমাদের,' বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'ফার্মে ফিরে যেতে পারছি না। কাল রাতে যা ঘটে গেছে, এর পর গাঁয়ের পথে আমাদের দেখামাত্র ধরে নিয়ে গিয়ে হয় পুড়িয়ে মারবে, নয়তো ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে লোকে। কেউ কোন কথা শুনবে না। তা ছাড়া ফিরে যাবই বা কোথায়? বাড়িঘর কি আর আছে? সব তো পোড়া ছাই। তারচেয়ে এই জঘন্য জায়গা থেকে বেরিয়ে চলে যাব আমরা।'

'কোথায় যাব?' সিসির প্রশ্ন।

' উত্তর আমেরিকায়। সেখানে আমাদের বাড়ি আছে, আমার চাচা আছে, চাচী আছে; কোন অসুবিধে হবে না তোমাদের। সুখেই থাকতে পারবে।'

'আমি তো জানতাম দক্ষিণ আমেরিকারই অন্য এক শহর থেকে এসেছ তুমি। তাই তো বলেছিলে।'

'মিথ্যে বলেছিলাম। কারণ আমি এখনও জানি না, এখানে কিভাবে এসেছি। আর আমার যেটা সন্দেহ, সেটা আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমাদের আর কি বলব!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল সিসি। 'কিন্তু আমি কারও গলগ্রহ হতে চাই না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল সে। 'আমি বড় হয়ে গেছি। নিজের দেখাশোনা নিজেই করতে পারব।'

কথার শব্দে হেনরির ঘুমও ভেঙে গেছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে তার। চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। বোনের কথা সমর্থন করেই যেন সে-ও জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল ওপরে-নিচে।

'পারবে না, তা তো বলছি না। কিন্তু পারার জন্যে একটা স্বাভাবিক পরিবেশ চাই। সেটা কোথায় এখানে? থাকা তো দূরের কথা, গাঁয়ের লোকের চোখে পড়লেও মরতে হবে।'

'কোনভাবে ওদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে থাকতে যদি পারতাম, ভাল হত!' সিসি যেতে চায় না কেন, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কিশোরের। নিজের জন্মভূমি, এতকালের বাসস্থান ফেলে কে-ই বা যেতে চায়!

বোনকে সমর্থন করে আবার জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল হেনরি।

'লং হার্টকে আমি কথা দিয়েছিলাম,' কিশোর বলল, 'আমি তোমাদের ফেলে যাব না। তোমাদের দেখব।'

'কিন্তু সেই কথা আর রাখতে পারছ না,' কেঁপে উঠল সিসির গলা।

'পারলাম না কোথায়? আমি তো তোমাদের ফেলে যাচ্ছি না। সঙ্গেই যাচ্ছি। বরং নিয়ে যাচ্ছি এমন একখানে, যেটা এখানকার চেয়ে হাজারগুণ ভাল।'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল হেনরি, সে যেতে চায় না, হাজারগুণ ভাল হলেও না। সে এখানেই থাকতে চায়।

তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে কিশোর বলল, 'ভাবনা নেই, হেনরি, আবার আসব আমরা এখানে। তবে অসহায় হয়ে নয়, শক্তি সঞ্চয় করে, টাকা-পয়সা নিয়ে, যাতে সমানে সমানে বাধা দিতে পারি ফ্রেঞ্চদের। শয়তান গ্যারিবাল্ড আর টাকার জন্যে মোচড় দিয়ে আমাদের দুর্বল করে ফেলতে না পারে...'

কথা শেষ হলো না তার। কানে এল ইঞ্জিনের শব্দ। অবাক হয়ে কান পাতল। খানিক পরে উজ্জ্বল আলো দেখতে পেল গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে। আশ্চর্য! এতরাতে বনের মধ্যে আলো কিসের? দলবল নিয়ে ওদের খুঁজতে এল গাঁয়ের লোকে? কিন্তু ইঞ্জিন! নাহ্, দেখতেই হচ্ছে।

তাড়াহুড়ো করে খোঁড়ল থেকে বেরিয়ে এল সে।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল সিসি।

'দেখে আসি।'

'আমরাও আসছি।'

'না, তোমরা ওখানে বসে থাকো...'

'কিন্তু...'

হাসল কিশোর। 'এইমাত্র না বললে নিজেদের দেখাশোনা করার মত যথেষ্ট বড় হয়েছ তোমরা? বসে থাকো। আমি যাব, আর আসব।'

উঠে দাঁড়াতে গেল সে। সোজা থাকতে কষ্ট হচ্ছে। ভাঁজ হয়ে যেতে চাইছে হাঁটু। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্যে ডলতে শুরু করল খিঁচ ধরা মাংসপেশি। হাত-পা ঝাড়তে লাগল।

মানুষের কণ্ঠ কানে এল। দূর থেকে।

আর দেরি করল না সে। রওনা হয়ে গেল বনের ভেতর দিয়ে।

থেমে গেছে মহাকাশযান। স্বচ্ছ গম্বুজ দিয়ে এখনও রাতের কালো আকাশ চোখে পড়ছে। তবে অন্ধকারটা এখানে অনেক বেশি। তারা দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর আকাশের মতই। সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা হলো, চাঁদও দেখা যাচ্ছে।

এ কোন্ গ্রহে নামল ওরা?—ভাবছে রবিন। তবে কি টুইন আর্থ আছে যে, এ কথা সত্যি? অবিকল পৃথিবীর মত আরেকটা যে গ্রহের কথা শোনা যায়, সেখানে এসে নামল ওরা? বেরোলেই বোঝা যাবে।

অন্য তিনজনের সঙ্গে আলোচনা করে হ্যাচের সুইচ টিপে দিল রিটা।

খুলে গেল হ্যাচ। নিঃশব্দে নেমে যেতে লাগল সিঁড়ি।

গর্তের মুখটা খুলে হুড়মুড় করে এসে ভেতরে ঢুকল রাতের তাজা বাতাস। ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা। বুক ভরে শ্বাস নিল ওরা।

'আহ্, দারুণ আরাম!' মুসা বলল। 'পৃথিবীর চেয়ে কোন অংশে কম না।'

মই বেয়ে মাটিতে নামল সবাই। খুব সতর্ক। বিপদের সামান্যতম সম্ভাবনা দেখলেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়বে স্পেস শিপে।

চারপাশে ঘন গাছপালা। ঘন বন। পেঁচার ডাক কানে এল। দূরে নেকড়ে ডাকল।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, 'এ তো এক্কেবারে পৃথিবীর মত!'

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' জবাব দিল রবিন। 'শিওর, এটা সেই টুইন আর্থ। পৃথিবীর যমজ বলা হয় যে গ্রহটাকে, অনেক বিজ্ঞানীই এখন এটার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন…'

বনের মধ্যে খসখস শব্দ হলো।

সবার আগে শুনতে পেল মুসা। ঝট করে ফিরে তাকাল সেদিকে। অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল, 'কে যেন আসছে!'

উপত্যকার একটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল কিশোর।

মেঘ সরে গেছে চাঁদের মুখ থেকে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চকচক করতে দেখল অদ্ভুত একটা গোল জিনিসের পিঠ। আলো আসছে ওটার নিচ থেকে।

অবাক কাণ্ড! এখানেও ইউ এফ ও?

একবার ইউ এফ ও দেখতে গিয়েই তো আজকের এই দুর্দশা। দ্বিতীয়বার আর কোন বিপদে ঢুকতে চায় না সে। পা টিপে টিপে এগোল।

যতটা সম্ভব কাছে পৌঁছে গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল। গোল জিনিসটার ছয়টা পা।

ছয় পা!

তাই তো! বনের মধ্যে যে ছয়টা গর্ত দেখেছিল, কিসের কারণে হয়েছে সেগুলো, জবাবটা পেয়ে গেল এখন। আরও একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল, ইউ এফ ও-তে করেই তাকে নামিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়েছিল এখানে। আবার এসেছে

কেন ওরা? তাকে তুলে নিয়ে যেতে?

পেটের কাছে একটা হ্যাচ খুলে সিঁড়ি নামানো হয়েছে। সেটা দিয়ে নেমে এসেছে কয়েকজন মানুষের মত প্রাণী। পোশাক-আশাকে পৃথিবীর মানুষের মতই লাগছে। শুধু তাই না, চেনা চেনাও লাগছে।

গাছপালার আড়ালে আড়ালে আরও কাছে এগোনোর চেষ্টা করল সে। খুব সাবধান থাকল। যাতে কোনমতেই লোকগুলোর চোখে পড়ে না যায়।

কাছে এসে চিনতে পেরে হাঁ হয়ে গেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।

মুসা, রবিন, জিনা!

আর, আর রিটা গোল্ডবার্গ!

নাহ্, এ সত্যি হতে পারে না!

চোখ ডলল সে। নিজের হাতে চিমটি কেটে দেখল ব্যথা লাগে কিনা।

লাগে! তারমানে যা দেখছে, বাস্তব। নিশ্চয় ওকে উদ্ধার করতে এসেছে তার বন্ধুরা।

ইউ এফ ও পেল কোথায়? হাইজ্যাক করেছে! আর কোনভাবে পাওয়া তো সম্ভব নয়।

ওদের দিকে দৌড় দিল সে।

চব্বিশ

মিনিট পনেরো পর।

সিসি আর হেনরিকে নিয়ে আসতে রওনা হলো কিশোর। তার সঙ্গে চলল রবিন। বাকি তিনজন মহাকাশযানটার কাছে পাহারায় রইল।

খোঁড়লের কাছে পৌঁছে সিসি আর হেনরিকে বেরিয়ে আসতে বলল কিশোর।

বেরোল দুজনে।

রবিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। খুশির সংবাদ দিল সিসি আর হেনরিকে—আর ওদেরকে মিছিলে যোগ দিয়ে কষ্ট করে পাহাড় পেরোতে হবে না। মহাকাশযানে করেই দেশে ফিরে যেতে পারবে।

সিসি খুশি হলো, কিন্তু হেনরি হলো না। হঠাৎ ঘুরে এক দৌড় মারল বনের দিকে।

'হেনরি! কোথায় যাচ্ছ, হেনরি!' ওর পিছু নিতে গেল অবাক কিশোর।

তার হাত চেপে ধরল সিসি। 'থাক, যেতে দাও। বাধা দিও না।'

আরও অবাক হলো কিশোর। 'বাধা দেব না মানে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিসি বলল, 'সে অনেক কথা। চলো, যেতে যেতে বলছি।'

হাঁটতে হাঁটতে যে কথা বলল সিসি, বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো কিশোরের। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, আর কত চমক অপেক্ষা করছে! জিজ্ঞেস করল, 'কবে

থেকে বুঝতে পারলে তুমি?'
'যেদিন হার্ট আঙ্কেল আর তার কোরিআন্টিকে খুন করল হেনরি,' জবাব দিল সিসি। 'সেদিনই বুঝলাম, আঙ্কেলের শিক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল না তার। জন্ম থেকেই সে নানা বিদ্যায় পারদর্শী।'
'তারমানে বর্ণ ঈভ্‌ল!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'জন্ম-পিশাচ!'
'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল সিসি। 'আমার মায়ের পেটে জন্মালে কি হবে, সত্যিকার অর্থে ও আমার ভাই নয়। শয়তান। মা-বাবার রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারেও ওর হাত আছে কিনা কে জানে! তবে ঘোড়াগুলোকে সে-ই যে নির্দেশ দিয়ে দিয়ে খেপিয়ে তুলেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে মনে কথা বলেছে ওদের সঙ্গে। আমাদের উপকার করার জন্যে করেনি এ কাজ, নিজের স্বার্থে করেছে।...এই যে, এখন, যেই এখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো, অমনি পালিয়েছে। ও এখান থেকে যাবে না।'
'বুঝে থাকলে এতদিন বলোনি কেন?'
'ভয়ে। যাকে ও শত্রু মনে করবে, নিষ্ঠুর ভাবে শেষ করে দেবে।'
মহাকাশযানের কাছে পৌঁছে গেল ওরা।
সিসি বলল, 'তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো। হেনরিকে বিশ্বাস নেই। কখন এসে হাজির হবে শয়তানির মতলব নিয়ে বলা যায় না। আমরা সবাই এখন তার শত্রু। জলদি করো!'
সিসির ধারণাই ঠিক।
মহাকাশযানে উঠে পড়েছে সবাই। সিঁড়িটা সবে তুলেছে, এই সময় বনভূমি কাঁপিয়ে দিয়ে শোনা গেল সম্মিলিত গর্জন। অন্ধকারে অসংখ্য চোখ জ্বলজ্বল করতে দেখল কিশোর। নেকড়ের পাল নিয়ে ওদের ধ্বংস করতে এসে হাজির হয়েছে হেনরি। সবচেয়ে বড় নেকড়েটার পিঠে চড়ে এসেছে সে। ছোটখাট একটা ঘোড়ার সমান নেকড়েটা। শয়তানের উপযুক্ত বাহন। ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে নেকড়েগুলোর চোখ।
'জলদি করো!' আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সিসি। 'ধরতে পারলে রক্ষা থাকবে না আমাদের কারও!'
সুইচ টিপে দিল রিটা। বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করল হ্যাচের ঢাকনা। কানফাটা গর্জন করে ওটার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বড় নেকড়েটা। কিন্তু মুখ ঢোকানোর আগেই বন্ধ হয়ে গেল ঢাকনা।
'দেরি কোরো না!' সিসি বলল। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে এখান থেকে। শয়তানের কুবুদ্ধির অভাব হয় না!'
ইঞ্জিন চালুই আছে। অটো পাইলট অন করে দিল মুসা।

'আমার বিশ্বাস, এটা মহাকাশযান নয়,' কিশোর বলল। 'অতি আধুনিক কোন আকাশযান। পৃথিবীর মানুষের তৈরি।'
রকি বীচে ফিরে চলেছে ওরা।

'এখন অবশ্য আমারও তাই মনে হচ্ছে,' মনিটরের দিক থেকে চোখ সরাল না মুসা।

'কে বানাল?' রবিনের প্রশ্ন।

'কোন অতি বুদ্ধিমান বিজ্ঞানী,' জবাব দিল কিশোর। 'যা শুনলাম তোমাদের কাছে, তাতে একজনের কথাই মনে আসছে আমার–ডক্টর মুন। ভিনগ্রহবাসী বলে যাদের ধারণা করেছ তোমরা, তারা আসলে রোবট। জ্যান্ত মানুষকে নানাভাবে উন্নত করে রোবট বানিয়েছে সে। তার বশংবদ ভৃত্য করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার লোকেরাই আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেরাতে। তার কাজে বাদ সাধায় আমাদের ওপর একটা আক্রোশ তো তার বরাবরই আছে। এখন মনে হচ্ছে, আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর কোনভাবে আমার মগজটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সে। দুঃস্বপ্ন ভেবেছি যে সব ঘটনাকে, আসলে ওগুলো দুঃস্বপ্ন ছিল না, ঘোরের মধ্যেই করেছি ওসব কাজ। রেগেমেগে শেষে সে আমাকে কাচু-পিকচুতে দ্বীপান্তর দিয়েছিল...'

'দ্বীপান্তর নয়, পাহাড়ান্তর,' শুধরে দিল সি সি। 'পাহাড়ঘেরা দেশ তো।'

'হ্যাঁ, পাহাড়ান্তর,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হাসল। সম্পূর্ণ ভিন্ন অচেনা পরিবেশে এত সহজে সিসি মানিয়ে নিতে পারায় খুশি হয়েছে সে। 'যা বলছিলাম। আমাকে বন্দি করে তারপর তোমাদের তুলে আনতে লোক পাঠিয়েছিল। আবার যদি তুলে আনার প্রয়োজন হয় আমাকে, যাতে সহজেই তুলে আনতে পারে, খোঁজাখুঁজি করা না লাগে, সে-জন্যে কোর্স অটো সেট করে রেখেছিল পাইলট। টিপে দিলেই যাতে পৌঁছে যেতে পারে কাচু-পিকচুতে, তুলে নিয়ে আসতে পারে আমাকে।'

'এবং কাজটা সহজ করে দিল আমাদের,' হাসল রিটা। 'খুব সহজেই জায়গামত পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা।'

'সহজ আর কই?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'আমাকে উদ্ধারের জন্যে যে কষ্ট তোমরা করেছ, যে ঝুঁকি নিয়েছ...বাপরে বাপ!...ভয়ঙ্কর সব রোবট দানবের সঙ্গে লড়াই!...'

'তা তো বুঝলাম,' বাধা দিল মুসা। 'কিন্তু আবার তো সেখানেই ফিরে যাচ্ছি আমরা। নিশ্চয় মলের ভেতরে বা আশেপাশেই কোথাও রয়েছে ওরা। গেলেই ক্যাঁক করে ধরবে।'

'সেজন্যেই তো সেখানে যাওয়া চলবে না,' কিশোর বলল। 'রকি বীচে নামাবে না স্পেস শিপ–যে বানিয়েছে সে এটার কি নাম রেখেছে, তা যখন জানি না, আপাতত এটাকে স্পেস শিপই বলব আমরা। রকি বীচের আশেপাশে যে কোন জঙলা কিংবা পাহাড়ী জায়গায় নামাবে, যেখানে মানুষজন তেমন যায় না, লুকিয়ে রাখা যায়।'

রিটা বলল, 'সব প্রশ্নের জবাবই তো পাওয়া গেল, কিশোর, একটা প্রশ্নের জবাব আমি পাইনি এখনও।'

ফিরে তাকাল কিশোর, 'কি?'

'আমি কে? আমিও কি রোবট?'

'এ কথা কেন মনে হলো তোমার!'

'ডক্টর মুনের রোবটগুলো আমাকে ডেলটাদের দলের লোক বলছিল। এই ডেলটারা কারা?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'ডেলটা! নামে তো রোবটই মনে হচ্ছে! তবে ওরা যা-ই হোক, আমাদের মতই ডক্টর মুনের শত্রু। সে-জন্যেই ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল তোমাকে।'

'তারমানে আমি আসলে কে, জানার কোন উপায় নেই?'

'থাকবে না কেন?' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'রকি বীচে গিয়ে সুস্থির হয়ে নিই আগে, তারপর বেরোব ডেলটাদের খোঁজে।'

শেষ

ভলিউম ৪১

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস আঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে।
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি,
নাম তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙ্গালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।
তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০